শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা জানুয়ারি - মার্চ ২০১৪

প্রকাশকাল
১৫.০৩.২০১৪

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাবুল অডিও
১৩৭, আজিজ সুপার মার্কেট, নিচতলা শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

প্রচ্ছদ অংকন
রুবাবা হোসেন নদী

কম্পোজ
প্রান্তিক

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
১০০.০০ টাকা
১০০.০০ রুপি
৩ $ ডলার

স ম্পা দ কী য়

সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ফেইজবুক বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ছোট কাগজ, নিয়মিত-অনিয়মিত সাহিত্য ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে ছিলনা এমন কিছু সুবিধা ফেইজবুকে রয়েছে, যেমন, ১. নিজেই নিজের প্রকাশ মাধ্যমটি অপারেট করতে পারার স্বাধীনতা; ২. একইসঙ্গে বহুসংখ্যক লেখক-পাঠকের সঙ্গে সম্পর্কীত থাকতে পারা; ৩. দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানতে ও জানাতে পারা– ইত্যাদি। অবশ্য এই মাধ্যমটি নিয়ে আশঙ্কাও কম দেখা দেয়নি, যেমন, প্রকাশে স্বেচ্ছা সম্পাদনা'র জায়গায় স্বেচ্ছাচারিতা ও সম্পাদনাহীনতা, সব কিছুকে তাৎক্ষণিক বিচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়া, একাধিকবার সম্পাদনার পর পূর্বের অবস্থাগুলো রক্ষা করতে না-পারা, প্রতিযোগিতার মাঠে অদক্ষ ও অতি সাধারণ মূল্যায়ণে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের হিরিক এবং ফেইজবুক একাউন্ট যে-কোন সময় ক্র্যাশ্ড হওয়ার আশঙ্কা– ইত্যাদি।

এরকম পক্ষে-বিপক্ষে আরও বলা যায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই ফেইজবুক থেকে দূরে থাকার কোন উপায় আজ আর নেই; একইভাবে এই ব্যবস্থায় আস্বক্ত হয়ে পড়লে সময় অপচয়সহ রয়েছে সমূহ নানা বিপদের সম্ভাবনা।

আমাদের ভুলে গেলে চলে না, এই ফেইজবুকসহ ইন্টারনেটের সবকিছুই বিশ্বপুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের হাতে কুক্ষিগত এক অপার শক্তি। এর মাধ্যমে যে-কোনো তথ্য পেতে তারা সক্ষম। একইভাবে স্বীকার করতেই হয়, যে-কোন ছুতোয় এই ব্যবস্থা স্থগিত করতে বা নিজেদের হাতে গুটিয়ে নিতে তারা পারঙ্গম।

এতদ্‌সত্ত্বেও একে সঠিকভাবে নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পক্ষে ব্যবহার করা গেলে এর উপযোগ সোনালী গন্তব্যের খোঁজ দিতেও পারে। অনেক আশঙ্কা থাকার পরও ফেইজবুকের মাধ্যমে সাধারণ-শ্রেণির নেতৃত্ব গড়ে ওঠার সম্ভাবনা যথেষ্ঠই রয়েছে। সকল সাধারণ মানুষ বঞ্চনা থেকে মুক্তি চায়– কিন্তু তাদের সবচেয়ে বড় বাধা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। মুঠোফোন যেমন নাগালে এসেছে একইভাবে ফেইজবুক সুবিধাও অচিরেই তাদের নাগালে আসবে– আশা করা যায়। বৃহৎ বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না-থাকলেও এই শ্রেণির মধ্যে রয়েছে ছোট-ছোট নেতৃত্ব যা ছোট-ছোট এলাকা ভিত্তিক সামাজিক পরিমণ্ডল ও অবয়বে ক্রিয়াশীল। এই ছোট নেতৃত্বকে বড় পরিসরে সংযুক্ত করে দেয়ার মাধ্যমে সুফল আনায়নকারী উপায় হতে পারে ফেইজবুক।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সবাইকে জানাই কৃতজ্ঞতা।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
সম্পাদক, গোলাঘর
১৫.০৯.২০১৪

সূচি

স্ম র ণ
ছবি: কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী ০৫

স্ম র ণ / প্র ব ন্ধ
কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী: অনিঃশেষ ও চিরঞ্জীব
এ ম এ আ জি জ মি য়া ০৬

স্ম র ণ: দু ই / প্র ব ন্ধ
সরদার ফজলুল করিম: জ্ঞানী মানুষ একালের
এ ম এ আ জি জ মি য়া ১১

প্র তি ক্রি য়া
বদলে যাচ্ছি আমি
কা লী প্র স ন্ন দা স ১৮

স মা জ ও বি জ্ঞা ন / প্র ব ন্ধ
বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা
ন জ রু ল ই স লা ম ২৪

ব্যা ং কি ং / প্র ব ন্ধ
রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা
হা বি র আ হ ম দ দ ত্ত চৌ ধু রী ৩৮

ক বি তা
সত্তর, আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা ৬০

গ ল্প
ফিঙ্গারপ্রিন্ট
দি পং ক র গৌ ত ম ১৪১

গল্পের পাঠপ্রতিক্রিয়া
শা হ দ ত হো সে ন ১৪৬

সা হি ত্য / প্র ব ন্ধ
আলালের ঘরের দুলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪ – ১৮৮৩)
শা র মি ন খা ন ১৪৭

সা ক্ষা ৎ কা র
ই ফ তে খা র মা হ মু দ ১৫১

বাউল তত্ত্ব
আ হ ম দ শ রী ফ ১৫৫

গা ন / ক বি তা
কা জী ন জ রু ল ই স লা ম ১৮৭

A Method of Colonization
Z a f r u l l a h C h o w d h u r y 191

গ ল্প
তারিখ
মো হা ম্ম দ আ সা দু জ্জা মা ন ২০৩

'শেষের রাত্রি' এবং রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর নারীভাবনা
কা জ ল ব ন্দ্যো পা ধ্যা য় ২০৮

বাংলার মুসলমানগণের মাতৃভ
আ ব দু ল ক রি ম সা হি ত্য বি শা র দ ২২১

(স্ম র ণ)

সন্তোষ ব্যানার্জী
(ছবি)

জন্ম ১৩০৮ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীর দিন। তিনি ছিলেন মা-বাবার অষ্টম সন্তান। মাদারীপুর শহরের এ পরিবারটি ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন। পিতা প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মা-সৌদামিনী। ১৯২৭ সালে ১২ বছর বয়সে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান। ১৯৩০ সালে নবম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় প্রথম ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। তারপর ১৯৩৩-১৯৩৮, ১৯৪০-১৯৪৬, ১৯৫১-১৯৫৫, ১৯৫৭, ১৯৫৯-১৯৬৯ পর্যন্ত থাকেন কারাগারে। বাকি সময়টা কেটেছে আত্মগোপনে। রাজশাহী জেলে থাকাকালে ১৯৪১ সালে প্রবেশিকা ও বক্সার ফোর্টে থাকাকালে ১৯৪৩ সালে আই এ পাশ। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর আন্ডারগ্রাউন্ড জীবনে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন শরীয়তপুরের (তৎকালীন পূর্ব মাদারীপুর) কম্যুনিস্ট নেতা উপেন সেন, শান্তি সেন, চুনী মুখার্জী, প্রফুল্ল সান্যালদের সঙ্গে। ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান। শুরু হয় এক নতুন পথযাত্রা, মানবমুক্তির জীবনপণ লড়াই-সংগ্রাম। ১৯৬৯ সালে ছাত্র-জনতার মহান গণ-অভ্যুত্থানের ফলে কারামুক্তি। কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জীর ৮৮ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের প্রথম ১২ বছর কাটিয়েছেন মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত পরিবেশে। ৬৪ বছর কারাগারে ও আত্মগোপনে। শেষ ১২ বছর কাটিয়েছেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে আত্মীয়সম দেশের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে। ১৯৯৪ সালে শরীয়তপুরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত পঞ্চদশ শতাব্দী বরণ ও বৈশাখী মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা দান। ১৯৯৭ সালে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকীতে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। সে-বছর শরীয়তপুরে ‘তেভাগা আন্দোলনের ৫০ বছর’ অনুষ্ঠানেও ছিলেন প্রধান অতিথি। ২০০০ সালে ৮৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরিক কমিটি কর্তৃক সংবর্ধিত। ২০০২ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক ‘প্রবীণ বিপ্লবী সম্মাননা’ জ্ঞাপন। শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন ২০০৩ সালের ১ মে, রাত ১০টায়। সেদিন ছিল ঐতিহাসিক মে দিবস।

কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী: অনিঃশেষ ও চিরঞ্জীব

....

এ ম এ আ জি জ মি য়া

বিংশ শতাব্দীর এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মেছিলেন বিপ্লবের কিংবদন্তী, কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী। ১৩০৮ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান হিসেবে। মাদারীপুর শহরের এ পরিবারটি ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত ও সম্পন্ন। তাঁর পিতার নাম প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা-সৌদামিনী। পূর্ণিমার মতো চাঁদমুখ পুত্রসন্তানটি তাঁরা পেয়েছিলেন পর পর সাত কন্যার পরে। তাই সেদিন তাঁদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তাঁরা চোখের মণির মতো ছেলেকে পরম আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালোবাসায় লালন-পালন করতে থাকলেন। বয়স হলে তাঁকে স্থানীয় মাদারীপুর স্কুলে ভর্তি করে দেন। লেখাপড়া চলছিল ভালোভাবেই। কিন্তু সে কালে ব্রিটিশবিরোধী যে তুমুল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল দেশব্যাপী তার ঢেউ মাদারীপুরেও বিস্তৃতি লাভ করেছিল ব্যাপকভাবে। মাদারীপুর বিপ্লবীদের আস্তানায় পরিণত হয়েছিল। শিশু সন্তোষও আস্তে আস্তে টের পাচ্ছিলেন বিপ্লবীদের আনাগোনা। স্কুলে যাতায়াতের সময় দেখেছেন সত্যাগ্রহীদের দীর্ঘ লাইন। ধীরে ধীরে তিনিও বিপ্লবের আগুনে তপ্ত হতে থাকলেন। এক সময় তিনিও অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ১৯২৭ সালে ১২ বছর বয়সে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়াকালে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। কয়েকবার সত্যাগ্রহীদের লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু দাদারা নিবৃত্ত করলেন। পরে চেষ্টা চলল বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলার। ১৯৩০ সালে নবম শ্রেণিতে পড়াকালে তিনি প্রথম ধরা পড়ে গেলেন পুলিশের হাতে। জেল খাটলেন একটানা ৭ মাস। তারপর আর পিছনে ফেরা হয়নি তাঁর। জেল-বাইর-জেল অথবা আত্মগোপনে কেটে গেছে ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে গোটা পাকিস্তান আমল। বিপ্লবের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিনি খাঁটি সোনায় পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। মানবমুক্তি তথা কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষের সূর্য-সৈনিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সে জীবনকাহিনী যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি রোমাঞ্চকরও বটে।

লেখাপড়ায় তিনি খারাপ ছিলেন না। কিন্তু জেলখানা থেকে বের হয়ে এসে যেন মন বসছে না। দিনরাত যেন বিপ্লবভাবনায় পেয়ে বসেছে। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা

অর্জন ছাড়া কোনো স্বপ্ন নেই। অধিক জোরেসোরে শুরু করলেন বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড। কিছুকাল পর ১৯৩২ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হলেন। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় স্থায়ী ছেদ পড়ল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আর স্কুলে যাওয়া হল না। তারপর ১৯৩৩-১৯৩৮, ১৯৪০-১৯৪৬, ১৯৫১-১৯৫৫, ১৯৫৭, ১৯৫৯-১৯৬৯ পর্যন্ত কারান্তরালে থাকলেন। বাকি সময়টা কেটেছে আত্মগোপনে। তিনি যেসকল জেলে অবস্থান করেছেন তারমধ্যে মাদারীপুর, ফরিদপুর, হিজলী, আলিপুর, রাজশাহী, বক্সার ফোর্ট, দমদম, ঢাকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। রাজশাহী জেলে থাকাকালে ১৯৪১ সালে তিনি প্রবেশিকা ও বক্সার ফোর্টে থাকাকালে ১৯৪৩ সালে তিনি আই এ পাশ করেন। তারপর আর ডিগ্রি লাভের চেষ্টা তিনি করেননি। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পলাতক জীবনে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন শরীয়তপুরের (তৎকালীন পূর্বমাদারীপুর) কম্যুনিস্ট নেতা উপেন সেন, শান্তি সেন, চুনী মুখার্জী, প্রফুল্ল সান্যালদের সঙ্গে এবং ১৯৫০ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। শুরু হয় এক নতুন পথযাত্রা; মানবমুক্তির জীবনপণ লড়াই-সংগ্রাম।

১৯৬৯ সালে ছাত্র-জনতার মহান গণ-অভ্যুত্থানের ফলে তিনি জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আর তাঁকে জেলে যেতে হয়নি। কিন্তু পালিয়ে বেড়ানোর জীবনের অবসান হয়নি। লড়াই-সংগ্রাম থেকে তিনি নিবৃত্ত থাকেননি। পার্টির কাজে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। ইতোমধ্যে একাত্তর সমুপস্থিত। বাঙালির মরণপণ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। একসময় তিনিও ছুটে গেলেন কলকাতা। পার্টির উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণে দিনরাত ক্যাম্পে থেকেই কাজ করলেন। জীবিত একমাত্র ছোটবোন ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের কথায়ও কোনো কর্ণপাত করলেন না। দেশ স্বাধীন হলে ছুটে এলেন দেশের মাটিতে। টেকেরহাটে লঞ্চ থেকে নেমে সারা গায়ে মেখে নিলেন দেশের মাটি। ভাবলেন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কথা। এ জন্য পার্টি ও কর্মীদেরকেও গড়ে তুলতে হবে। লেগে গেলেন সে কাজে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সরকারের একাংশের দুর্নীতি, স্বজন-প্রীতি ও দুর্বৃত্তদের দাপট দেখে একসময় তিনিও কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে চুয়াত্তরের মানব-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। উগ্র ডান-বামের চক্রান্ত তাঁকে অনেকটা বিচলিত করেছিল। তবুও মানুষের শক্তিতে তিনি বলীয়ান ছিলেন। প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেন গণমানুষের জাগরণ ঘটাতে। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কী করতে হবে তা তাঁর অজানা ছিল না। আত্মগোপনে থেকে সতর্ক চলাফেরা শুরু করলেন। এভাবে কেটে গেল গোটা আশির দশক। সীমাবদ্ধতার মধ্যেও চালিয়ে গেছেন পার্টির কাজ। জিয়া সরকারের আমলে ২ বার এবং এরশাদ সরকারের আমলে ৪ বার তাঁকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরশাদ-বিরোধী ২২ দলের মিছিল থেকে একবার পুলিশ তাঁকে ধরেছিল। কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়া হয়। তিনি মাদারীপুরে পার্টির হাল ধরেছেন এবং পার্টির কাজে চারণের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিলোপবাদীরা পার্টিকে বিলুপ্ত করার যে চেষ্টা করেছিল বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অন্যান্য

প্রবীণ বিপ্লবীদের সঙ্গে গর্জে উঠেছিলেন। সেদিন তাঁর বজ্রমুষ্ঠিতে লাল পতাকার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষিত হয়েছিল। জীবন-দীপ নিভে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সে প্রয়াস অব্যাহত ছিল।

কমরেড ব্যানার্জীর বিপ্লবী ও পলাতক জীবনের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তিনিও অনেক ঘটনার কথা বলেছেন। একবার কথাচ্ছলে তাঁর এককালীন সাথী আংগারিয়ার ননী নাগা বলেছিলেন, 'অনেক সময় সন্তোষ ব্যানার্জী নৌকায় করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের বাড়িতে উঠতেন। এক এক জায়গায় তা লুকিয়ে রাখা হত। উনি থাকতেন অন্য কোথাও গিয়ে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতেন না।' ধানুকার পূর্ণ চন্দ্র দে বলেছেন, 'পঞ্চাশের দশকে সন্তোষদা কোনো কোনো সময় আমাদের বাড়িতে থাকতেন। দিনের বেলা ঘরের বাইরে যেতেন না। কিভাবে একদিন তিনি পার্শ্ববর্তী দিঘিতে স্নান করতে গিয়েছেন। জনৈক ওয়াচার যে তাঁকে অনুসরণ করছে তিনি তা টের পেলেন। দ্রুত ছুটে এলেন বাড়িতে। মা ভাত বেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু খাবার সময় নেই। তাই ছদ্মবেশ ধারণ করে অন্যত্র চলে গেলেন।' ১৯৬৯ সালের একটি ঘটনার কথা অ্যাডভোকেট আবদুর রাজ্জাক শিকদার প্রায়ই বলতেন, 'আয়ুব খাঁর পতন হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতারভাষণ দিলেন। আমরা পালং বাজারের একটি দোকানঘরে বসে আলোচনা করছিলাম। এক ফাঁকে সন্তোষদা কখন যে উঠে গেলেন আমরা টের পাইনি। কিছুক্ষণ পর ক'জন সিপাই এসে বলছে, 'মালাউনটা গেল কৈ?' আমাদের আর বুঝতে বাকি রইল না কার কথা জিগ্যেস করছে। সন্তোষদা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন কী ঘটতে যাচ্ছে এবং তাঁকে কী করতে হবে।' এমনি চমকপ্রদ বহু ঘটনা। অনেকে বলেন, 'সন্তোষদা অনেক কিছু জানেন। তাই পুলিশের চক্ষু এড়িয়ে নির্বিঘ্নে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন।' আসলে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক ছিল। তিনি অনেক বৈপ্লবিক কৌশলও আত্মস্থ করেছিলেন। অদম্য মনোবল ও সাহস থাকলে বিপদ কেন পৃথিবীকেও জয় করা যায়। তিনি সর্বদা একথাই বলেছেন।

পলাতক জীবনে কমরেড ব্যানার্জী বৃহত্তর ফরিদপুর, ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছেন। তবে বেশি থেকেছেন মাদারীপুর ও শরীয়তপুর (তৎকালীন পূর্বমাদারীপুর)। তাঁর প্রধান আস্তানা ছিল মাদারীপুর, কবিরাজপুর, শশিকর, কালকিনি, আংগরিয়া, মধ্যপাড়া, ধানুকা, বাঘিয়া, সাত পাড়, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, রাজবাড়ি ও ঢাকা। এসব স্থানে যখন যে বাড়িতে অবস্থান করেছেন, সে বাড়ির লোকজনের একান্ত আপনজনের মতো চলেছেন। ছোট-বড় সকলের আন্তরিক ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা লাভ করেছেন। বাঘিয়ার দুলাল কংস বণিক বলেছেন, 'পলাতক অবস্থায় একবার তিনি বেশ কিছুদিন আমাদের ঘরের মাচায় পাটাতনের ওপর থেকেছেন। দিনের বেলা কাকপক্ষী পর্যন্ত তাঁকে দেখত না। বাড়ির শিশুরা পর্যন্ত জানত না বাড়িতে কেউ আছে। খাদ্যখাবার সবই ওখানে। পায়খানা-প্রশ্রাব আমরাই পরিষ্কার করেছি।' দেশপ্রেম আর মানবতা কাকে বলে?

কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জীর ৮৮ বছরের সুদীর্ঘ জীবনের প্রথম ১২ বছর কাটিয়েছেন মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত পরিবেশে। ৬৪ বছর কারান্তরাল ও

আত্মগোপনে। আর শেষ ১২ বছর কাটিয়েছেন জাতিধর্ম নির্বিশেষে আত্মীয়সম দেশের বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে। তবে এসময় ঝুঁকিটা ছিল না। তখন তাঁর শরীর অনেকটা ভেঙে পড়েছে, চোখে কম দেখেছেন এবং কানে কম শুনেছেন। তবে তা নিয়ে তাঁর কোনো আক্ষেপ ছিল না। যখন যেখানে গিয়েছেন সকলকে আপন করে নিয়েছেন। বাড়ির কর্তা বনে গিয়েছেন। মহারাজের মতো সকলকে ফাইফরমাস করেছেন। বাড়ির সবাই তা একান্তভাবে মেনে নিয়েছেন। একদা একান্ত পরিবেশে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিয়ে-সাদি করার ব্যাপারে। স্মিত হেসে বললেন, 'দাড়িগোঁফ ওঠার আগে জেলে গেছি, দাড়িগোঁফ পেকেছে জেলে; ওসব নিয়ে ভাবাভাবির সময়ই ছিল না।' প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দঘন মুহূর্তের কথা। কিছুটা সময় নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'একদিন আমার মাজায় একটা কাপড়ের থলে বেঁধে দিয়ে বললেন নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে নির্দিষ্ট লোককে দিতে হবে। ৪টি পয়সা হাতে দিলেন, ২টি খেয়াপাড় ও বাকি ২টি পয়সায় কিছু খাওয়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ রওয়ানা দিলাম। প্রথমবার খেয়াপাড় হয়ে দ্বিতীয় বার যখন খেয়াপাড়ের পয়সা দিতে যাচ্ছি সে সময় হাত থেকে বাকি ২টি পয়সা নদীতে পড়ে যায়। সেদিন আর কিছু খাওয়া হল না। বিকেলে যখন যথাস্থানে পৌঁছেছি, আমার শুকনো মুখ দেখে নেতা (প্রখ্যাত বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস) কারণ জানতে চাইলেন। ঘটনা খুলে বলায় নেতা আমায় জড়িয়ে ধরলেন আর চুমু খেতে থাকলেন আমার কপাল ও কপোলে। বললেন, সঙ্গের টাকাভর্তি থলের কথা। সেদিন যে পরম সুখ অনুভব করেছিলাম, এমন আর কোনো স্মৃতি নেই।' তারপরও অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেছি। কিন্তু তখনও তাঁর ভাববিহ্বলতা কাটেনি।

আর একদিন গল্প করার সময় তাঁর পলাতক জীবনের কথা বলছিলেন। একবার ধরা পড়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, 'তখন আমি কবিরাজপুর থাকি। সেখানে ছদ্মবেশে পুলিশ আমার এক পরিচিত লোককে নিয়ে উপস্থিত। আমার আর বুঝতে বাকি থাকল না অর্থের প্রলোভন দিয়ে তাকে নিয়ে এসেছে। গ্রেপ্তার হয়ে লঞ্চে চলেছি। লোকটি অনুতপ্ত হয়ে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাকুতিমিনতি করছে তার জীবন-বাঁচানোর জন্য। কী আর করি; অনুসারীদের বলে দিলাম লোকটিকে যেন মেরে ফেলা না হয়।' মানবদরদী এ মহান বিপ্লবী কমরেড ব্যানার্জীর বুকভরা ভালোবাসা ছিল মানুষের জন্য। শুভানুধ্যায়ীদের দেয়া অর্থ থেকে তিনি কতজনকে যে সাহায্য করেছেন তার কোনো ইয়ত্তা নেই। অসুখে-বিসুখে তিনি নিজের জন্য একটি ট্যাবলেটও কিনতেন না। অথচ চিকিৎসা, লেখাপড়া, খাওয়া-পড়া এমনকি মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি কতজনকে সাহায্য করেছেন। পার্টির নেতা-কর্মীকেও অনেক সময় তিনি সাহায্য করেছেন। নিজের জন্য ভাবনা করে কখনও সময় কাটাননি। অনেকের দেয়া অর্থ তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানও করেছেন। একেই বলে খাঁটি বিপ্লবী ও সাচ্চা মানুষ। আর একদিন তাঁকে জীবনের সবচেয়ে কষ্টের কথাটি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। অনেকক্ষণ ভাবলেন। তারপর বলা শুরু করলেন, 'মা-বাবা ও কোনো বোনদের মৃত্যু আমি দেখিনি। কিন্তু যেদিন শুনলাম উল্লাস কর দত্ত (কুমিল্লা), মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(এড়িকাঠি).... বিপ্লবীদের ফাঁসি হয়েছে।' আর কোনো কথাই তার মুখ থেকে বেরোল না। শিশুর মতো ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এটা-ওটা বলে, চা-বিস্কুট খাইয়ে কিছুতেই তাঁকে স্বাভাবিক করা যাচ্ছে না। পরের দিন দেখা করব বলে হাতে নজরানা দিয়ে বিদায় নিলাম সেদিনকার মতো।

গরিব-দুঃখী মেহনতি মানুষের পরমদরদী বন্ধু, চিরকুমার, সর্বস্বত্যাগী এ মহান বিপ্লবী কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনোদিন তেমন কিছুই পাননি। যা পেয়েছেন তার ফিরিস্তি অনেকটাই দেয়া হয়েছে। তারপরও মানুষের কাছ থেকে তিনি যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়েছেন তা নিয়ে সর্বদা গর্ব করেছেন। কেননা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন কাঙ্ক্ষিত সাম্যবাদী সমাজ বা রাষ্ট্র তিনি দেখে যেতে পারেননি। তবে মানুষের শক্তির ওপর তিনি বিশ্বাস করতেন। সাম্যবাদী সমাজের বিকল্প তাঁর ভাবনায় স্থান লাভ করেনি। তাঁর আত্মত্যাগ ও নীতিনিষ্ঠ আদর্শের জন্য দেশের মানুষ নানাভাবে তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেছেন ও সম্মান জানিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি শরীয়তপুরে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট আয়োজিত পঞ্চদশ শতাব্দীর বরণ ও বৈশাখী মেলার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। ১৯৯৭ সালে রবীন্দ্র সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত রবীন্দ্র জন্ম বার্ষিকীতে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। সে বছর শরীয়তপুরে 'তেভাগা আন্দোলনের ৫০ বছর' অনুষ্ঠানেও তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। ২০০০ সালে তাঁর ৮৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয়। ২০০২ সালে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তাঁকেও 'প্রবীণ বিপ্লবী সম্মাননা' জ্ঞাপন করা হয়। বৃহত্তর ফরিদপুরের নানাস্থানে এমনি বহু সম্মাননা তিনি লাভ করেছেন। প্রবীণ বিপ্লবীদের জন্য জনৈক দরদীপ্রাণ ব্যক্তি ঢাকাতে যে 'অমৃত সদন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কমরেড ব্যানার্জী সেখানেও কিছুকাল অবস্থান করেছেন। কিন্তু গ্রামীণ পরিবেশে থাকতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে সবখানে ঘুরে-ফিরে গিয়েছেন। শুভানুধ্যায়ীরা অনুরোধ করেছিলেন এক জায়গায় স্থিত হতে। সাধ্যমতো সকলে সাহায্য পৌঁছে দিতেও আশ্বস্ত করা হয়েছিল। ২০০২ সালের শেষদিকে তিনি শরীয়তপুর থেকে যেদিন রওয়ানা হলেন কবিরাজপুর যাবেন বলে, সেদিন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি তাঁকে আমরা শরীয়তপুরে আর দেখতে পাব না। তিনি ক'দিন মাদারীপুর থেকে চলে গেলেন কালকিনী। হয়তো শশিকরও যাবেন ভাবছিলেন। কিন্তু না। তার আগেই একা পথ চলতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে গেল। চিকিৎসা চলল মাদারীপুর ও পরে ঢাকায়। দুস্থ স্বাস্থ্য হাসপাতালে অনেকদিন আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসা চলল। কিন্তু সহসা আরোগ্যলাভের তেমন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁর পছন্দের স্থান কবিরাজপুর পাঠিয়ে দেয়া হল। কিন্তু যোগাযোগ ও সেবাযত্নের সুবিধার জন্য পার্টির নির্দেশে তাঁকে টেকেরহাটের ক্ষেতমজুর নেতা আবুল কালামের বাড়ি নিয়ে আসা হল। পরম আত্মীয়ের মতো সে পরিবারটি মৃত্যুপথযাত্রী এ চিরবিপ্লবীর সেবাযত্ন করলেন। কিন্তু তখন তাঁর জীবনী-শক্তিই নিঃশেষ হয়ে আসছিল। তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলেন ২০০৩ সালের ১ মে রাত ১০টার সময়। সেদিন ছিল ঐতিহাসিক মে দিবস। তাঁর

অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মরদেহ বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে দেয়া হল। তিনিও ইতিহাস হয়ে রইলেন। তুমি চিরঞ্জীব কমরেড!

তথ্যসূত্র

১) আলাপচারিতা– কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী।
২) সন্তোষ ব্যানার্জীর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি– রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী।
৩) প্রয়াত কমরেড সন্তোষ ব্যানার্জী– অধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমান, *সাপ্তাহিক একতা*, ২৯ বৈশাখ ১৪০০।

স্ম র ণ: দু ই / প্র ব ন্ধ

সরদার ফজলুল করিম: জ্ঞানী মানুষ একালের

....

এ ম এ আ জি জ মি য়া

প্রাচীনকালের জ্ঞানী মানুষদের কথা আমরা বইতে পড়েছি। কিন্তু একালের জ্ঞানী মানুষ সরদার ফজলুল করিমের (১৯২৫-২০১৪) কথা আমরা অনেকেই সেভাবে জানি না। অথচ সারাজীবন তিনি প্রাচীনকালের জ্ঞানী মানুষদের মতো জ্ঞানচর্চা করেছেন, মানুষ হওয়ার সাধনা করেছেন। তাঁর কোনো রাগ বা অহমিকা ছিল না। যেন বিনয়ের অবতার। তাঁর মনেপ্রাণে বিশ্বাস ছিল 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। কেউ পরিচয় জানতে চাইলে বলেছেন, 'আমি মানুষ'। তাঁর রচিত একটি গ্রন্থের নাম 'আমি মানুষ'। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গও করেছেন 'মানুষকে'। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'আমি কি মানুষ? যখন এ প্রশ্নের আমি কোনো জবাব দিতে পারছিলাম না, সেই লা-জবাবের কারণে, নিজেই হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম, তখন আমার এক স্নেহাস্পদ কয়েকটি শিরোনামের মুদ্রণ আমার চোখের সামনে রেখে জিগ্যেস করলেন, এই শিরোনামগুলোকে আপনি স্বীকার করেন না? আমি শিরোনাম কয়টির দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় স্নেহাস্পদকে বলেছিলাম: তুমি আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিলে।

তোমাকে এ জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার জীবন দিয়ে।' তিনি একজন মানুষকে বলেছেন একটি বই। বইতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে, মানুষের মধ্যেও তিনি জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন সারাজীবন। জ্ঞান-পাগল এ-মানুষটি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯২৫ সালের ১ মে এবং মারা যান ঢাকাতে ১৫ জুন (রাত ০০.৪৫ মিনিট) রবিবার।

সরদার ফজলুল করিমের পিতার নাম খবিরউদ্দীন সরদার এবং মায়ের নাম সফুরা বেগম। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার আটপাড়া গ্রামে এবং সেখানেই জন্ম হয়। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় গ্রামের স্কুলে এবং পরে ভর্তি হন বরিশাল জেলা স্কুলে। সেখান থেকে তিনি ১৯৪০ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সে বছরেই তিনি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪২ সালে মেধা তালিকায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে আই.এ. পাশ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে অনার্সসহ স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। কিন্তু কিছুদিন পর দর্শন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে স্নাতক (অনার্স) এবং ১৯৪৬ সালে এম.এ. পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি প্রথমশ্রেণিতে প্রথমস্থান লাভ করেন। সে বছরেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপনা জীবন শুরু করেন। পাশাপাশি তিনি চালিয়ে যান কমিউনিস্ট পার্টির কাজও। সে সময় তিনি একটি বৃত্তি পেয়ে বিলেত যাবার সুযোগ পান। কিন্তু পার্টির অনুমোদন না পেয়ে সে আশা পরিত্যাগ করেন। পার্টির নির্দেশে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পদ থেকেও পদত্যাগ করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাকর্মীদের ন্যায় আত্মগোপন করেন। ১৯৪৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর তিনি প্রথম গ্রেপ্তার হন এবং মুক্তিলাভ করেন ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে। তবে জেলখানায় অন্তরীণ থাকা কালেই তিনি পাকিস্তান কনস্টিটুয়েন্ট এসেমব্লি-র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি একটি অধিবেশনে যোগদানও করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয়বার এসেমব্লিতে যোগদানের জন্য ঢাকা বিমানবন্দরে গিয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি দ্বিতীয়বার জেলে যান। অবশ্য সেবার বেশিদিন তাঁকে জেলে থাকতে হয়নি।

১৯৫৭ সালে রাজিয়া সুলতানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তিনি আবার গ্রেপ্তার হন। তখন তাঁদের প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম হয়েছে। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জেল থেকে বের হয়ে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমিতে অনুবাদ শাখায় যোগ দেন। শুরু হয় তাঁর নিবিড় লেখালেখি জীবন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে সেপ্টেম্বরে বাংলা একাডেমি থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। অন্তরীণ অবস্থায় তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের মানুষের বিজয় সূচিত হলে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যোগদান করেন এবং ১৯৮৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তারপরে বেশ কয়েক বছর তিনি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষকতা জীবনের ছেদ পড়ে। কিন্তু আমৃত্যু শিক্ষকতার প্রতি তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। ২০০৯ সালে তিনি তাঁর প্রিয় সহধর্মিণীকে হারিয়ে অনেকটা একাকী

হয়ে পড়েন। তারপর একসময়ে তিনিই চলে গেলেন। তাঁর এক কন্যা ও দুই পুত্র। তাছাড়া বেশ কয়েকজন নাতি-নাতনি রয়েছে।

ছাত্র-জীবন থেকে সরদার ফজলুল করিমের লেখাপড়া ও জ্ঞানচর্চার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তবে তিনি কখন থেকে লেখালেখি শুরু করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। স্কুল-জীবনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' পড়ে তাঁর মনে রাজনীতির প্রথম ছাপ পড়ে। কলেজজীবনে পার্ল এস. বাকের 'গুড আর্থ' পড়ে তাঁর মনে নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে। তখন থেকেই তাঁর মনে বৈশ্বিক চিন্তার সূচনা হয়। কলেজজীবনেই তিনি বন্ধুদের নিয়ে লাইব্রেরি গড়েছেন, পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি লেখা শুরু করেন তখন থেকেই। তবে কোন লেখাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তা বলা যায় না। তিনি নিজেই একটি গল্পের রচনাকাল ১৯৪১ সালের শেষদিকে বা ১৯৪২ সালের প্রথম দিকে বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, গল্পটির পটভূমি ছিল ঢাকার দাঙ্গা বিষয়কে অবলম্বন করে। তাছাড়া ১৯৪২-৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে তিনি ড. সন্‌জীদা খাতুনের এক ভাই সুলতানের মৃত্যু হলে তাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। ড. খাতুন তাঁর স্মৃতিচারণে তা উদ্ধৃত করেছিলেন। তবে অপর কোনো লেখা ঢাকা কলেজের ম্যাগাজিন, *মাসিক মোহাম্মদী* বা *মাসিক সওগাত*-এ প্রকাশিত হয়েছিল বলে তিনি নিজের লেখায় উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ষাটের দশকে তাঁর লেখালেখি ও গ্রন্থাবলি প্রকাশের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-পাগল সরদার ফজলুল করিম নতুনভাবে প্রতিভাসিত হতে শুরু করেন। জীবন ও জগতে জানা ও বোঝার প্রয়াস থেকেই সরদার ফজলুল করিম 'একালের সক্রেটিস' অভিধা লাভ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে *প্লেটোর সংলাপ*, *প্লেটোর রিপাবলিক*, এরিস্টটলের *পলিটিক্স* ও এঙ্গেলস'-র *অ্যান্টিডুরিং*। তাছাড়া তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে *দর্শন কোষ*, *ইতিহাস কোষ*, *নানা কথা*, *নানা কথার পরের কথা*, *রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, *নূহের কিশতি ও অন্যান্য কাহিনী*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ববঙ্গীয় সমাজ*, *চল্লিশের দশকের ঢাকা*, *গল্পের গল্প*, *যুক্তিবিদ্যা*, *সেই সে কাল:*, *কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, *আমাদের সাহিত্য*, *আমি মানুষ*, *সেই সব দার্শনিক*, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ* প্রভৃতি।

'সেই সব দার্শনিক' গ্রন্থের অতি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, 'যারা আমার জীবনের জীবন সেই সব দার্শনিক নিয়ে এই বই।' সেইসব দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন সক্রেটিস (খ্রি. পূ. ৪৬৯-৩৯৯), প্লেটো (খ্রি, পূ. ৪২৮-৩৪৭), এরিস্টটল (খ্রি. পূ. ৩৮৪-৩২২), এপিকুরাস (খ্রি. পূ. ৩৪১-২৭০), স্পিনোজা (খ্রি. ১৬৩২-১৬৭৭), রুশো (খ্রি. ১৭১২-১৭৭৮), হেগেল (খ্রি, ১৭৭০-১৮৩১), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ভি আই লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) প্রমুখ। সক্রেটিস সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, 'সক্রেটিস এবং প্লেটোর দর্শনচিন্তার সূক্ষ্মতায় এবং প্রকাশের প্রাঞ্জলতায় অত্যন্ত গভীর এবং আকর্ষণীয় ছিল। এ দর্শন প্রাচীন গ্রিসের দর্শনের বিকাশে একটি নতুন পর্যায়ের সূচনা করে। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রিসের দর্শন ছিল প্রধানত বাস্তববাদী এবং প্রকৃতিবাদী। সক্রেটিস ও প্লেটোর দর্শন মূলত ভাববাদী। সক্রেটিস ও প্লেটোর কাছে ভাবই হচ্ছে

সত্য। মানুষ ভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়। মানুষের মনের ভাব চরম ভাবের প্রকাশ।' (*সেই সব দার্শনিক*, পৃ. ৩৫)

সরদার ফজলুল করিম ছিলেন বইয়ের বলদ। একথা তিনি নিজেই বলেছেন। বইকে তিনি বলেছেন জীবন। তবে যে বই পড়া হয় না, সেই বই বই না। তা চতুষ্কোণাকার একটি জড়বস্তু বিশেষ। মুক্তিযুদ্ধকালের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে জাহানারা ইমামের লেখা 'একাত্তরের দিনগুলি' তিনি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন। বইটি সম্পর্কে মন্তব্য করে তিনি বলেছেন '*একাত্তরের দিনগুলি* আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক টেস্টামেন্ট বিশেষ। দলিল। এ সততায়, সত্যে, আবেদনে, পরিণতিতে, সংযমের অত্যাশ্চর্য প্রকাশে একখানি ধর্মগ্রন্থের রূপ ধারণ করেছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার পাঠকের ঘরে এ গ্রন্থ আজ রক্ষিত। রক্ষিত হওয়ার মতো গ্রন্থ।' (*রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, পৃ. ১৪)

মার্কস-এঙ্গেলস প্রণীত সাম্যবাদের মহান আদর্শকে গ্রহণ করেই তিনি চল্লিশের দশকে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন এবং হাসিমুখে জেল-জুলুম ও নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। ১৯৬২ সালে তৃতীয়বার জেল থেকে বের হয়ে এসে ১৯৬৩ সালে বাংলা একাডেমিতে যোগদান করলেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তখন আগের মতো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না থাকলেও আদর্শ হিসেবে তিনি আজীবন সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের প্রথমদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটলেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, 'আর কেউ কমিউনিস্ট না থাকলেও আমি সরদার ফজলুল করিম একাই কমিউনিস্ট রয়ে যাব।' সেদিন এ-কথা আমাদের সকলকে দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছিল। তিনি তাঁর লেখা 'আমি মানুষ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'সাম্যবাদের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের দূর ভবিষ্যতের অপেক্ষা করতে হয় না। গরিব-ধনী প্রত্যেকটি পরিবারই সাম্যবাদী নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত পরিবার। ছোট-বড়ো, মা-বাবা, ভাই-বোন, অক্ষম-সক্ষম: সকলকে নিয়ে যে পরিবার। সে পরিবারের নীতি হচ্ছে: From each, according to his capacity, to each according to his necessity: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতামতো গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজনমতো প্রদান।

মার্কস-এঙ্গেল স্বপ্নে দেখেছিলেন, পারিবারিক এই সাম্যবাদ নীতি একদিন সমগ্র মানবসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। সমগ্র মানবসমাজই একটি পরিবারে পরিণত হবে। যে মনুষ্যপরিবার পরিচালনার স্বাভাবিক নীতি হবে: প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতানুয়ায়ী গ্রহণ এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান। (*আমি মানুষ*, পৃ.৭৮)

সরদার ফজলুল করিমের লেখালেখি জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৪১-১৯৪২ সালে। তখন তিনি ছিলেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র। সে সময় ঢাকাতে রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১১-১৯৯৭) ও সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২) গড়ে তুলেছিলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ'। এক সময় তিনি ও এ সংগঠনের কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন।

সে স্মৃতিচারণ করে তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকা শহরে প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। এর সাথে আমার সম্পর্ক বাড়তে থাকে। প্রগতি লেখক সংঘের একজন অরগানাইজারও ছিলাম আমি। লেখক তেমনভাবে ছিলাম না অবশ্য। কিন্তু আমি এর ভলান্টিয়ার অনুগত ছিলাম। প্রগতি লেখক সংঘের ‘ক্রান্তি’ নামে একটি পত্রিকা ছিল। সোমেন চন্দের ওপর একটি সংখ্যা বের করে ‘ক্রান্তি’ পত্রিকা। এতে আমার একটি লেখা ছিল ১৯৪৫ সালের তারিখ দেওয়া। কলকাতায় ‘সোমেন চন্দ রচনাসমগ্র’ সঙ্কলনের সম্পাদক একটি নোট দেন আমার লেখাটির নীচে; এই লেখা থেকে প্রমাণ হয় সোমেন চন্দ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও অপরিচিত ছিলেন না, বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তাদের কাছ থেকে। (*সেই সে কাল: কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, পৃ. ৩১-৩২)

সেকাল-একালের দার্শনিকদের চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, ‘আমি মনে করি যে প্লেটো এবং মার্কসের মধ্যে কোনো কন্ট্রাডিকসান নেই। একটা সাধারণ কন্ট্রাডিকসান আছে। তা হল প্লেটো হচ্ছেন আইডিয়ালিস্ট এবং মার্কস হচ্ছেন রিয়ালিস্ট। কিন্তু গভীরে ঢুকলে উভয়ের সাদৃশ্যই পরিস্ফুট হয়। মার্কস প্লেটোকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আইডিয়ালিস্ট মনে করেন। শব্দ ধরে ধরে এ দু’জনের মধ্যে পার্থক্য তুলে বের করার দরকার নেই। দু’জনের মধ্যে সময়গত ব্যবধান খেয়াল রেখো। সক্রেটিসের জবানীতে প্লেটো যখন বলেন যে আমি জানি যে আমি জানি না, ওরা জানে না যে ওরা জানে না। কিংবা প্লেটো যখন বলেন যে যার যা করা উচিত তা করাই হচ্ছে জাস্টিস– এগুলোতো মহামূল্যবান কথা। এগুলো আর কোথায় পাবা। মার্কসীয় দর্শনে আকৃষ্ট একজন লোক হয়েও এগুলোকে ধারণ করায় আমার কোনো অসুবিধা হয় না। কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোটা না পড়লে পড়। পড়ে থাকলে আবার পড়। কাজে দিবে। একটি বিষয়কে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখাটা মার্কসিজম আমাকে শেখায় নাই। মার্কসবাদে প্লেটোকে গ্রেটেস্ট আইডিয়ালিস্ট বলা হয়েছে; গ্রেটেস্ট রাফিয়ান বলা হয় নাই। ফাইটটা হচ্ছে আইডিয়ালিজম এবং মেটারিয়ালিজমের মধ্যে। প্লেটোর পরে অ্যারিস্টটলে এসে একটু অগ্রসরমানতা পাই। অ্যারিস্টটল এ দু’য়ের মধ্যে একটা মিক্স আপ করার চেষ্টা করেছেন।’ (*জীবন জয়ী হবে*, পৃ.৪৬)

এবার সরদার ফজলুল করিমের প্রথমজীবনের লেখালেখির কিছুটা নিদর্শন তুলে ধরছি। দীর্ঘদিন পড়ে থাকা ১৯৪১-১৯৪২ সালে তিনি যে গল্প লিখেছিলেন তার কিছুটা অংশ: ‘ঢাকার ১৯৩৯ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা-হাঙ্গামার কালে অমল পাইল এক ভীষণ আঘাত। হাসপাতালে অমলকে স্থানান্তরিত করা হইল। কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইতে লাগিল। সুরমার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। হাসপাতালে মুমূর্ষু ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া অঝোরে সে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল। সুরমার চক্ষুর সম্মুখে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ লেপিয়া-মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। অমল তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ অমলের এই চলিয়া যাওয়া সুরমার নিকট যে ভবিষ্যতে কী একটা ভয়াবহ আলোড়ন, একটা ভূমিকম্প আনিয়া উপস্থিত করিবে সে কথা সুরমা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, অমল তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে

পারে না। অন্তরের নিগূঢ় ক্রন্দনধ্বনি মুহূর্তে মুহূর্তে সুরমার মুখে প্রকাশ পাইতেছিল: দাদা, তুমি যেও না' . . . (*চল্লিশের দশকের ঢাকা*, পৃ. ১২৮)

নিজের বই প্রকাশের জন্য সরদার ফজলুল করিম কখনো সেভাবে চিন্তা করেছেন একথা সেভাবে প্রকাশ করেননি। কিন্তু স্ত্রীর লেখা প্রথম গ্রন্থ 'হজকথা' (২০০২) প্রকাশের জন্য তাঁর চিন্তা ছিল এবং তাঁর যেটুকু যা করা দরকার করেছেনও। তিনি লিখেছেন 'মাওলা ব্রাদার্সের আসল মানুষ যে, সেই মানুষ কয়েকদিনের মধ্যে চলে গেছে কোলকাতায়। তা আমি জানি। তবু 'হজকথা'র প্রুফ, পরিশিষ্ট ইত্যাদি যদি মামুনের বিশ্বস্ত কর্মী সুদীপ, তপন বা চিন্ময়ের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তবে তারা কাজ কিছু এগিয়ে রাখতে পারবে।

আমার সত্যি একটা চিন্তা, কলির [স্ত্রীর] 'হজকথা' প্রকাশ না করে যদি কাল বা পরশু মারা যাই, তবে কলির মন বলবে, লোকটা নিজের বই কতবার বার করল। কেবল আমার বইটার সময়েই মরে গেল! এটা ঠাট্টা নয়। আমার যথার্থ চিন্তা। (*আমি মানুষ*, পৃ.৪১)

সরদার ফজলুল করিম সারাজীবন দর্শনচর্চা করেছেন। ভারি ভারি লেখা লিখেছেন। কিন্তু সংসার বা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কিছু লিখেছেন তা বিশেষ একটা দেখা যায় না। তাঁর স্ত্রী সুলতানা রাজিয়া লিখেছেন, 'সরদার সাবকে জেল থেকে বেরিয়ে সংসারের জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। বাংলা একাডেমিতে অনুবাদ বিভাগের চাকরি, নিজের লেখালেখি, এদিকে 'সংবাদ' দৈনিক পত্রিকার অফিসে কাজ নিয়েছিল, সম্পাদকীয় লেখা, কিম্বা ফিচার লেখা এসব করতে হতো। কাজেই একেবারে অবসর পেত না।' (*স্মৃতির কুসুমমালিকা*, পৃ.১৪৫)

তাঁর পারিবারিক জীবনেরও কিছুটা স্মৃতি তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন: 'রবির বয়স বোধহয় এখন ছয় পেরুচ্ছে। রবি তার আঁকা ছবি দেখাল। বাংলা ডিজনীর কুসুম কুমারীর গল্প পড়ে পড়ে শোনাল। নিজের হাতের লেখা দেখাল। আমি চমকে উঠলাম। ওর হাতের লেখা আমার চাইতে অনেক ভালো। নারগিসের লেখা আরও ভালো।

রবি আমার সঙ্গে খেলল। আমার পাশে ঘুমাল। আমি ওর গায়ে হাত রেখে ওর পাশে শুলাম। একসঙ্গে খেলাম। ও পাল্লা দিয়ে আমাকে হারিয়ে দিল। জ্যোতি, নারগিস, রবি: যেন তিনজনই তিনজনের সঙ্গী। বিকেলে নারগিসের দেওয়া লিস্টি ধরে বাজার করলাম। . . . জ্যোতির চাহিদামতো প্লাস্টিকের একটি বালতি কিনলাম। সেটি বাসায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে সে বলল: এটা নয়। আর একটু বড় লাগবে। আমি রাগ না করে বললাম: ঠিক আছে আমি বদল করে আনছি।

সন্ধ্যা সাতটার দিকে ছুটি পেলাম। জ্যোতি কাঁঠাল কিনেছে। নারগিস একটি আইসক্রিমের বাটিতে তার বেশকিছু কোষ আমাদের বাসায় জন্য দিল, কলির জন্য দিল। রবি বলল: দিদাকে খেতে বলবা। না, খেলে আমি কিন্তু রাগ করব।

আমি বললাম: না, তোমার দিদাও খাবে, আমিও খাব। একটি বেবি পেয়ে গেলাম। নিরাপদেই রাত আটটার দিকে বাসায় ফিরলাম। কলি দরজা খুলে বলল: আজ এত সকালে ফিরতে পারলে!

হ্যাঁ, এবং মনের আনন্দে ফিরেছি। কোনো ঝামেলা হয়নি। জ্যোতি খুব সুন্দর মেজাজে কথা বলেছে। বলেছে: তোমার কষ্ট হলে, তুমি আসবা না। আমি তোমার বাসায় যাব।

আমি বলেছি: ঠিক আছে। কিন্তু তোমাদের যে দেখতে ইচ্ছা করে।

কলি বলল: দেখবা, জ্যোতি অনেক ভালো হয়ে যাবে।

আমি বললাম: ভালো তো হচ্ছে।' (*আমি মানুষ*, পৃ. ১৪-১৫)

সরদার ফজলুল করিমের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য (১৮৯০-১৯৫৫) তাঁর এ প্রিয় ছাত্রটিকে একটি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাওয়ার পর ১৯৪৭ সালে। নিজহাতে টাইপ করা ও স্বাক্ষর করা প্রশংসাপত্রের একটি অংশে তিনি বলেছিলেন, 'সে (জনাব সরদার) সুখ্যাত ছিল তাঁর সমাজসেবার জন্য এবং গরিব ও অভাবী মানুষদের প্রতি তার সহানুভূতির জন্য। তার শিক্ষকেরা সকলেই তাকে প্রশংসা করেছেন এবং তা সঙ্গত কারণেই।' সারাজীবন তিনি তার মূল্য দিয়েছেন। তারপর ৮৯ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক সম্মাননা, পুরস্কার ও পদক পেয়েছেন। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করে প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে অনেকে লেখালেখি ও গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তাঁর চিন্তাচর্চা ও জীবন-দর্শন তুলে ধরেছেন। তাঁকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়েছে ও প্রচারিত হয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কার ও সম্মাননা সমূহের মধ্যে বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৭), স্বাধীনতা পুরস্কার (২০০১) এবং জাতীয় অধ্যাপক (২০১১) ছাড়াও *দৈনিক জনকণ্ঠ*, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী, ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীসহ বহু সংগঠন ও সংস্থা সম্মাননা ও পদক দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর স্মৃতিনিদর্শন (২০১৪) সংরক্ষণ করেছে। তিনি ছিলেন বাংলা একাডেমির সম্মানিত ফেলো।

সরদার ফজলুল করিম আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাঁর জীবন-দর্শন এবং চিন্তাচর্চার ধারা চিরকাল আমাদের প্রাণিত করবে। তাঁর অমর কথা দিয়ে শেষ করছি: 'জীবনই জয়ী হবে, মৃত্যু নয়।'

তথ্যনির্দেশ:

১) *আমি মানুষ*– সরদার ফজলুল করিম, কথা প্রকাশ, ঢাকা।
২) *সেই সব দার্শনিক*– সরদার ফজলুল করিম, কথা প্রকাশ, ঢাকা।
৩) *জীবন জয়ী হবে*– শান্তনু মজুমদার, সময় প্রকাশন, ঢাকা।
৪) *সেই সে কাল: কিছু স্মৃতি কিছু কথা*– সরদার ফজলুল করিম, প্যাপিরাস, ঢাকা।
৫) *চল্লিশের দশকের ঢাকা*– সরদার ফজলুল করিম, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা।

৬) *রুমীর আম্মা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*– সরদার ফজলুল করিম, সাহিত্য প্রকাশন, ঢাকা ।
৭) *স্মৃতির কুসুমমালিকা*– সুলতানা রাজিয়া, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা ।

প্র তি ক্রি য়া

বদলে যাচ্ছি আমি

....

কা লী প্র স ন্ন দা স

বদলে যাওয়া মানে পরিবর্তিত হওয়া। মানুষ তো অবিরত বদলাচ্ছে। কারণ, মানুষের শরীরে অনবরত কোষগত পরিবর্তন চলছে। এ পরিবর্তন শারীরিক। 'বদলে যাচ্ছি আমি' বলতে শারীরিক পরিবর্তনকে বোঝাচ্ছি না। বরং মানসিক পরিবর্তন, অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণের পরিবর্তন বোঝাচ্ছি। এই পরিবর্তন এমনি এমনি ঘটে যাচ্ছে, এমন নয়। বরং সুচিন্তিতভাবে, ইচ্ছা করে, উদ্দেশ্য নিয়েই নিজেকে বদলানো। আমি মনে করছি এ পরিবর্তন স্বাস্থ্যকর।

প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ২০০৮-এ। আইন ও সালিশকেন্দ্র আয়োজিত ঞঅ-১০১ প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে। ঞঅ-১০১-এ প্রশিক্ষণার্থীর জীবনের পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ বা স্ক্রিপ্ট অ্যানালাইসিস করা হয় না। পাণ্ডুলিপির উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভারতের আশা কাউন্সেলিং এন্ড ট্রেনিং সার্ভিসেস-এর অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক পি. কে. সারু (P.K.Saru) ছিলেন আমাদের প্রশিক্ষক। তাঁর প্রশিক্ষণ আমাকে সজাগ করে। আমার জীবন-পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন উপাদানের অবস্থা আমি বুঝতে পারি।

ইগোগ্রাম পাণ্ডুলিপির অন্যতম একটি উপাদান। ইগোগ্রাম বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে পারি আমার ফাংসনাল ইগোগ্রামে অভিযোজিত বা মেনে চলা শিশু (AC) এবং যত্নশীল অভিভাবক (NP) অনেক চড়া (high) হয়ে আছে। ড্রাইভার বা চালক বিশ্লেষণ করে জানতে পারি, 'অন্যকে খুশি করা' (Please Others) আমার প্রধান চালক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'নিখুত হওয়া' (Be Perfect) ও শক্ত বা 'দৃঢ় থাকা' (Be Strong)। এ তিনটি চালক আমাকে পরিচালনা করছে। শিশুকালে আমার যে জীবন-অবস্থান বা লাইফ পজিসন গড়ে উঠেছে তা হল, 'আমি ঠিক নাই'/'তুমি ঠিক আছ' (I'm not- OK/You'r OK)। জীবনে আমি অনেককিছু অর্জন করেছি। এ সত্ত্বেও আমার অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণে ছাপ মেরে আছে, 'আমি ঠিক নাই'। এক প্রকারের শূন্যতা, অতৃপ্তি, অসন্তোষ আমাকে ঘিরে আছে।

স্ট্রোক (Stroke) বা স্বীকৃতির দিক থেকে আমার ধরন হল, আমি স্বীকৃতি দিতে পারি, তবে স্বীকৃতি পেলে গ্রহণ করতে পারি কম। কেউ আমাকে স্বীকৃতি দিলে বা প্রশংসা করলে আমি বিব্রত বোধ করি। ভাবখানা এমন যে, 'এ মনিহার আমায় নাহি সাজে'। অথচ ভিতরে ভিতরে স্বীকৃতি পাওয়ার প্রত্যাশা আছে। আবার আমি মুখ ফুটে স্বীকৃতি চাইতে পারি না। কেউ আমার সমালোচনা করলে বা নেতিবাচক স্বীকৃতি দিলে আমি তা সাগ্রহে গ্রহণ করি এবং নিজেকে ছোট বা ব্যর্থ ভাবতে শুরু করি। এ জায়গাটা আমার খুব পছন্দ। যে সমালোচনা আমার উপর প্রযোজ্য নয় সে সমালোচনাকেও আমি গুরুত্ব দেই। ঝেড়ে-মুছে ফেলে দিতে পারি না।

আমার মধ্যে হীনম্মন্যতা কাজ করে। আমার মনে হয় আমি পারি না, অন্যেরা পারে। অথচ নিজের পারার সংখ্যা কম নয়। এগুলোর উপর চোখ বুলাই না, গুণে দেখি না, উপভোগ করি না। অর্জনের উপর মালিকানাবোধ জন্মালে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় সে তৃপ্তি আমার কম। আমি প্রধানত নিজেকে অবজ্ঞা বা ডিসকাউন্ট করি।

নিজের পাণ্ডুলিপির উপাদান বিশ্লেষণ আমাকে আমার অতৃপ্তি-অসন্তোষ-শূন্যতা-কষ্ট ইত্যাদির উৎস আবিষ্কারে সহায়তা করে। আমি বুঝতে পারি আমার অতৃপ্তির কারণ অন্য কেউ নয়, বরং আমি নিজে। আমার নিজের মধ্যেই এগুলো রয়েছে। আমি এ-ও বুঝতে পারি যে, দায়িত্ব নিলে, উদ্যোগ গ্রহণ করলে, আমি আমার সমস্যার নিরসন করতে পারব।

কোর্স শেষ হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যেই আমি একজন কাউন্সেলরের কাছে যাই। তিনি জানতে চান, কেন আমি কাউন্সেলিং নিতে চাই? আমার উত্তর ছিল 'পারসোনাল গ্রোথ' বা ব্যক্তিগত বর্ধন। এ ধারণাটি আমি এঃঅ-১০১ থেকে পেয়েছিলাম। 'পারসোনাল গ্রোথ' ব্যক্তিকে 'অটোনমি' বা স্বায়ত্তশাসণের স্তরে নিয়ে যায়। তখন আমি 'অটোনমি' বলতে বুঝতাম, আমার চারপাশে যাই ঘটুক, আমি যেন সবকিছুর মধ্যেই নিজেকে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত রাখতে পারি এবং আমার লক্ষ্য অনুসারে আমার করণীয় করতে পারি। এখন 'অটোনমি' শব্দটি আমার কাছে আরো সুনির্দিষ্ট অর্থ ধারণ করে। 'অটোনমি' বলতে আমি এখন তিনটি বিষয় বুঝি। আমি যেন আমার পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে পারি। অর্থাৎ আমি যেন প্রতি মুহূর্তের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ ও শব্দ উপভোগ করতে পারি। অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণের ক্ষেত্রে আমি যেন নানা বিকল্প থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার পছন্দনীয়টিকে গ্রহণ করতে পারি। আর আমি যেন আমার অনুভূতি অন্যের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারি, এবং আমার যা প্রয়োজন তা চাইতে পারি।

আমি কাউন্সেলিং নেওয়া শুরু করি, এবং কাউন্সেলরের কাছ থেকে বই ধার নিয়ে এঃঅ সম্বন্ধে পড়তে থাকি। অনেকটা যেন নেশাখোরের মতো! তিনি উদার হস্তে আমার এ চাওয়া পূরণ করতে থাকেন।

লক্ষ্য স্থির করি, এঃঅ ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হব। প্রতীক্ষা করি এবং সক্রিয় থাকি। ভর্তি হই। এক বছরের কোর্সের শর্ত ১২৫ ঘণ্টার প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ, ২০০ ঘণ্টা কাউন্সেলিং করা, ৩০ ঘণ্টার সুপারভিশন বা তত্ত্বাবধান নেওয়া, বই খোলা রেখে লিখিত

পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর লেখা, এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পরীক্ষকদের সামনে লাইভ কাউন্সেলিং। ডিপ্লোমা কোর্সের এসব শর্ত পূরণ করা ছাড়াও এ সময়ে আমি আমার কাউন্সেলরের কাছ থেকে ২৪ ঘণ্টার পার্সোনাল আওয়ার বা কাউন্সেলিং নেই। কোর্সের আগাগোড়াই আমার আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল। কোর্স চলাকালীন সময়ে আমার মাতৃবিয়োগ ঘটে। মায়ের জীবনের শেষ দিনগুলোতেও আমি তাঁর খুব কাছাকাছি ছিলাম। তাঁর অসুস্থাবস্থায় শয্যাপাশে বসে আমি TA 'র লিখিত পরীক্ষার উত্তর লিখছি, এ দৃশ্য আমার চোখে এখনও স্পষ্ট। বাম হাতে মাতৃশয্যা, ডান হাতে ঞঅ-এর অ্যাসাইনমেন্ট। এ দুটি বিষয় আমার জীবনে তখন পরস্পরের পরিপূরক।

১ থেকে সর্বোচ্চ ৭ বছর। এ সময়ে অভিভাবকদের প্রভাবে প্রতিটি শিশুর জীবনের পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। এই পাণ্ডুলিপিই সারাজীবন ধরে ব্যক্তির অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, যদি সচেতনভাবে সে তা পরিবর্তন না করে। তার বয়স বাড়ে, যোগ্যতা বাড়ে, দায়িত্ব বাড়ে। কিন্তু নিজের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে আসে না। অতীতে অভিভাবকদের প্রভাবে লিখিত পাণ্ডুলিপিই তাকে পরিচালনা করে। যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই এ কথাটি প্রযোজ্য। এটাই মানুষের বাস্তবতা। ডিপ্লোমা কোর্সে নিজের পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ করা হয়। এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ঞঅ-১০১ এর উপলব্ধিকেই আমি পুনরাবিষ্কার করি। কেবল জীবন-অবস্থান-এর ক্ষেত্রে একটি নতুন উপলব্ধি জন্মে। তা হল, আমার জীবন-অবস্থান 'আমি ঠিক নাই'/'তুমি ঠিক আছ' নয়, বরং তা হল, 'আমিও ঠিক নাই'/'তুমিও ঠিক নাই', বা not-Ok/not-Ok। প্রশিক্ষক পি. কে. সারুর সহায়তায় আমার এই আবিষ্কার।

কী ভয়ঙ্কর এই আবিষ্কার! আমি আঁতকে উঠি। এমন একটি জীবন-অবস্থান নিয়ে আমি জীবনযাপন করছি! আমার কষ্ট, আমার অতৃপ্তি, আমার শূন্যতাবোধের উৎস আমি দেখতে পাই। অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণে এর প্রতিফলন উপলব্ধি করি। প্রতিজ্ঞা করি এই জীবন-অবস্থান আমি পরিবর্তন করব।

অনুভব, চিন্তা ও আচরণ, এই তিনটি বিষয়েই আমি সচেতন থাকার প্রতিজ্ঞা করি। 'আমার মধ্যে এই মুহূর্তে কী ঘটছে'– এ প্রশ্নকে সর্বদা সজাগ রাখাই হল 'সচেতন' থাকা। বুঝতে পারি, আমার পরিবর্তনে সচেতনতাই আমার অন্যতম সহায়ক।

বাস্তবতা হল, জীবনের পাণ্ডুলিপির একটি উপাদানে পরিবর্তন আনতে পারলে বাকিগুলোর উপর আপনা-আপনি এর যথাযথ প্রভাব পড়ে। সেগুলোও পরিবর্তিত হয়। যেমন, ইগোস্টেট, জীবন-অবস্থান, চালক বা ড্রাইভার, স্ট্রোক বা স্বীকৃতির ধরন, অবজ্ঞা বা ডিসকাউন্টিং ইত্যাদির যেকোনো একটি পরিবর্তিত হলে অন্যটিও এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়।

আমি আমার ফাংসনাল ইগোস্টেট-এ মুক্ত শিশুকে (FC) বড় বেশি চেপে রেখেছিলাম। ইচ্ছামতো কোনোকিছু করা, সশব্দে, মুক্ত মনে হাসা, নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ করা প্রভৃতি আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। অন্যের মন রক্ষা করতে করতে, কাঁটায় কাঁটায় নিয়ম রক্ষা করতে করতে, অন্যের দায়িত্বের ভার নিতে, আগ বাড়িয়ে

অন্যকে সহায়তা করতে গিয়ে 'নিন্দার কাঁটা'য় আহত হতে হতে, অপরিমিতভাবে অন্যের সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে করতে, অন্যের ফরমায়েশ খাটতে খাটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। 'না' বলতে পারা প্রত্যেক মানুষের জন্য নিজেকে রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে অনুভব করি আমি এ ক্ষমতার ব্যবহার করছি না। কীভাবে না বলি!, এই সংকোচ আমাকে আঁকড়ে ধরত। সঙ্গত কারণে কাউকে 'না' বললেও তার মনরক্ষা করতে পারলাম না বলে আমি মনে মনে কুঁকড়ে থাকতাম। যেন কত বড় অপরাধ করে ফেলেছি। অনেকদিন পর্যন্ত আমার খারাপ লাগত। 'না' বলতে না-পারার কারণে প্রায়শই আমি আমার ক্ষমতার চেয়ে বেশি দায়িত্ব গ্রহণ করতাম। এই দায়িত্ব সম্পাদন করা আমার পক্ষে অসম্ভব, তা আমি শুরু থেকেই জানতাম। অথচ 'না' বলার যে সংকোচ তার দায়িত্ব গ্রহণ না করে আমি বরং কাজটি করার দায়িত্ব নিতাম, এবং যন্ত্রণায় দগ্ধ হতে থাকতাম। এসব কারণে প্রায় সারাদিন আমি যেন অন্যের ইচ্ছায় পরিচালিত হতাম। নিজের ইচ্ছা অপরিতৃপ্ত থাকত। সেই বেদনায় খুঁড়ে খুঁড়ে মরতাম। অন্যদের উপর বিরক্ত হতাম। অথচ তা প্রকাশ করতাম না। ফলে সম্পর্কগুলো আমার জন্য কষ্টকর ও বোঝা হয়ে পড়েছিল। আমার মানসিক অবস্থা অরক্ষণীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। মনে ক্ষোভ জমা হয়ে থাকত এবং তা যেখানে সেখানে অস্থানে-অপাত্রে বিকৃতরূপে প্রকাশিত হত। এর জন্য আবার অনুশোচনায় ভুগতাম। কখনো কখনো এই প্রকাশ নতুন বাস্তব সমস্যার জন্ম দিত।

TA আমাকে এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ করে। শুধু তাই নয়, অবস্থা পরিবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। শক্তি ও সাহস জোগায়। আমি নিজেকে বদলানোর জন্য নিজের উপর কাজ করতে শুরু করি। এঞঅ তত্ত্বের চশমা চোখে দিযে সচেতনতা নিয়ে নিজের দিকে তাকাই।

আমি উপলব্ধি করি, আমি যা করছি, এঞঅ -এর ভাষায় তা স্ট্রোক বা স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য করছি। কিন্তু পাচ্ছি কি? না। এর জন্য দায়ী কে? পরিবার, সমাজ, দেশ বা জাতি? না। আমি নিজে। কারণ, আমি যে স্বীকৃতি চাই তা কী করলে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সজাগ না থেকেই আমি তা পাওয়ার জন্য কাজ করছি। আমি বুঝতে পারি, আমি আমার লক্ষ্য সম্পর্কে সজাগ ও সুস্পষ্ট নই। তাই আমার লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতিও ত্রুটিপূর্ণ। আমি ছোটবেলায় লক্ষ্য অর্জনের যে পদ্ধতি শিখেছি সে পদ্ধতি অনুসারে এখনও কাজ করছি। এই পদ্ধতি পুরনো। আমি এই পদ্ধতি আপ-টু-ডেট বা সাম্প্রতিকীকরণ করিনি। আমি (Hear-and-Now) বা 'যখন যেখানে আছি তখন সেখানে' নেই। বেশিরভাগ সময় আমি আমার শিশু (C) বা অভিভাবক (P) ইগোস্টেটে থাকছি। ফলে কাজ হচ্ছে, ফলও ফলছে। হিসাবের খাতায় আমার অর্জনের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু আমার কাম্য স্বীকৃতি বা প্রশংসা মিলছে না। ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে প্রায় সব অর্জনই আমার জন্য পণ্ডশ্রম বলে বিবেচিত হচ্ছে। আমার শূন্যতা, অসন্তোষ ও কষ্ট বাড়ছে। সুতরাং আমাকে বদলাতে হবে।

প্রশিক্ষণ, সুপারভিশন, কাউন্সেলিং নেওয়া, কাউন্সেলিং করা, এমনকি লিখিত পরীক্ষার উত্তর লেখা– ডিপ্লোমার এ সবকটি উপাদান আমাকে সহায়তা করে। এর

বাইরেও আমি একটি উল্লেখযোগ্য সহায়ক জায়গা পাই। তা হল আমাদের দল। আমরা যারা একসঙ্গে ডিপ্লোমা করছিলাম তাঁদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা। তাঁদেরকে দেখে, তাঁদের কথা শুনে, তাঁদেরকে বলে ও অনুভব করে আমি নিজেকে জানার ও নিজেকে পরিবর্তন করার পথ প্রশস্ত করি। আমরা বাংলাদেশে এঃঅ ডিপ্লোমার দ্বিতীয় ব্যাচ। ডিপ্লোমার প্রথম ব্যাচের অনেকেই Certified Transactional Analyst (CTA) কোর্স করছেন। তাঁদের প্রায় সকলে অগ্রজের মতো আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, সঙ্গে থেকেছেন, যত্ন নিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক আমার পরিবর্তনে সহায়তা করে।

পরিবর্তন যে ঘটছে তা বুঝতে পারি। যেমন, এঃঅ -এর ভাষায় বললে, আগে আমি ড্রামা ট্রায়াঙ্গালে (Drama Triangle) বেশিরভাগ সময় উদ্ধারকারী (Rescuer) হয়ে ঢুকতাম। কিছুক্ষণ পর ভূমিকা পরিবর্তন করে ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) হয়ে বেরুতাম। কখনোবা অভিযোগকারী (Persecutor) হয়ে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যে ভূমিকা পরিবর্তন করতাম এবং ক্ষতিগ্রস্ত (Victim) অবস্থানে অবস্থান নিতাম। উভয় ক্ষেত্রেই কষ্ট (pay off) ছিল অবধারিত। এটা আমার পাণ্ডুলিপি। আমি পাণ্ডুলিপি অনুসারে চলতাম। মনে করতাম এই কষ্ট আমার 'ভাগ্যলিখন'। এ বুঝি বদলাবে না। এখন সচেতন থাকছি। পাণ্ডুলিপি অনুসারে নয়, সচেতন সিদ্ধান্ত অনুসারে চলছি। ড্রামা ট্রায়াঙ্গালে বেশিক্ষণ অভিনয় করছি না। সচেতন থাকছি। কষ্টের জগৎটাকে যে একেবারে বিদায় করতে পেরেছি তা বলব না। বরং প্রক্রিয়ার মধ্যে আছি। আগের চেয়ে অনেক ভালো আছি। সুস্থ আছি।

আগে অন্যের অসুবিধা শোনামাত্রই তাকে সহায়তা করতে এগিয়ে যেতাম। না চাইতেই। এতে অনেক সময় কপালে উল্টো ফল ফলত। প্রশংসা পেতাম না। কখনোবা সমালোচনা পেতাম। ঐ যে বলেছি, উদ্ধারকারী থেকে ক্ষতিগ্রস্ত! এখন গায়েপড়ে কাউকে সহায়তা করতে যাচ্ছি না। এছাড়া কাউকে সহায়তা করার সময় 'আমি কী উদ্দেশ্যে তাকে সহায়তা করছি', সে সম্পর্কে সজাগ থাকছি। অর্থাৎ একটি কাজ করার আগে নিজেকে প্রশ্ন করছি, এ কাজ আমি কেন করছি? এ কাজ করার মধ্যে আমার জন্য কী রয়েছে? আগে এ রকম প্রশ্ন মনে এলে ভাবতাম 'আমি স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছি'। এখন বুঝতে পারি, 'আমি নিজেকে রক্ষা করছি'। এ দুটি প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে সচেতন হয়ে কাজ করার ফলে আমার কাজ আমাকে কষ্ট দিতে পারছে না। বরং কাজে আনন্দ বাড়ছে। আগ্রহ থেকে কাজ করছি। অন্যের সঙ্গে কাজের সময় TA এর Contract এর ধারণা মাথায় রাখছি। এতে কাজও ভালো হচ্ছে সম্পর্কগুলোও স্বাস্থ্যকর হচ্ছে।

একটা উদাহরণ দেই। এই লেখা তৈরি করার আগেও আমি নিজেকে ওই প্রশ্ন দুটি করেছি, এবং উত্তর জেনেই লিখতে বসেছি। ফলে লেখার আগ্রহ ও আনন্দ বেড়ে গেছে। যিনি এ লেখা পড়বেন তিনিও যদি লেখা পড়তে শুরু করার আগে-ভাগেই এ দুটি প্রশ্ন নিজেকে করে নেন তাহলে, আমার মনে হয়, তার ক্ষেত্রেও একই বিষয় ঘটবে।

নিজেকে রক্ষা করার সচেতনতা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমার চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণে পরিবর্তন এসেছে। যারা পাশে ছিল, আছে, তাদের গায়ে আমার পরিবর্তনের আঁচড় লাগছে। কেউ কেউ বলছে, 'তুমি বদলে যাচ্ছ'। আমি স্বীকার করছি। কখনও-বা বদলানোটা ব্যাখ্যা করছি। অনেকে গ্রহণ করছে। কেউ কেউ করছে না। সমালোচনা করছে। কেউ কেউ হতাশ হচ্ছে, কেউ বা আক্রমণ করছে। আমি সচেতন থাকছি। সম্পর্ক থাকছে। সম্পর্কেও ধরণ পাল্টাচ্ছে। সম্পর্কগুলোর মধ্যে পরিমার্জন চলছে। সংযোজনও হচ্ছে। TA 'র ভাষায়, আমার নেতিবাচক যত্নশীল অভিভাবক (-NP) ও নেতিবাচক অভিযোজিত শিশু (-AC) ইগোস্টেট তুঙ্গে থাকার কারণে যেসব অস্বাস্থ্যকর পরজীবিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (unhealthy symbiosis) সেসব সম্পর্ক পরিমার্জিত হচ্ছে, ধরন বদলাচ্ছে। সম্পর্কের মধ্যেকার কষ্ট কমছে। আমি যেমন 'নিজেকে রক্ষা করছি' তেমনি আমার ক্ষমতানুযায়ী আমি 'অপরকেও রক্ষা করছি'। TA এর Permission, Protection, Potency (3Ps) এ তিনটি ধারণা সম্পর্কেও আমি সচেতন থাকছি। আমার এই সচেতনতা যেমন আমার জন্য তেমনি যারা আমার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের জন্যও স্বাস্থ্যকার। এটা আমার ধারণা।

সময় কাঠামোর (Time Structure) ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। TA এর তত্ত্ব অনুসারে মানুষ ছয় উপায়ে তার সময় কাটায়। Withdrawal, Rituals, Pastime, Activities, Psychological Games, Intimacy। ডিপ্লোমা করার আগে আমি মনে করতাম এই ছয়টি সময় কাঠামো পরস্পর স্বতন্ত্র। একটি যখন ঘটে, অন্যটি তখন ঘটে না। ডিপ্লোমার পরে মনে হলো, সময় কাঠামোগুলোর একটির মধ্যে অন্যটি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন, আমি যখন Activities করছি তখন এর মধ্যেই এধসবং বা Intimacy বা Pastime বা Rituals বা Withdrawal করতে পারি। এই উপলব্ধি আমাকে সুবিধা দেয়। যেমন, আমি Intimacy বাড়াতে চাচ্ছিলাম। Intimacy বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি TA এর Intimacy 'র সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। TA এর ধারণা অনুসারে আমি যখন আমার মনের কথা, আমার চিন্তা, অনুভূতি এবং আমার প্রয়োজন বা চাওয়া অন্যের সামনে সততা ও বিশ্বাসের সঙ্গে, মুক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি তখনই আমি Intimate। TA এর ধারণা অনুসারে অন্যের সামনে Intimacy প্রকাশ করতে হলে নিজের সঙ্গে Intimate হতে হয়। আমার ধারণা ছিল, এর জন্য আলাদা করে সময় রাখতে হবে। সময় কাঠামোর ধারণা সম্বন্ধে আমার উপলব্ধির পবির্তন ঘটায় আমি এখন Activities বা Pastime বা Rituals এর মধ্যেই Intimacy 'র জন্য একখণ্ড সময় বের করতে পারি। এর জন্য আলাদা করে সময় রাখতে হয় না। ফলে আমার সময় কাঠামোতে Intimacy আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে জায়গা করে নিতে পারে।

সময় কাঠামোতে এধসবং স্বীকৃতি বা স্ট্রোকের শক্তিশালী উৎস। তবে এধসবং থেকে পাওয়া স্বীকৃতি ইতিবাচক নয়, নেতিবাচক। স্বীকৃতিতত্ত্ব অনুসারে, ইতিবাচক স্বীকৃতি না পেলে মানুষ নেতিবাচক স্বীকৃতি কামনা করে। যে শিশু প্রশংসা পায় না সে দুষ্টামি করে সমালোচনা বা শাষণ আদায় করে। সমালোচনা বা শাষণ তার জন্য

স্বীকৃতি, হোক-না তা নেতিবাচক। আমার সময় কাঠামোতে এখন এধসবং এর জন্য জায়গা কমে গেছে। কারণ, আমি সচেতন হয়েছি। ফলে আমার স্বীকৃতির উৎসে বেশ ভাটা পড়েছে। এধসবং থেকে আসা নেতিবাচক স্বীকৃতিগুলোকে আমি এখন খুব মিস করি। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব একা মনে হয়। শূন্যতা অনুভব করি। বুঝতে পারি, এই একাকীত্ব বা শূন্যতা আসলে স্বীকৃতির অভাববোধ। আগে হয়তো এ অভাব এধসবং থেকে পাওয়া কষ্ট (Payoff) দিয়ে, অর্থাৎ নেতিবাচক স্বীকৃতি দিয়ে পূরণ করতাম। কষ্টে কষ্টে জীবন ভরিয়ে তুলতাম। এখন তা করি না। বরং অন্যভাবে সময় কাটাই। TA 'র একজন প্রশিক্ষকের পরামর্শ ছিল, বাড়িতে এ রকম শূন্যতা অনুভব করলে মিউজিক দিয়ে নাচতে শুরু করুন। সত্যিই আমি ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে দিন-দুপুরে দরজা বন্ধ করে নাচতে শুরু করি। কাজ হয়। মনে ছন্দ আসে, শরীরে ঘাম ঝরে। আনন্দ আর ক্লান্তি দুটোই লাগে। এধসবং করার প্রয়োজন হয় না। ছেলের বয়স তেরো। সে বাসায় থাকলে দেখে। হাসে। মাঝে মদ্যে সেও এসে যোগ দেয়। তেরোয়-তিপ্পান্নোয় নাচটা ভালোই জমে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কও হৃদ্য হয়। এটাও আমার পরিবর্তন। আগে এমন করতাম না।

এই পরিবর্তন যে স্থির তাও নয়। এটি একটি প্রক্রিয়া। আমার মনে হয় এর শেষ নেই। নিজের জীবনের পাণ্ডুলিপি নিজের হাতে লিখতে গেলে সারাজীবন ধরেই লিখতে হয়। দায়িত্ব নিয়ে সচেতনভাবে জীবনযাপন করাই হলো পাণ্ডুলিপি রচনা। আর, পাণ্ডুলিপি রচনার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা স্বায়ত্বশাষণ বা 'অটোনমি' অর্জনের অন্যতম পথ। আমি এ পথের একজন পথিক। এতেই আমার সন্তুষ্টি, আমার আনন্দ।

স মা জ ও বি জ্ঞা ন / প্র ব ন্ধ

বাংলাদেশে সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা

....

ন জ রু ল ই স লা ম

ভূমিকা

আগামী দিনের বাংলাদেশকে যদি বাঞ্ছিত ধারায় অগ্রসর হতে হয়, তবে সে ধারার একটি সঠিক রূপরেখা প্রণয়ন জরুরি, কেননা পরিবর্তনের যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখা ছাড়া সে পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। সে জন্য আবার প্রয়োজন সঠিক ধরনের সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা। দুঃখজনক হলেও সত্য, বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা প্রায়ই সঠিক ধারায় অগ্রসর হচ্ছে না। ফলে বিভিন্ন অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য এই চর্চার ওপর ভর করেছে। কী এসব ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য এবং কেন সঠিক ধারায় বাংলাদেশকে অগ্রসর করার লক্ষ্যে সামাজিক বিজ্ঞানের বাঞ্ছিত ভূমিকা বাস্তবায়নের জন্য এসব বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করে গণমনস্ক, গতিশীল এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন, সেসব প্রশ্ন আলোচনার জন্যই এ প্রবন্ধ।

মানুষ নিয়েই সমাজ এবং মানুষের প্রয়াসের মাধ্যমেই সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। মানুষের এই প্রয়াস নিশ্চয়ই সচেতনতা দ্বারা তাড়িত হয়। কিন্তু এই সচেতনতা সব সময় ও সবার জন্য সমাজের বৃহত্তর পরিবর্তনের লক্ষ্যে ধাবিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ মানুষের সচেতন প্রয়াস তাদের উপস্থিত স্বার্থবোধ দ্বারাই প্রবুদ্ধ হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রয়াসও সম্মিলিত হয়ে এবং সময়ে বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তন ডেকে আনে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের রিচার্ড আর্করাইট যখন সুতা বুননের ক্ষেত্রে হস্তচালিত চরকার স্থলে মেশিনচালিত চরকা নির্মাণ ও চালু করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন, তখন তিনি নিজের উপস্থিত স্বার্থ তথা অধিকতর মুনাফা অর্জনের তাগিদ দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা আরও অনেকের প্রচেষ্টার সঙ্গে যোগ হয়ে এবং সময়ের ধারায় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সূচনা করে এবং অবশেষে গোটা পৃথিবীকে বদলে দেয়।

কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগত স্বার্থবোধই মানুষের সচেতন প্রয়াসের একমাত্র উৎস নয়। বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনও মানুষের সচেতন প্রয়াসের আরাধ্য হতে পারে। বস্তুত, কারও কারও জন্য এটাই সর্বক্ষণের মূল করণীয় হয়ে উঠতে পারে। আর সমাজের ব্যাপক অংশের জন্য এটা কখনো কখনো মূল করণীয় হতে পারে। বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যাভিসারী প্রয়াসের সঙ্গে উপস্থিত স্বার্থবোধতাড়িত ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রয়াসের সংযোগ সাধনই অনেক সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কীভাবে এ কর্তব্য পালন সম্ভব? এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন আরাধ্য পরিবর্তনের যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখা প্রণয়ন। কিন্তু ইতিমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে যে, এই রূপরেখা প্রণয়নের জন্য আবার সঠিক ধারার সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা প্রয়োজন। এর কোনোটিই সহজে হওয়ার নয়। বর্তমান প্রবন্ধে সামাজিক পরিবর্তন এবং সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার বিবিধ সমস্যা ও তা সমাধানের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হবে।

এ প্রবন্ধের আলোচনার কাঠামোটি নিম্নরূপ। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যুক্তিসিদ্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়নে সামাজিক বিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির মূল বা চতুর্থ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার তিনটি অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হল, উন্মার্গগামিতা, একদেশদর্শিতা ও গতি-অনবধানতা। এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে কীভাবে বাংলাদেশে পরিবর্তনের লক্ষ্যটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা এ অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সবশেষে, পঞ্চম অনুচ্ছেদে প্রবন্ধটির উপসংহার পরিবেশিত হয়েছে।

পরিবর্তনের পূর্বশর্ত: যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখা

মার্ক্সের একটি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উক্তি আছে:

তাঁতির মতোই বুনন করে মাকড়সা; আর মৌমাছির চাকের গঠন অনেক স্থপতিকে লজ্জায় ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে অসফল স্থপতিও শ্রেষ্ঠ মৌমাছির চেয়ে এ কারণে পৃথক যে, বাস্তবে কোনো ইমারত নির্মাণের আগে তাকে সে নিজের মস্তিষ্কে, অর্থাৎ চিন্তায় বা কল্পনায় নির্মাণ করে নেয়। শুরুতেই যেটা চিন্তায় থাকে, কর্মের শেষে আমরা সেই ফলাফলেই পৌঁছাই। এখানেই অন্য সব জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য। (Marx, 1867/1976, p. 174)[১]

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এ ক্ষেত্রে একটি বিপরীত সম্পর্ক, অর্থাৎ কর্ম-অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মপ্রয়াসসংক্রান্ত আদি ধারণাটির সংশোধন কিংবা বদলে যাওয়ার সম্ভাবনার বিষয়টি মার্ক্স নজরে আনছেন না। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত। ঘনিষ্ঠ বিচারে দেখা যায় যে এই বিপরীত সম্পর্কটিও মানুষের কর্মপ্রয়াসসম্পর্কিত মার্ক্স বর্ণিত উপর্যুক্ত সম্পর্কের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টির বিপরীত সম্পর্কটিও প্রথমোক্ত সম্পর্কেরই অন্তর্গত; পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে তা বিরাজ করে না।

মানুষের সব ধরনের কর্মপ্রয়াস সম্পর্কেই মার্ক্সের উপর্যুক্ত উক্তিটি প্রযোজ্য। মানুষের সামাজিক কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে তা আরও বেশি প্রযোজ্য। মানুষকে নিয়েই সমাজ এবং সমাজের পরিবর্তন প্রয়োজন হলে মানুষকেই তা করতে হয়। কিন্তু পরিবর্তনের এ কাজ বাস্তবে সম্পাদন করতে হলে আগে বাঞ্ছিত পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণাটি নির্মাণ করে নিতে হয়। পরিবর্তন সম্পর্কে যুক্তিনির্ভর ও বস্তুনিষ্ঠ ধারণার উপস্থাপনা সেই পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক শক্তি গড়ে তোলা এবং তা সম্পাদনের পূর্বশর্ত।

এর কারণ একাধিক। প্রথমত, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনের একটি বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখা স্পষ্ট করে তোলা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনে তত্ত্বগতভাবে অঙ্গীকারবদ্ধদের পক্ষেও প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস সহকারে সে কাজে নিয়োজিত হওয়া সম্ভব হয় না।[২] দ্বিতীয়ত, পরিবর্তনের যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখার অভাবে সমাজের যেসব শ্রেণি অথবা অংশের জন্য এই পরিবর্তন প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থানুকূল, তাদের এই পরিবর্তনের পক্ষে সমবেত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তৃতীয়ত, সমাজের অনেক অংশ আছে, যাদের জন্য এই পরিবর্তনের স্বার্থানুকূলতা ততটা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে হলেও পরিবর্তনটি যে তাদের স্বার্থানুকূল, তা প্রমাণের জন্যও পরিবর্তনের রূপরেখাটি জরুরি। চতুর্থত, সমাজের এমন শ্রেণি বা অংশ থাকতে পারে, যাদের জন্য প্রস্তাবিত পরিবর্তন আপাতবিচারে এবং সংকীর্ণ বা স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে স্বার্থানুকূল বলে প্রতিভাত হয় না; বরং প্রতিকূল বলে মনে হয়। কিন্তু গভীর, বৃহত্তর ও দীর্ঘমেয়াদি বিচারে এ পরিবর্তন তাদের জন্যও বৈরী নয়, বরং স্বার্থানুকূল। সে ক্ষেত্রে পরিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট করার মাধ্যমে এসব শ্রেণিকে পরিবর্তনের পক্ষের শক্তিতে পরিণত করা না গেলেও অন্ততপক্ষে পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরোধী শক্তিতে পরিণত হওয়া থেকে বিরত রাখা সম্ভব হতে পারে।

সুতরাং, উপর্যুক্ত বিভিন্ন কারণেই বিদ্যমান বাস্তবের নিরিখে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের যুক্তিসিদ্ধ, বিশ্বাসযোগ্য রূপরেখা জাতির সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত গবেষকদের সামনে আজ এটাই অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা থেকে এ বিষয়ে আশাবাদী হওয়া যায় কি?

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা এসব প্রতিষ্ঠানের বাইরে স্ব-উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানবিষয়ক চর্চা যে হচ্ছে না, তা নয়। এতৎসত্ত্বেও সব মহলে এবং এই চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যেও একটি সাধারণ উপলব্ধি পরিদৃষ্ট হয় যে, পরিস্থিতির চাহিদা যেন মৌলিকভাবে অপূরিত থেকে যাচ্ছে। একটি বিকল্পের সামগ্রিক ইতিবাচক আলোচনা কিছুতেই যেন দেশে অভ্যুদিত হচ্ছে না।

অথচ এরূপ বিকল্পের আলোচনার প্রতিই মানুষের আগ্রহ; বিকল্প সম্পর্কেই মানুষ জানতে চায়। ফলে লক্ষ করা যায় যে আগে সামাজিক বিজ্ঞানবিষয়ক সেমিনার ও সম্মেলন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিংবা সাধারণ জনগণের মধ্যে যতটা আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারত, অধুনা তা ততটা পারছে না। সাধারণভাবে আগের তুলনায় এসবের প্রতি আকর্ষণ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সবই যেন প্রতিভাত হচ্ছে ইতিমধ্যে বহুবার শোনা ও জানা বাক্যালাপ বলে অথবা বাস্তবের চাহিদার নিরিখে অপ্রাসঙ্গিক, মূল্যহীন চর্চাবিলাসে। অর্থাৎ সবকিছুই যেন আলোচিত হচ্ছে, কেবল বাঞ্ছিত আলোচনাটি ব্যতিরেকে।

কেন দেশের সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা বাস্তবের চাহিদা-উপযোগী যথাযথ আলোচনায় উপনীত হতে ব্যর্থ হচ্ছে, তার কারণ প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার কতগুলো গভীর-প্রোথিত দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত। খুব সাদামাটা চোখেও বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার সাধারণ কতগুলো বৈশিষ্ট্য নজরে আসে। এগুলো হল: (ক) উন্মার্গগামিতা, (খ) একদেশদর্শিতা, (গ) গতি-অনবধানতা। এসব বৈশিষ্ট্য একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এসব বৈশিষ্ট্যের দুটি সাধারণ উৎস: এক, শ্রেণি-অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা; এবং দুই, জ্ঞানগত (epistemological) দুর্বলতা।

ইতিহাসের একটা পর্যায় পর্যন্ত সমাজসম্পর্কিত জ্ঞান ছিল বিজ্ঞান-পূর্ববর্তী পর্যায়ের। তখন এই জ্ঞান ছিল হয় আধিদৈবিক বিশ্বাসবিজড়িত কিংবা ব্যক্তি-ইচ্ছার এক অরাজক বিবরণ। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির আধুনিক পর্যায়ে এই অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটে। যেকোনো বিষয়েরই বিজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত হওয়া মানে হল, সে বিষয়ে ব্যক্তি-ইচ্ছানিরপেক্ষ পরিবর্তনের সূত্রাদি আবিষ্কৃত হওয়া। সমাজের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানে উপনীত হওয়ার অর্থ হল সমাজবিষয়ক পরিবর্তনের সূত্রাদির আবিষ্কার। এভাবেই 'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' শীর্ষক বিজ্ঞানের নতুন শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩] ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এই বিজ্ঞানের এবং তা কর্তৃক প্রস্তাবিত সমাজের পরিবর্তনবিষয়ক মৌল নিয়মাবলির সত্যতা প্রমাণ করেছে।

কিন্তু বিজ্ঞান মানেই যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে ব্যক্তি-ইচ্ছানিরপেক্ষ সূত্রাদির আবিষ্কার, সেহেতু সমাজবিষয়ক বিজ্ঞান মানে দাঁড়ায় সমাজের ব্যক্তি-ইচ্ছানিরপেক্ষ পরিবর্তনের স্বীকৃতি। সে কারণে সমাজের পরিবর্তনের স্বীকৃতি আর এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণ সমার্থক হয়ে পড়ে। এর থেকেই উদ্ভূত হয় সামাজিক বিজ্ঞানবিষয়ক

সংঘাত। কারণ, পরিবর্তনে অনিচ্ছুক শক্তিগুলোর জন্য পরিবর্তনের স্বীকৃতি-সমার্থক ওই বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণ করা স্বার্থবিরোধী হয়ে পড়ে। সে জন্য সামাজিক বিজ্ঞান পক্ষ অবলম্বনের (partisan) বিজ্ঞান হয়ে পড়ে। বলা দরকার, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের পরিবর্তনের সূত্রাদির চর্চা। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের বস্তুগত স্বার্থের সম্পর্ক অনেক বেশি পরোক্ষ। সে কারণে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিষয়ক উপর্যুক্ত সংঘাত ততটা তীব্রতার সঙ্গে দেখা দেয় না, যতটা তা হয় সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।

সে কারণেই সমাজবিষয়ক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মার্ক্সকে এই বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ঘোষণাকে 'পরিবর্তনে'র ঘোষণা হিসেবে আখ্যায়িত করতে হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, পরিবর্তনের বিষয়টিকে সূচিমুখ করে তোলার জন্য 'পরিবর্তন' কথাটিকে 'ব্যাখ্যা'র জায়গায় প্রতিস্থাপিত করতে হয়েছিল। মার্ক্সের সুবিদিত উক্তি:

দার্শনিকেরা এযাবৎ পৃথিবীকে কেবল বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু প্রয়োজন হল পৃথিবীকে বদলে দেওয়া। (Marx, 1844/1972, p. 145)[৪]

যদিও এক হিসেবে এটা ঠিক যে, 'ব্যাখ্যা' ও 'পরিবর্তন' পরস্পর বিরোধাত্মক নয়। পরিবর্তনের জন্যও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এতৎসত্ত্বেও মার্ক্স কর্তৃক 'ব্যাখ্যা' এবং 'পরিবর্তন'কে পরস্পরের বিপরীতে স্থাপিত করা যে কতখানি সঠিক ছিল, তা নিচের আলোচনা থেকে আরও পরিস্ফুট হবে।

আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে পরিচিতরা আরও জানেন যে সমাজের এই ব্যক্তি-ইচ্ছানিরপেক্ষ পরিবর্তনও শেষ পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির কর্মপ্রয়াসের মাধ্যমেই সাধিত হয়। সে জন্য সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণ পরিবর্তনের সপক্ষের শ্রেণিগুলোর পক্ষে অবস্থান গ্রহণের সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, একদিকে যদি বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার ফসল হিসেবে বাঞ্ছিত পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখাটি আবির্ভূত না হয়েও থাকে, অন্যদিকে বাহ্যত এই চর্চায় অনেকেই নিয়োজিত আছেন বলে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে বোঝা যায় যে উল্লিখিত শ্রেণিগত ও জ্ঞানগত, উভয় ধরনের সমস্যা প্রবল বাধা হিসেবে কাজ করছে। এ বাধার কারণেই বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চায় উপর্যুক্ত অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্যাবলির উদ্ভব ঘটেছে। এ বাধা অতিক্রমণ ও এসব অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া। আশা করা যায়, এ তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নিচের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সে লক্ষ্যে সহায়ক হবে।[৫]

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার কতিপয় অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার দিকে তাকালে এক কতিপয় অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে। এসব বৈশিষ্ট্যের সর্বজনীনতা আছে; অর্থাৎ তা কেবল বাংলাদেশের জন্যই প্রযোজ্য নয়। তবে এসব বৈশিষ্ট্যের কিছু সুনির্দিষ্ট অভিপ্রকাশ বিশেষভাবে বাংলাদেশের জন্যই প্রযোজ্য। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথমেই 'উন্মার্গগামিতা'র কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

ক. উন্মার্গগামিতা

'ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যা', এ-জাতীয় একটি চক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকাই উন্মার্গগামিতার একটি বড় লক্ষণ। সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার এটাই হল প্রকৃষ্ট বুর্জোয়া কৌশল। এতে

একদিকে পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি অপসারিত হয়; অন্যদিকে একটি আপাতনিরপেক্ষ চর্চার মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সৃজনীশক্তি ব্যয়িত (প্রকৃতপক্ষে অপচয়িত) হওয়ার একটি বন্দোবস্তের সৃষ্টি হয়। এটা যেন হয় একটি উদ্দেশ্যহীন চর্চাবিলাস, ব্যাখ্যার খেলা, বিভিন্ন ধরনের তথাকথিত মডেল নির্মাণ এবং তা নাকচের চমকপ্রদ ব্যস্ততা। এভাবে বুদ্ধিজীবীদের পারদর্শিতা এবং মেধার উৎকর্ষ প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার জন্য একটি নখরহীন ক্ষেত্র রচিত হয়। ফলে কায়েমি স্বার্থ অক্ষত থাকে।

শুধু তা-ই নয়, নিজেকে জিইয়ে রাখার জন্য কায়েমি স্বার্থ এ ধরনের তৎপরতা থেকে বিভিন্ন পরামর্শ খুঁজে পায়। অর্থাৎ আপাতনিরপেক্ষতার পরিচয়ে এই সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা কায়েমি স্বার্থের জন্য সচেতন ও অবচেতনভাবে দুই ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। প্রথমত, পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি আড়াল করার মাধ্যমে সে বিদ্যমানকেই একটি প্রশ্নাতীত, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা বলে প্রতিভাত করে। এটাকে 'আদর্শগত সেবা' বলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই চর্চার মধ্য দিয়ে কায়েমি স্বার্থের জন্য বিভিন্ন বাস্তব প্রয়োগযোগ্য ব্যবস্থাপত্রাদি অথবা সুপারিশও আবির্ভূত হয়। ফলে উভয়ভাবেই এই চর্চা থেকে কায়েমি স্বার্থ উপকৃত হয়। অন্যদিকে এ কাজে নিয়োজিত চর্চাকারীরা বিনিময়ে বিভিন্নরূপী পারিতোষিক পেয়ে থাকেন।

সামাজিক বিজ্ঞানচর্চায় উন্মার্গগামিতার আরেকটি লক্ষণ হল বিষয়াবলির গভীরে না যাওয়ার রীতি। শুধু বাহ্যিক ঘটনাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকাটাই শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়। যেকোনো সমস্যার যত গভীরে যাওয়া যায়, ততই খালি চোখে ধরা না-পড়া, দূরবর্তী সম্পর্কগুলো আবিষ্কৃত হয়; এবং ততই গভীর প্রোথিত গতি উদ্ঘাটিত হয়। কায়েমি স্বার্থ-সপক্ষ সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার জন্য এর কোনোটিই অভিপ্রেত বলে বিবেচিত হয় না।

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার এই উন্মার্গগামিতার আরেকটি অভিপ্রকাশ হল সাধারণভাবে এই চর্চার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনাগ্রহ। পরিবর্তনের ব্যাপারে একমত সব সামাজিক বিজ্ঞানীই স্বীকার করবেন যে জনগণের সচেতন সংগঠিত শক্তিই পরিবর্তনের বাহক। সুতরাং, পরিবর্তন যদি অর্জিত হতে হয়, তাহলে সে সম্পর্কে জনগণের সঙ্গে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সে আলোচনা জনগণের বোধগম্য মাতৃভাষাতেই হওয়া সম্ভব। এতৎসত্ত্বেও যদি বাংলাদেশের সামাজিক বিজ্ঞানীরা তাঁদের চিন্তা, ভাবনা ও গবেষণার ফসল দেশবাসীর নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ না করে কেবল বিদেশি ভাষাতেই প্রকাশ করায় উৎসাহী হন, তাহলে তা উপরোল্লিখিত উন্মার্গগামিতাকেই একাধিকভাবে পরিস্ফুট করে। প্রথমত, এটা দেখায় যে, পরিবর্তনের বিষয়টি তাঁর কাছে অত গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং 'ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যা'র চর্চায় নিয়োজিত থাকাই শ্রেয় বিবেচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এটা দেখায় যে, দেশ অথবা দেশবাসীর কল্যাণ নয়, সংকীর্ণ স্বার্থবোধই এখানে জয়ী হয়েছে।

এদিকে বিদেশি ভাষায়ই হোক আর দেশি ভাষায়ই হোক, শুধু ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যায় নিয়োজিত থেকে যে পরিবর্তনের গতিরেখাটি স্পষ্ট করে তোলা সম্ভব নয়, তা বলাই বাহুল্য। সে কারণেই 'ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যা' আর 'পরিবর্তনের জন্য ব্যাখ্যা', এ দুয়ের মধ্যে মার্ক্স একটি মৌলিক পার্থক্য অনুধাবন করেছিলেন। সে জন্যই তিনি সমাজবিষয়ক তাঁর প্রবর্তিত বিজ্ঞান, তথা ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ঘোষণায় 'পরিবর্তন'কে 'ব্যাখ্যা'র সঙ্গে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন।

খ. একদেশদর্শিতা

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার দ্বিতীয় বড় অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্য হল 'একদেশদর্শিতা'। উপরিবর্ণিত উন্মার্গগামিতার সঙ্গে একদেশদর্শিতা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। একদেশদর্শিতা বলতে এখানে প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার আংশিক অথবা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝানো হচ্ছে। মার্ক্স নিজেই উল্লেখ করেছিলেন:

অর্থনৈতিক রূপের বিশ্লেষণে অণুবীক্ষণ যন্ত্র কিংবা রাসায়নিক রিজেন্টস, কোনোটিই সহায়ক নয়। কেবল বিমূর্তকরণের শক্তিই এ দুইকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। (Marx, 1867/1976, p. 19)[৮]

অধীত বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সামাজিক বিজ্ঞানের আরেকটি বড় পার্থক্য আছে। সমাজের কোনো বিষয়কে শারীরিকভাবে পরীক্ষাগারে উঠিয়ে আনা যায় না। অথচ গবেষণার জন্য পরীক্ষাগার-পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। সুতরাং, কৃত্রিম পরীক্ষাগারের সৃষ্টি করতে হয় এবং সেটা করার মাধ্যম হল বিমূর্তকরণ। (abstraction)[৯]

জ্ঞানের যে যত গভীরে পৌঁছাতে পেরেছে, সে তত নিবিড় করে জগৎ-সংসারের সর্বসংযোগতা উপলব্ধি করতে পেরেছে। যত পরোক্ষ উপায়েই হোক-না কেন, সবকিছুই সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত। সর্বসংযোগবিষয়ক এই সত্য সমাজের ক্ষেত্রে আরও বেশি প্রযোজ্য। সমাজ যেহেতু একটি জীবন্ত সত্তা, এর প্রতিটি অংশের সঙ্গে বাকি অংশগুলো সম্পর্কিত। অন্য কথায়, এর প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে বাকি বিষয়গুলো সম্পর্কিত। কিন্তু সবকিছুর একসঙ্গে বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। সুতরাং, সমস্যার বিচ্ছিন্নকরণ ও বিমূর্তকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

সাধারণভাবে বিমূর্তকরণ দুই ধারায় অগ্রসর হতে পারে। একটিকে বলা যেতে পারে ব্যাপ্তি অথবা বিস্তারগত (lateral)। যেমন–কৃষির সঙ্গে শিল্পের নিশ্চয়ই নানাবিধ সম্পর্ক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, কৃষিকে শিল্প থেকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যাবে না অথবা কৃষি বিশ্লেষণের পৃথক উপজীব্য বিষয় হতে পারে না। অর্থাৎ যদিও বাস্তবে কৃষি শিল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েই বিরাজ করে, তা সত্ত্বেও বিমূর্তকরণের পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তাকে পৃথক উপজীব্য বিষয়ে পরিণত করা সম্ভব। বিস্তারগত বিমূর্তকরণের এটি একটি সরলীকৃত উদাহরণ।

বিমূর্তকরণের দ্বিতীয় ধারা হল গভীরতাশ্রয়ী। এটা হল অনেকটা নিরাবরণমূলক (peeling off) পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ক্রমে কোনো প্রপঞ্চ বা ঘটনার ভেতরের শাঁসে পৌঁছানো যায়। উদাহরণ হিসেবে ধ্রুপদী অর্থনীতির স্থপতিদের দ্বারা বাজারের চাহিদা-জোগানের ফারাকজনিত প্রভাবের বিষয়টিকে আপাতত বাদ রেখে পণ্যের মূল্য নির্ধারক সন্ধানের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গভীরতাশ্রয়ী বিমূর্তকরণের এটি একটি সুবিদিত উদাহরণ। লক্ষণীয় যে বিস্তারগত ও গভীরতাশ্রয়ী বিমূর্তকরণের মধ্যে একটি পরস্পর সম্পর্কও রয়েছে। সুতরাং, সমাজবিষয়ক সমস্যাদির বিশ্লেষণে বিমূর্তকরণ একটি প্রয়োজনীয়, বলা যেতে পারে সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতি।

কিন্তু সংঘাতের সূচনা হয় এই বিমূর্তকরণ পদ্ধতি প্রয়োগের সঠিকতা কিংবা ন্যায্যতা নিয়ে। বিস্তারগত ও গভীরতাশ্রয়ী, উভয় ধারার বিমূর্তকরণের ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য। প্রথমে বিস্তারগত বিমূর্তকরণের বিষয়টি লক্ষ করা যেতে পারে। একটি সত্তা (entity)

হিসেবে সমাজের মধ্যকার সর্বসংযোগতার বিষয়টি যদি স্বীকৃত হয়, তাহলে এর অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে এটাও স্বীকার করতে হয় যে, 'সমগ্র' থেকে কোনো একটি 'অংশ'কে সঠিকরূপে বিচ্ছিন্নকরণের পূর্বশর্তই হল 'সমগ্র' সম্পর্কে সঠিক ধারণা। কোনো একটি 'অংশ'কে আলাদা করে নিতে চাইলে প্রথমেই জানতে হবে 'সমগ্রে'র মধ্যে ওই 'অংশ'টি কি সুনির্দিষ্টতায় গ্রথিত? অর্থাৎ জানতে হবে 'সমগ্রে'র মধ্যে বিভিন্ন 'অংশে'র পারস্পরিক সম্পর্কাবলি কী। বস্তুত, 'সমগ্র' সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট মাত্রার জ্ঞান না থাকলে 'সমগ্রে'র মধ্যে তার 'অংশ'কে চিহ্নিত করাই দুরূহ, বিচ্ছিন্ন করা দূরে থাক।

একই কথা গভীরতাশ্রয়ী বিমূর্তকরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। লক্ষণীয়, গভীরতাশ্রয়ী বিমূর্তকরণের জন্য 'সমগ্র' সম্পর্কে জ্ঞান আরও বেশি প্রয়োজন। কোনটি শাঁস, আর কোনটি বাকল, সে ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব কেবল 'সমগ্র'র উপর্যুপরি সাক্ষাতোপলব্ধি থেকে। সে জন্য 'সমগ্র' সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তারগত ও গভীরতাশ্রয়ী, উভয় ধারার বিমূর্তকরণের জন্যই একটি অপরিহার্য শর্ত।

বাংলাদেশে সামাজিক বিজ্ঞানচর্চায় এখানেই একটি বড় ধরনের সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র সমাজ সম্পর্কে একটি সঠিক তত্ত্বের (জ্ঞানের) অভাব এখানে প্রতি পদে অনুভূত হয়। সমগ্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে যখনই তার কোনো অংশ নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তখনই তা অনিবার্যভাবে 'একদেশদর্শিতা'য় আক্রান্ত হয়। আলোচনা সঠিক কাঠামোয় স্থাপিত হয় না এবং তা সঠিক প্রেক্ষিত পায় না।

বৈশিষ্ট হিসেবে একদেশদর্শিতার মধ্যে জ্ঞানগত দুর্বলতা ও শ্রেণিগত অবস্থানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিও পরিস্ফুট হয়। যেমন, খণ্ডিত কিংবা আংশিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই একটি শ্রেণিঅবস্থানে পরিণত হয়। সমগ্র নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন যে শ্রেণির স্বার্থের জন্য অনুকূল নয়, সে শ্রেণির জন্য বাঞ্ছনীয় হল আংশিক আলোচনা। অংশকে তার সমগ্রের সঠিক প্রেক্ষাপট থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে তার চর্চায় নিয়োজিত থাকার অভ্যাস এবং এভাবে চাই-কি আংশিক সংস্কারের পথ-পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিদ্যমান স্থিতাবস্থা (status quo) বজায় রাখায় সহায়ক হওয়ার প্রয়াস তার জন্য উপকারী। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে এর দ্বারা সমগ্র ও অংশ, উভয়ের স্থবিরতাকেই জিইয়ে রাখা হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তির পরিলক্ষিত হয়। এর একটি উদাহরণ হল বাংলাদেশের জনসংখ্যাবিষয়ক আলোচনা।[৮] বর্তমান রাজনৈতিক সীমারেখা নিয়ে ১৯৪৭ সালে যখন বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর যাত্রা শুরু হয়, তখন থেকেই এ দেশের 'অভিভাবকেরা' জনসংখ্যা সমস্যাকে প্রধানতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। সেই থেকে এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা কম হয়নি। একসময় জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে যত বিদেশি সাহায্য পাওয়া যেত, অন্য কোনো সমস্যা নিয়ে তত পাওয়া যেত না। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BIDS) ও অন্য অনেক গবেষণাকেন্দ্রে অনেক গবেষক এ সমস্যা নিয়ে এখনো ব্যাপৃত আছেন। ইকোনমেট্রিক কলাকৌশল ও কম্পিউটারের ব্যবহারসংবলিত অনেক চাকচিক্যময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। মাইক্রো জরিপ ও ম্যাক্রো পরিসংখ্যান ঘেঁটে বিভিন্ন (অনেক ক্ষেত্রে বেশ কষ্টকল্পিত) 'চলকে'র (variable) 'সহগ' (coefficient) অনুমিত হয়েছে। কিন্তু গবেষণা ও অনুসন্ধানের এরূপ প্রাচুর্য সত্ত্বেও বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যার আজও সমাধান হয়নি। যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে; কিন্তু ভিত্তি-জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনপেক্ষ (absolute) হিসেবে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি আগের মতোই অব্যাহত

আছে, কিংবা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও উদ্বেগজনক যে, বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ এই হার আর তেমন হ্রাস পাচ্ছে না। এতে প্রতীয়মান হয় যে জনসংখ্যা সমস্যা উত্তরণের প্রক্রিয়াটি বাংলাদেশে সম্পন্ন হতে পারছে না।

শুধু যে বাস্তবে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান হয়নি, তা-ই নয়; এমনকি তত্ত্বগতভাবেও এ সমস্যার সঠিক আত্মস্থকরণ সম্ভব হয়নি। উপর্যুক্ত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধান সত্ত্বেও এ সমস্যার প্রকৃত চরিত্র আজও সঠিকভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। সমাজের সমগ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাটি অনুধাবনের চেষ্টা না করে প্রথম থেকেই এ সমস্যাকে বহুলাংশে একটি জীবগত (biological) সমস্যা হিসেবে ভাবা হয়েছে এবং সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সমস্যাকে সমাজের সমগ্রের সমস্যা থেকে পৃথক করা হয়েছে। ফলে, সেখানে অনিবার্যভাবে একদেশদর্শিতা ভর করেছে। জনসংখ্যা সমস্যাকে মূলত জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রী বিক্রয় অথবা সরবরাহের সমস্যা হিসেবে ভাবা হয়েছে এবং জনতাকে জীবপাল হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে ধরে-টরে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে, অভাবের মধ্যে শাড়ি-লুঙ্গি ও কিছু টাকার প্রলোভন দেখিয়ে অস্ত্রোপচার আর ট্যাবলেট খাওয়ানোর মধ্যেই জনসংখ্যা রোধের প্রয়াস মূলত সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। অর্থাৎ ধারণাগতভাবেই (conceptually) জনসংখ্যা সমস্যার সঠিক কিনারা করা সম্ভব হয়নি।

অথচ আজ থেকে দেড় শতাধিক বছর আগে মার্ক্স বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন:

প্রতিটি উৎপাদনব্যবস্থারই নিজস্ব জনসংখ্যা নিয়ম থাকে, যা ঐতিহাসিকভাবে কেবল ওই উৎপাদনব্যবস্থার সীমার মধ্যেই প্রযোজ্য হয়। বিমূর্ত জনসংখ্যা নিয়ম কেবল উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, এবং তা-ও যদি সে জগতে মানুষের হস্তক্ষেপ না পড়ে। (Marx, 1867/1976, p. 592)৯

অর্থাৎ জনসংখ্যা একটি নিছক জীবগত বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক বিষয়। প্রতিটি সমাজেরই স্বীয় বৈশিষ্ট্যানুযায়ী নিজস্ব জনসংখ্যা নিয়ম থাকে, এবং সে নিয়মটি সমাজের মৌল অর্থনৈতিক নিয়মাবলি থেকেই অনুসৃত হয়। পরিতাপের বিষয়, জনসংখ্যাসংক্রান্ত মার্ক্সের এই গভীর তাৎপর্যসম্পন্ন আবিষ্কারের দেড় শতাধিক বছর পরও অনেক জনসংখ্যাবিদ এই সমস্যা নিয়ে গবেষণায় জন্মনিয়ন্ত্রণসামগ্রীর সরবরাহের ওপরই বেশি মনোযোগ নিবন্ধ করছেন এবং কেবল সংখ্যাগত বিশ্লেষণে পারদর্শিতার নজির প্রদর্শন করছেন। একদেশদর্শিতার এই উদাহরণ থেকে আরও স্পষ্ট হয় যে 'ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যা' আর 'খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি'র মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।[১০]

একইভাবে লক্ষ করা যেতে পারে যে বাংলাদেশে প্রায় সব সমস্যার আলোচনা রাষ্ট্রের চরিত্রের প্রশ্নকে আলোচনার গণ্ডির বাইরে রেখে করার চেষ্টা করা হয়। বস্তুত, এটাই প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন সমস্যার কার্যকারণ ব্যাখ্যায় অর্থনীতির সর্বভূ্য চরিত্রও অনেক সময় অস্বীকার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কিছুকাল আগে প্রচারিত এক পোস্টারের বাণী ছিল নিম্নরূপ: 'দারিদ্র্যের জন্য অশিক্ষা নয়; অশিক্ষার জন্যই দারিদ্র্য!' এ থেকে সমস্যাবলির বিশ্লেষণে একদেশদর্শিতার প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

বস্তুত, অর্থনীতি সমাজ ও রাষ্ট্র কীভাবে পরস্পর সম্পর্কিত, সমগ্র হিসাবে সমাজ সম্পর্কে সেটা হল একেবারে শুরুর কথা; সমাজ সম্পর্কে সঠিক ধারণার, বলা যেতে

পারে 'অ আ ক খ'। অস্বীকার করা কঠিন যে অর্থনীতিই সমাজের ভিত্তি; আর রাজনীতি হল অর্থনীতিরই ঘনীভূত অভিপ্রকাশ। রাষ্ট্র হল সামাজিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু; গোটা সমাজ সংগঠনের, বলা যেতে পারে গ্রন্থিবিন্দু। রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার ছাড়া কোনো উৎপাদন এবং সামাজিক সম্পর্কের পক্ষেই সমাজের ওপর চূড়ান্ত আধিপত্য অর্জন সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে কী করে সমাজের আলোচনা এবং রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রের প্রসঙ্গ আড়াল রেখে অর্থনীতি ও সমাজের আলোচনা করা সম্ভব? একটু আগ বাড়িয়ে বলা যেতে পারে যে সমাজের পরিবর্তনের জন্য অর্থনীতির পরিবর্তন প্রয়োজন; আর অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনের জন্য রাষ্ট্রশক্তির চরিত্রের পরিবর্তন প্রয়োজন। সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের প্রশ্নাদির সঠিক অনুধাবন কেবল তাদের পরস্পর সম্পর্কসূত্রেই সম্ভব। এক হিসেবে নিশ্চয়ই অর্থনীতি ও রাষ্ট্র, উভয়ই সমাজের অন্তর্গত। অন্য কথায়, সমাজ বলতে সে সমাজে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত হয়। বস্তুত, 'সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র' সমাজেরই আরও অধীত মাত্রার পরিচয়; এবং সমাজসম্পর্কিত জ্ঞানকে এই উচ্চতর মাত্রায় উন্নীত করাই একটি জরুরি কাজ।

চর্চার এই খণ্ডিত দশা শুধু যে তত্ত্বের তথা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিদৃষ্ট হয় তা নয়, তত্ত্বগত চর্চার খণ্ডিত দশা অনিবার্যভাবে ব্যবহারিক চর্চার ওপরও প্রভাব ফেলেছে। দেশের অর্থনৈতিক, বিশেষত বিদ্যমান উন্নয়ন প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে এই খণ্ডিত দশা সহজেই লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, দেশের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ফর্দের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সমস্যার আন্তসংযোগের বিষয়টি সেখানে তেমন গুরুত্ব পায় না। বিভিন্ন সাহায্যদাতা ও সংস্থার পছন্দমাফিক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকারূপী যে উন্নয়ন পরিকল্পনা, তা উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে যুগপৎ প্রয়াসের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর-প্রতিযোগী, পরস্পর বিরোধাত্মক এবং চূড়ান্ত বিচারে আত্মপরাজয়মূলক বলে প্রতিভাত হয়। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমস্যা জিইয়ে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা বহুগুণিত ও তীব্রতর হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িতরা অনেকেই এই পরিস্থিতি কমবেশি অনুভব করতে পারছেন।

তত্ত্বগত চর্চার ক্ষেত্রে খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গির বহুকাল নিরঙ্কুশ আধিপত্যের পর বাস্তবতার অভিঘাতে 'আন্তঃশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গি' (inter-disciplinary approach) নামীয় প্রস্তাবের অবতারণা করা হয়েছে। এটা হল উপর্যুক্ত সর্বসংযোগ সত্যেরই একধরনের বিলম্বিত ও পরোক্ষ স্বীকৃতি। এই প্রস্তাব অনুযায়ী সমাজের বিভিন্ন বিষয়াবলির সম্যক চরিত্র উদ্‌ঘাটন ও উপলব্ধির জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রীয় জ্ঞানের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। এ প্রস্তাব নিশ্চয়ই প্রণিধানযোগ্য ও আকর্ষণীয়। সামাজিক বিষয়গুলো যেহেতু পরস্পরসম্পর্কিত, সেহেতু এর কোনো একটির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞানের একত্রীকরণ নিঃসন্দেহের সহায়ক হওয়ার কথা।

কিন্তু লক্ষণীয়, সমাজ একটি যান্ত্রিক সমষ্টি নয় বরং একটি জীবন্ত সত্তা। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যকার সম্পর্কটি যান্ত্রিক (mechanistic) নয়, জৈবিক (organic)। সে জন্য সমাজের কোনো একটি বিষয় অনুধাবনে বিভিন্ন অংশের জ্ঞানের সম্মিলন নিশ্চয়ই আবশ্যক; কিন্তু এই সম্মিলনের সার্থকতার পূর্বশর্ত হল সমাজকে তার জৈবিক সমগ্রতায় উপলব্ধি করতে পারা। এই উপলব্ধি সমাজবিষয়ক প্রতিটি আলাদা শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক চরিত্র পাওয়ারও পূর্বশর্ত। কেননা, এই পূর্বশর্তের অনুপস্থিতিতে

সমাজের বিভিন্ন দিকবিষয়ক শাস্ত্রগুলোর মধ্যে খণ্ডিত দশা অন্তর্নিহিত থাকে। সমাজের জীবন্ত সমগ্র থেকে স্বেচ্ছাচারী ও যান্ত্রিক উপায়ে বিচ্ছিন্ন করার ফলে যেসব খণ্ডের মধ্যে সজীব প্রাণ অনুপস্থিত, সেসব 'প্রাণহীন' খণ্ডকে একত্র করে সমাজের জীবন্ত সমগ্রকে পাওয়া সম্ভব নয়। সমাজকে তার জৈবিক অঙ্গাঙ্গিকতার মধ্যে উপলব্ধি করতে না পারলে– অন্য কথায়, সমাজের সমগ্র সম্পর্কে সঠিক তত্ত্ব অনুপস্থিত থাকলে– আপাতভাবে সংযোগের বহুমুখিনতার স্বীকৃতিসংবলিত কথিত আন্তঃশাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিও সার্থক ফলাফলের জন্ম দিতে পারে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে তা সম্পদের অপচয় ও বিষম ফলশ্রুতিতে পর্যবসিত হয়। সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে এ-জাতীয় দু-একটি প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা তারই উদাহরণ জোগায়।

গ. গতি-অনবধানতা

প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার তৃতীয় অনভিপ্রেত বৈশিষ্ট্যটি হল গতি-অনবধানতা। বর্তমান পর্যায়ে সামাজিক বিজ্ঞান কর্তৃক তার বাঞ্ছিত ভূমিকা পালনে অসমর্থ হওয়ার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গতি-অনবধানতার বৈশিষ্ট্যটি ওপরে আলোচিত উন্মার্গগামিতা ও একদেশদর্শিতা বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং দুই বৈশিষ্ট্যের মতো গতি-অনবধানতার কারণও শ্রেণি-অবস্থানগত কিংবা জ্ঞানগত–উভয় উৎসের মধ্যেই সন্ধান করা যেতে পারে।

গতিই সব বস্তুর (এমনকি চিন্তারও) অস্তিত্বের শর্ত। সমাজের প্রসঙ্গেও তা সমভাবে প্রযোজ্য। এতৎসত্ত্বেও সমাজ সম্পর্কে গতি-অনবধানতা প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে থেকে যাচ্ছে। অথচ আমরা লক্ষ করেছি, যেকোনো বিষয়ে পরিবর্তনের (তথা গতির) ব্যক্তি ইচ্ছানিরপেক্ষ সূত্রগুলোর আবিষ্কারই হল ওই বিষয়ক জ্ঞানের আরাধ্য। বলা দরকার, প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানচর্চায় গতিকে যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয় তা নয়। কিন্তু এ চর্চায় সমাজবিষয়ক গতিকে বহুলাংশে বৃত্তাবদ্ধ করে ফেলা হয় অথবা এ গতিকে একতলীয় রূপে, অর্থাৎ একই তলের (plane) মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়। অথচ সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মৌলিক ও সর্বব্যাপী গতি হল এক তল থেকে ঊর্ধ্বতর তলে উত্তরণ। এই গতি সম্পর্কে অনবহিত থেকে কিংবা এই গতিকে অস্বীকার করে সমাজের সমস্যাবলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা দুরূহ।

স্বাভাবিকভাবেই শ্রেণি-আনুগত্য সমাজের গতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই সচেতনতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সমাজের ভিন্নতর তলে উত্তরণ কায়েমি স্বার্থের অনুকূল নয়। ফলে যদি কোনো গবেষক বস্তুনিষ্ঠ না হয়ে কায়েমি স্বার্থের প্রতি অনুগত হয়ে পড়েন, তাহলে গতির বিষয়টি সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়াই তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠতে পারে। তাঁর সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা তখন কেবলই একই বৃত্ত কিংবা একই তলের মধ্যে ঘুরপাক খেতে পারে। প্রবহমান বাস্তবতাকে সঠিক পরিচয়ে আয়ত্ত করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় না।

নবধ্রুপদী অর্থনীতিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ধারাবাহিকভাবে প্রবহমান কোনো গতি সেখানে বিরল। বরং স্থিতির তুলনাই (comparative statics) সেখানে মুখ্য। তদুপরি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটা হয় খণ্ডিত দশায় আক্রান্ত স্থিতি-তুলনা। শুধু অর্থনীতি বলে কথা নয়; সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। সমাজের

সামগ্রিক বিচার এবং গভীর প্রোথিত গতির অন্বেষণ এবং সেই গতির আলোকে সামাজিক প্রসঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে করা হয় না; বরং খণ্ডিত দশায় সমাজের বাহ্যিক, উপরিভাসা ঘটনাবলি নিয়ে স্থিতি-তুলনাতেই প্রচলিত সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা মূলত ব্যাপৃত থাকছে। ফলে এটা মোটেও বিচিত্র নয় যে, এ চর্চা দ্বারা সমাজ রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় রূপরেখাটি স্পষ্ট হতে পারছে না।

উপসংহার

সুতরাং স্পষ্ট যে, সামাজিক পরিবর্তন সুগমকারী সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা সহজ নয়। বস্তুগত প্রণোদনার অভাব ও জ্ঞানগত সমস্যা, উভয় ধরনের বাধাই এ ক্ষেত্রে কাজ করে; বরং স্থিতাবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যাভিসারী সামাজিক বিজ্ঞানচর্চাই বস্তুগতভাবে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও জ্ঞানগতভাবে অপেক্ষাকৃত সহজ ধারা হিসেবে বিরাজ করে।

কিন্তু এ ধারার সামাজিক বিজ্ঞানচর্চা দ্বারা সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখাটি দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না। অথচ পরিবর্তনের একটি যুক্তিসিদ্ধ রূপরেখাই দেশে পরিবর্তনের পক্ষে শক্তি গড়ে তোলার পূর্বশর্ত। সামাজিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিপথগামিতা প্রতিহত করে (যেখানে তা শ্রেণি-অবস্থানগত উৎসের কারণে) অথবা কাটিয়ে ওঠে (যেখানে তা জ্ঞানগত সমস্যার কারণে) সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তনের রূপরেখাটি স্পষ্ট করে তোলা আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত পরিবর্তন-সপক্ষ গবেষকদের উদ্যম ও সম্মিলিত প্রয়াস।

সমাজবিজ্ঞানীদের ওপর এক ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনবিষয়ক যেসব ধারণা ইতিপূর্বে প্রচলিত ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলোর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতনের ফলে তা এক গভীর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। এই পতন পরিষ্কার করেছে যে, পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজব্যবস্থা হিসেবে এসব দেশে নিরঙ্কুশ পরিকল্পনাভিত্তিক (total planning) যে মডেলের উদ্ভব ঘটেছিল, দীর্ঘ মেয়াদে তা কার্যক্ষম (viable) ছিল না। অন্যদিকে চীন ও ভিয়েতনামে বাজার-সম্পর্ক এবং ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক সংস্কারের ফলে বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। চীন এখন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় মানবসভ্যতা কর্তৃক যেসব পদক্ষেপ গৃহীত হওয়া উচিত, সেসব গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অনেক উন্নত পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে বেশি পারঙ্গমতার পরিচয় দিচ্ছে। এই তুলনামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনা মোকাবিলায় শুধু নয়, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো ভবিষ্যৎ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু অন্যদিকে বাজার-সম্পর্ক ও ব্যক্তি-উদ্যোগভিত্তিক সংস্কার চীন ও ভিয়েতনামে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে; এবং এসব দেশের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের স্থিতিশীলতার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই থেকে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে পুঁজিবাদ-উত্তর সমাজব্যবস্থার অবয়বটি এখনো অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। এই অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে একটি বিশ্বব্যাপী তৎপরতা। তবে বাংলাদেশের সামাজিক বিজ্ঞানীদেরও তাতে শামিল হতে হবে।

পুঁজিবাদ-পরবর্তী সমাজব্যবস্থার মডেল অন্বেষণের বিশ্বব্যাপী তৎপরতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের এ দেশের উন্নয়নধারা পরিবর্তনের রূপরেখা প্রণয়নের আশু কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত হওয়া জরুরি। পাকিস্তান আমলে তাঁরা

বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনে স্বনামখ্যাত 'দুই অর্থনীতি' শীর্ষক যুক্তিভিত্তি জুগিয়েছিলেন। বর্তমানে জাতীয় ইতিহাসের আরেক ক্রান্তিলগ্নে, এক দেশের মধ্যে 'দুই দেশে'র আবির্ভাবকে প্রতিহত করে সুষম ও সংহতিপূর্ণ উন্নয়ন কীভাবে অর্জন সম্ভব, তার রূপরেখা স্পষ্ট করে তোলা তাঁদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে তাঁরা পিছপা হবেন না, এটাই জাতির আশা।

টীকা

১. 'A spider conducts operations that resemble those of a weaver and a bee puts to shame many an architect in the construction of her cells. But what distinguishes the worst architect from the best of the bees is the fact that an architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. At the end of every labor process, we get a result that already existed in the imagination of the laborer at its commencement.' (Karl Marx, 1867/1976, p. 174)

২. আরাধ্য পরিবর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ ও প্রামাণিক রূপরেখার অনুপস্থিতিতে সুস্পষ্ট দীর্ঘমেয়াদি দিকনির্দেশনার অভাব দেখা দেয়। এমতাবস্থায় দৈনন্দিন কর্মপ্রয়াসের ক্ষেত্রে প্রায়ই বিভ্রান্তি, দোদুল্যমানতা, বিচ্যুতি ও প্রয়োজনীয় আত্মপ্রত্যয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বীয় ভূমিকা সঠিকভাবে উপলব্ধি ও পালন করা সম্ভব হয় না।

৩. বিজ্ঞানের নতুন শাখা হিসেবে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আবির্ভাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Althusser (1969)।

৪. 'The philosophers have so far only interpreted the world in various ways; the point is however to change it.' (Marx 1844/1972, p. 145)

৫. অনেকেই এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক অবস্থান গ্রহণের দাবি করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হয় যে, নিম্নরূপ দুটি সমস্যার কোনো একটি কাজ করছে। প্রথমটি হল, তাঁদের বিভিন্ন ঘোষণাধর্মী উক্তির মধ্যে আন্তরিকতার অভাব রয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, জ্ঞানগত সমস্যাবলি বিশেষ বাধা হিসেবে কাজ করছে। বলা দরকার, জ্ঞানগত সমস্যাবলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৬. 'In the analysis of economic forms, more over neither microscope nor chemical reagents are of use. The force of abstraction must replace both.' (Marx 1867/1976, p. 19)

৭. সামাজিক বিজ্ঞানে বিমূর্তকরণের প্রয়োজনীয়তা এবং তা সম্পাদনের পদ্ধতি সম্পর্ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: Marx (1845/1972)।

৮. বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত ধারার চিন্তা ও প্রয়াস, তার সীমাবদ্ধতা এবং ভিন্ন ধারার প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: ইসলাম (১৯৮৭, পৃ. ১৩৬-১৪৫)।

৯. *Capital* গ্রন্থে মার্ক্স General Law of Capitalist Accumulation শীর্ষক পরিচ্ছেদে Progressive Production of Relative Surplus Population or Industrial Reserve Army শিরোনামায় পুঁজিবাদের নিজস্ব জনসংখ্যা নিয়মটি ব্যাখ্যা করেন। তার শেষটি হল নিম্নরূপ:

'The laboring population therefore produces, along with the accumulation of capital produced by it, the means by which it itself is

made relatively superfluous, is turned into a relative surplus population, and it does this to and always increasing extent.’ (Marx 1867/1976, p. 591)

এর সঙ্গে মার্ক্স আরও যোগ করেন:

‘This is a law of population peculiar to the capitalist mode of production and in fact every special historic mode of production has its own special laws of population historically vaild within its limits alone. An abstract law of population exists for plants and animals only, and only in so far as man has not interfered with them.’ (Marx 1867/1976, pp. 591-2)

১০. এখানে পুনরুক্তি করা যেতে পারে যে বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত সমাজের সমগ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্য গভীর প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণের প্রয়োজন; কেননা, একমাত্র তলদেশ পর্যন্ত গবেষণাই সমাজের অংশাবলি পরস্পর কী গূঢ় সম্পর্কে আবদ্ধ, তা উদ্‌ঘাটন করতে পারে। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, সমাজবিজ্ঞানের বুর্জোয়া ধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য উন্মার্গগামিতার বড় লক্ষণই হল সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে শুধু বাহ্যিক ঘটনাবলির চর্চা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। অন্যদিকে গভীর-প্রোথিত সম্পর্কাবলি উদ্‌ঘাটনে অপারগ হওয়ার ফলে এই ধারার পক্ষে সমাজের সমগ্র সম্পর্কে একটি বৈজ্ঞানিক ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না।

নির্দেশিত রচনাবলি

Althusser, Louis (1969), *For Marx*, Middlesex, UK : Penguin University Books.

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৪), ‘সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র প্রসঙ্গে’, *সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্র*, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃ. ১-৩৯।

ইসলাম, নজরুল (১৯৮৭), *বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যা* (বর্তমান উন্নয়নধারার সংকট এবং বিকল্প পথের প্রশ্ন), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা।

Marx, Karl (1844/1972), *Theses on Feuerbach*, in Tucker (1972), pp. 143-145.

Marx, Karl (1858/1972), *The Grundrisse*, in Tucker (1972), pp. 221-293.

Marx, Karl (1867/1976), *Capital*, Vol. 1, Moscow : Progress Publishers.

Tucker, Robert C (1972), *The Marx-Engels Reader*, New York : W W Norton and Company.

উৎস: গ্রন্থ: *আগামী দিনের বাংলাদেশ*।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা

হাবির আহমদ দত্তচৌধুরী

রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদারির দায়িত্বভার পেলেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৮/২৯ বৎসর। সময়কাল ছিল ১৮৮৯-৯০খ্রি.। এ সময়টায় প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ 'ঠাকুর এস্টেট'-এর এই এজমালি জমিদারির পর্যবেক্ষক হিসেবে থেকেছেন। পুরো দায়িত্ব নিয়েছেন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ আগস্ট। এ সময় পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে Power of Attorney দান করেন। এই এজমালি সম্পত্তি বেশ কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে পরিচালনা করেন। জমিদারি পরিচালনা হাতে নেওয়ার দু-তিন বৎসরের মধ্যে জমিদারির অভ্যন্ত-রীণ অবস্থা, প্রজাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি জমিদারি ব্যবস্থায় সঠিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সে সময় শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে নয়টি ডিহি কাছারি ছিল। রবীন্দ্রনাথ নয়টি ডিহি কাছারিকে ভেঙে তিনটি বিভাগীয় কাছারি তৈরি করলেন শিলাইদহ সদর কাছারির অধীনে। ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে সক্ষম হলেন। সে সময় কুষ্টিয়াতে আরও কয়েকজন ছোট ছোট জমিদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিক হওয়ায় অনুভূতিপ্রবণ এবং সংবেদনশীল ছিলেন। তাঁর জমিদারিতে প্রজাদের দুরবস্থা দেখে তিনি তাদের উন্নয়নের জন্য নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জমিদার হিসেবে তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসকেরা এ দেশকে কেবল শোষণ করে চলেছে এবং তাদের সহায়তা করছে এদেশের নব্য জমিদারশ্রেণি। ইংরেজদের এই মানসিকতা তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি লক্ষ করেন প্রতিটি গ্রাম মৃতপ্রায়। সর্বত্রই শিক্ষার দারুণ অভাব। তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন শিক্ষা ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর কবিমন ও স্বদেশপ্রেম তাঁকে এসব কারণে পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ভাবনা গড়ে উঠেছিল জমিদারি দায়িত্ব নেবার পরপরই। তবে পুরো কাজটা হাতে নিতে কিছুটা দেরি করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন: এখানকার গ্রাম সম্পর্কে আমি যেসব কথা ভাবছি তা' এখনই কাজে লাগাবার সময় হয়নি, এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানার চেষ্টা করছি। ভূপেন প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করছেন, সেগুলো ভালো করে জমে উঠলে তখন প্ল্যান ঠিক করতে হবে। আমি যথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন করতে চাই।[১]

রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল বাংলাদেশের গ্রামীণ দুরবস্থার কারণে, কিন্তু কৃষকদের এমন দুর্ভাগ্য এক দিনে আসেনি। সুলতানি এবং মোগল যুগের ভূমিব্যবস্থায় চাষিদের অবস্থা কমবেশি ভালো ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ইংরেজ শাসনামলে প্রথমে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতাধীন হয় এবং কৃষকদের শোষণ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক নব্য জমিদারশ্রেণি গড়ে ওঠে। তাদের পক্ষে ব্রিটিশ সরকারকে নির্ধারিত সময়ে খাজনা দেবার নিশ্চয়তা প্রদান করে জমিদারি লাভ সম্ভব হয়। কিন্তু এতে সাধারণ কৃষকের শোষণের মাত্রা আগের মতোই থেকে যায়। এসব জমিদার কৃষক বা গ্রামউন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান হলেও এখানে আবহমানকাল ব্যাপী নানা ধরনের পল্লীশিল্প তৈরি হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকার মসলিন বস্ত্রশিল্প ছিল অন্যতম। ব্রিটিশ শাসনামলে এ ধরনের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, তৎকালীন ভারতবর্ষে গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংসের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের অবহেলা একমাত্র কারণ ছিল না। এসবের অন্যতম কারণ হিসেবে জাতিভেদ প্রথাকেও সর্বশেষ দায়ী করা চলে। আরও বলা যায় যে, সে সময় ভারতে বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী মানুষেরা শহরে অট্টালিকায় বসবাস করতেন যাদের ধনসম্পদ ছিল কিংবদন্তিতুল্য। অপরদিকে বিত্তহীন এবং নির্ধনের সংখ্যা ছিল অগণিত যারা বসবাস করত গ্রামে। এদের ঘরবাড়ি ছিল কাদামাটির এবং রোগ-শোক-তাপ ছিল এদের নিত্যসঙ্গী। ভারতবর্ষে এই বিশাল জনগোষ্ঠী যে দারিদ্র্য এবং অভাবের মধ্যে বসবাস করত সেজন্যে তাদের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার নানা লোকদেখানো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উন্নয়নের প্রধান পূর্বশর্ত হল শিক্ষা, ব্রিটিশ সরকার এদিকে মোটেও দৃষ্টিপাত করেনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

England's educational policy in India is a blight on civilization. I have studied the problem pretty closely. In the latter part of the eighteenth century, writtenforce, the English philanthropists, proposed to send school teachers to India, but a director of the East India Company objected, saying: 'We have lost America from our folly in allowing the establishment of schools and colleges, and it would not do for us to repeat the same act of folly in regard to India.'[২]

ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল তা একটি জাতির উন্নতির জন্য সহায়ক ছিল না। রবীন্দ্রনাথ তা মর্মে মর্মে অনাধাবন করেছিলেন। ব্রিটিশ-ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তাই তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তিনি নিজেও এই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে অনুসরণ করেননি। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকে উন্নয়নের সর্বপ্রধান বাহন বলে জেনেছিলেন, তবে তাঁর দৃষ্টিতে এই শিক্ষা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। এ শিক্ষার সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছিলেন কর্মকে যা জীবনকে বিকশিত করে। এইজন্য তাঁর পল্লীউন্নয়ন ভাবনায় জীবনমুখী শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। পল্লীউন্নয়নে রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষাকেই সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশে তাঁর পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণে তৎপর হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তাঁর এই কর্মকাণ্ডে শিক্ষিত সমাজের অংশগ্রহণ স্বরাজকে ত্বরান্বিত করবে।

রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা পড়েছিল যে, ব্রিটিশ-ভারতে বিদেশিদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা কেবল কেরানিকুলের জন্ম দিতে পারে– মনুষ্যত্বের যথার্থ বিকাশ সেখানে সম্ভব নয়। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদেরকে জীবন-ঘনিষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছেন। শিক্ষানীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য ছিল মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান এবং এমন শিক্ষা অর্জন যা বিশ্বের মানবমনের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন করে। বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্য শুধু চাকরিলাভ নয়, মনেরও মুক্তিসাধন। তাঁর ভাষায়: তুমি কেরানির চেয়ে বড়, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়, তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাওইয়ের মতো কোনো ক্রমে স্কুলমাস্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পেনশনভোগী জরাজীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে, এই মন্ত্রটি জপ করিতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা– এই কথাটা নিশিদিন মনে রাখিতে হইবে। এইটে বুঝিতে না পারার মূঢ়তাই আমাদের সকলের চেয়ে বড় মূঢ়তা।[৩]

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথ উন্নয়নকে কোনোভাবেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন বোঝেননি। জীবিকা অর্জনের শিক্ষা মানুষকে জড়ধর্মী করে ফেলে। সেখানে মানুষের আত্মার মৃত্যু ঘটে। মন ও মনন কিংবা চিত্তের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেন শিলাইদহে। এখান থেকেই তিনি পাবনার সাহাজাদপুর এবং রাজশাহীর পতিসরে গিয়েছেন। সেখানেও তাঁর জমিদারিতে থাকবার জন্য কুঠিবাড়ি ছিল এবং মাঝেমধ্যে তিনি সেখানে থেকেছেনও। তবে সেসবখানে প্রায়শ তাঁর দিন কেটেছে বজরায়। বজরায় থেকেই তিনি প্রকৃতিকে অবলোকন করেছেন। পদ্মানদীকে তিনি তাঁর সাথী হিসেবেই পেয়েছেন। তাকে প্রতীকী কল্পনায় শৈশব-কৈশোরের খেলায় সাথী, যৌবনে মানসী এবং প্রৌঢ়কালে জীবনদেবতার আসনে সমাসীন করেছেন। বাংলাদেশে জমিদারি দায়িত্ব গ্রহণের পর কবি-জমিদারের একটি আপাত-বিরোধী ভাবনার মধ্য থেকে একটি ব্যতিক্রমী জীবনবোধ তাঁর সকল কাজকর্মকে প্রভাবিত করেছে।

রবীন্দ্রজীবনে এ নয়া পটভূমির প্রভাব বুঝতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী জীবন-পরিবেশ ও সে পরিবেশ-প্রভাবে বড় হয়ে ওঠার কথাও একটু ভাবা প্রয়োজন। ভাবতে হয় তাঁর পারিবারিক প্রভাবের কথা। মূলত দ্বারকানাথের সুবাদেই পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে ঠাকুর পরিবারে। সেই সূত্রে সমকালীন প্রতীচ্য আধুনিকতার বহুমুখী প্রভাব। পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুসলিম-ঐতিহ্য ও সুফিদর্শন প্রভাবিত একেশ্বরবাদী ধর্মবোধ এবং ব্রাহ্ম-সামাজিক প্রভাবের পাশাপাশি উপনিষদের নয়া তাত্ত্বিক প্রভাব ঠাকুর পরিবারে বিশেষ এক ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করে, সবার জন্য না-হলেও কারো কারো ক্ষেত্রে তা সত্য হয়ে ওঠে। পৌত্তলিকতার বিলুপ্তি সত্ত্বেও সনাতন হিন্দু-সংস্কৃতির ঐতিহ্য-প্রভাব ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি-চেতনায় নীরবে নিঃশব্দে রয়ে গেছে। এবং তা পরিবার-প্রধান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মীয় ধ্যানধারণা-ঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব থেকে সতত উৎসারিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা ও আধুনিক জীবনাচরণের পাশাপাশি মাতৃভাষার চর্চা, স্বদেশি প্রাচীন সাহিত্যের অধ্যয়ন এ পরিবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে সবিশেষ হয়ে উঠেছিল। একইভাবে দেশাত্মবোধের পথে সনাতনী ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাবও যেন অলিখিত নিয়মে এখানে স্থান করে নিয়েছিল। আরো অবাক হওয়ার মতো বিষয় হচ্ছে যে, প্রিন্স দ্বারকানাথের আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা এবং দেবেন্দ্রনাথের পারসিক ধারায় সুফিচিন্তার প্রভাবও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নিরাকার একেশ্বরবাদী দ্বারকানাথ-দেবেন্দ্রনাথের রক্তের উত্তরাধিকার নিয়েই তো ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

দুই বিপরীত ধারায় গড়ে ওঠা ঠাকুরবাড়ির মিশ্র সংস্কৃতির মধ্য থেকে ভিন্নতা বা বৈপরীত্যের প্রকাশ অস্বাভাবিক ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা লক্ষ করার মতো। তবে সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার বিশেষ প্রভাব এবং সেই সূত্রে প্রচলিত সামাজিক সংস্কার ও রক্ষণশীলতা ভাঙার প্রবণতা উল্লেখযোগ্য। এ প্রভাব তাঁর নিজ পরিবারে যথারীতি প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এ বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েও মহর্ষি পিতার প্রভাব যথেষ্ট মাত্রায় বহন করেছেন। তিনি রাশিয়ার বিপ্লব, ফ্রান্সের প্রতিবিপ্লব এবং পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবকে গভীর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এসবের কারণে তাঁর অন্তর ও বাহিরে নানা দ্বন্দ্ব ও বিরোধের তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন। একদিকে জমিদারি-ঐতিহ্য, বিলাস-ব্যসন তাঁর মধ্যে কাজ করেছে, অপরদিকে সমকালীন জীবন থেকে নেওয়া একটি মানবিক মূল্যবোধ তাঁর অন্তরে ক্রমান্বয়ে দানা বেঁধেছে। শিলাইদহে এসে জমিদারি তদারকি করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁর কবি-মনে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাতে তিনি নিজেকেই অভিযুক্ত করে ফেললেন। বিচারের ভার অন্যের উপর সমর্পণ না করে নিজেই তার সমাধানের পথ বের করে নিতে চাইলেন। একদিকে জমিদার-পিতার প্রত্যাশা জমিদারির উন্নয়ন, অপরদিকে অসহায় মানুষের ক্রন্দন। রবীন্দ্রনাথ এ দুটোকেই অসাধারণ বুদ্ধি ও কৌশলে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই পল্লী তথা প্রজাসাধারণের

উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যথানিয়মে খাজনা নিয়েছেন কিন্তু প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। ক্ষেত্রবিশেষে তিনি কোনো কোনো প্রজার খাজনা মওকুফ করেছেন। তাঁর উদারনৈতিক ব্যবহার ও আচরণের কারণেই তিনি প্রজাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন। এস্টেটের কর্মকর্তা ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ বাধলে তিনি প্রজাদেরই পক্ষাবলম্বন করেছেন। তিনি জানতেন, প্রজারা অত্যাচারিত না-হলে তারা প্রতিবাদ করে না। তিনি প্রজাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, তিনি তাদের হিতৈষী– তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নই তাঁর কাম্য। এর ফলাফল এরূপ হয়েছিল যে, আশেপাশের জমিদারিতে কৃষক-বিদ্রোহ হলেও রবীন্দ্রনাথের জমিদারিতে এর ছোঁয়া লাগেনি। তিনি জমিদারির দায়িত্ব নেওয়ার পর খাজনা আদায়কারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে দরিদ্র প্রজাদের অবস্থা বিবেচনা করে খাজনা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক জীবনের অর্থনৈতিক মূল ভিত্তি ছিল জমিদারির আয়, অর্থাৎ সামন্ত ব্যবস্থাধীনে ভূমি-নির্ভর আয়। এটা আর এমন কী। সেকালের প্রায় সকল ভূম্যাধিকারীর ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া ছিল। কিন্তু ঠাকুর পরিবারের ক্ষেত্রে এর অনেকটা ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। অমিতাভ চৌধুরী 'ঠাকুর এস্টেটের' কিছু খাতাপত্র থেকে ১৩০১ বঙ্গাব্দের (১৮৯৪ খ্রি:) জমা-খরচের একটি নমুনা হিসাব তুলে ধরেছেন।[৪] তাতে সাহাজাদপুর থেকে ৭৮,৩৩৮ টাকা, বিরাহিমপুর থেকে ৫২,৮৫৭ টাকা এবং কালিগ্রাম থেকে ৫০,৪২০ টাকা খাজনা আদায় দেখা যায়। এই তিন সূত্রে মোট আদায় ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৬১৫ টাকা, কটকের তালুক ও বকেয়াসহ মোট আয় ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ২৭৫ টাকা। এর থেকে সরকারকে দেওয়া খাজনাসহ মোট খরচ ২ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৫১ টাকা। অর্থাৎ নিট আয় মাত্র ৪ হাজার ৬২৪ টাকা। এ আয় তৎকালীন বাংলাদেশের যে-কোনো বিত্তবান বা পরাক্রান্ত জমিদারের আয়ের তুলনায় অতি নগণ্য তা বলাই বাহুল্য। এ হিসাবটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনাকালীন সময়কার। সুতরাং এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, জমিদার রবীন্দ্রনাথ কেন বারবার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা বলেছেন। যাইহোক, রবীন্দ্রনাথের মতো একজন প্রজাহিতৈষী জমিদারের খাজনা আদায়ের উপরোক্ত অবস্থা যে প্রজাপীড়নের পরিচয় বহন করে না, তা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কৃষকের দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে গোটা গ্রামকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নয়নের সঙ্গে এর অধিবাসীগণকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করে তোলা। একটি গ্রাম জাগলে একটি দেশ জাগবে– রবীন্দ্রনাথের এই চেতনা একদিকে যেমন তাঁকে স্বদেশপ্রেমী করে তুলেছিল তেমনি এই দেশকে পূর্ণাঙ্গভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলাও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তবে পল্লীউন্নয়নের মাধ্যমে হঠাৎ করে তিনি স্বদেশি রাষ্ট্র গঠনের কোনো ইচ্ছা পোষণ করেননি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি আত্মনির্ভর এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সংগঠিত সমাজ। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই যে দেশের সকল

সমস্যা দূর হবে– তা নয়। দেশের লোক এ বিষয়ে সচেতন না-হলে এই স্বরাজ রক্ষা করা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথের গ্রামউন্নয়ন ও নয়া পল্লীসমাজ গঠনের তত্ত্বগত ভিত্তি ছিল স্বশাসনের উপযোগী ব্যবস্থা অর্থাৎ পঞ্চায়েতপ্রথার প্রবর্তন এবং জীবিকাকে সমবায়নীতির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতায় গড়ে তোলা। গ্রামে গ্রামে অর্থকরী সমবায় সংগঠন গড়ে তোলা। তাঁর চিন্তায় পল্লীসমাজ ছিল আধুনিক চরিত্রের, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান-নির্ভর। এ পথেই তিনি গ্রামের অর্থনৈতিক-সামাজিক বিকাশ নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। একদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্যদিকে তৃণমূল স্তরে জনশক্তির ঐক্য হয়ে ওঠে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

আদর্শ পল্লীসমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ গান্ধী ও সমাজনীতিবিদ জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিন্তার ফারাক খুবই স্পষ্ট। একজন সনাতন আদর্শ-ভিত্তিক স্বয়ংসম্পূর্ণ, স্বনির্ভর পল্লীসমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চেয়েছিলেন রামরাজ্যের প্রতীকে, অন্যজন চেয়েছিলেন সমাজ-প্রধান অতীত পল্লীসমাজের বিজ্ঞান প্রযুক্তি-ভিত্তিক আধুনিক রূপায়ণ। পার্থক্যটা ব্যাপক, তাই বুঝতে কষ্ট হয় না, কেন রবীন্দ্রনাথ চরকা-কাটার প্রশ্নে গান্ধীবিরোধী, কেন চরকাকে তিনি স্থবিরতার প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন এবং কেন দেশের শ্রমশক্তিকে চরকায় আবদ্ধ রাখার বিরোধী ছিলেন। তাঁর বাস্তববাদী চোখে চরকার প্রতিকল্প ছিল সমবায়-ভিত্তিক জীবিকার কার্যক্রম। রবীন্দ্রনাথ তাই সমবায়ী জীবিকার ভিত্তিতে গ্রামগুলোকে সংগঠিত করে গোটা দেশকে বাঁচাতে চান। তাঁর আদর্শ পল্লীসমাজের প্রস্তাবিত সংবিধানের দিকে তাকালে এর গণতান্ত্রিক, জনভিত্তিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সংবিধানের প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

প্রতিটি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায় মত অন্যূন পাঁচজনের উপর পল্লীসমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লীসমাজের কার্য করিবেন।[৫]

এ সংবিধানের আওতায় পল্লীসমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে গ্রামে গ্রামে সম্প্রদায়গত সাম্য ও সদ্ভাব বর্ধন, স্থানীয় বিচারব্যবস্থা গঠন, আদর্শ কৃষিখামার ও কুটিরশিল্প স্থাপন, আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ব্যবস্থা পত্তন, জলসরবরাহ-রাস্তাঘাট তৈরিসহ বহুবিধ পূর্তকর্ম। দুঃস্থ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান এবং তথ্যাদি সংগ্রহ ও বহুমুখী সংস্কৃতি চর্চা। অর্থের উৎস স্বেচ্ছাদান, স্বেচ্ছাশ্রম, কল্যাণবৃত্তি এবং ব্যক্তিক ও সামাজিক স্তরে সংগ্রহ। এতে আধুনিক পল্লীপঞ্চায়েতের গ্রামভিত্তিক-জনভিত্তিক চরিত্র ফুটে উঠেছে।

এ পরিকল্পনা অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথ প্রথমে কাজ শুরু করেন শিলাইদহে। গোটা বিরাহিমপুর পরগনাকে পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়। প্রতি মণ্ডলে একজন নির্বাচিত অধ্যক্ষ (এ কালের ভাষায় প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান বা সভাপতি) এবং দু'জন করে

হিন্দু ও মুসলমান সদস্য। এ পঞ্চপ্রধানের হাতে গোটা মণ্ডলের কর্মকাণ্ডের তদারকির ভার ন্যস্ত ছিল।[৬]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত পল্লীউন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক চরম দুর্দশা। তিনি যখন প্রথম জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহে এলেন তখন তাঁর দরিদ্র প্রজারা অভিযোগ করেছিল সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে। তারা সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে চড়াসুদে ঋণ নিয়ে চক্রসুদের জালে আটকা পড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দিনযাপন করছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনদের নানারকম অত্যাচারের শিকারও হয়েছিল অনেকেই। প্রজাদরদী জমিদার রবীন্দ্রনাথ আপন সন্তানতুল্য প্রজাদের এসব অভাব-অভিযোগ শুনে যারপরনাই ব্যথিত হলেন। ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অনেকের ঋণ শোধ করে দিলেন। ঋণগ্রস্ত প্রজাদের ঋণের দায় থেকে মুক্ত হতে না-পারলে তাদের পক্ষে কোনো কাজে যোগ দেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ এর বিকল্প উপায় উদ্ভাবনের চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন, কিভাবে সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে দুঃস্থ প্রজাদের রক্ষা করা যায়?

১৮৯১ থেকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টানা দশবছর ছিল রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে অবস্থান। তবে কার্যোপলক্ষে পতিসর ও সাহাজাদপুরেও যাতায়াত করেছেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে যান। কিন্তু শিলাইদহ-সাহাজাদপুর-পতিসরের সঙ্গে তাঁর সবসময় যোগাযোগ ছিল এবং তিনি সময় সময় যাতায়াত করতেন। শিলাইদহে বসবাসকালে শিলাইদহ-সাহাজাদপুর-পতিসরের প্রজাকুলকে সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে ১৮৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একটি 'কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করলেন এবং নাম দিলেন 'বিরাহিমপুর কৃষি ব্যাংক'। নিজের অল্পবিস্তর টাকা এবং আদায়কৃত খাজনার টাকার কিছু অংশ এই ব্যাংকের প্রাথমিক মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ করলেন। প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক মুক্তি ও তাঁদের সর্ববিধ উন্নয়নের পরীক্ষামূলক কর্মকেন্দ্র হিসেবে শিলাইদহকেই প্রথম বেছে নিলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে সুধীর সেন বলেন:

Silaidaha in the district of Nadia was selected as the centre for his experiment. A part of nucleus for rural work was already available there. An Agricultural bank had been founded in 1300 B.S. 1893-94 A.D. to advance loans particularly seasonal to the cultivators on reasonable rates of interest.[৭]

এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের মধ্যে সমবায়ের মাধ্যমে চাষ করার প্রতি যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি সকল কাজের মধ্যেই সমবায়কে যুক্ত করতেও অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ, সমবায়ের মধ্যে দশের কাজ পূর্ণ হয়, মহাজনি ঋণজালে আবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা লাঘব হয় এবং তাতে দেশের মঙ্গল আসে। গ্রামের কাজকে রবীন্দ্রনাথ দেশসেবার কাজ বলে অভিহিত করেছেন। এই দেশসেবাকেই তিনি ধর্ম বলে বিবেচনা করেছেন। সমবায়ের গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে এস্টেট ম্যানেজারকে বলেন: ... দেশের অবস্থা যতই দেখতে পাচ্ছি ততই বুঝতে পারছি সর্বসাধারণকে নিয়ে কোঅপারেটিভ প্রণালী অবলম্বন না করলে আমরা

কোনোমতেই দাঁড়াতে পারব না। কিন্তু আমাদের দেশে পরস্পরের মধ্যে এত বিদ্বেষ এবং চাষারা ভদ্রলোকদের এতই অবিশ্বাস করে যে, সমবায়-মণ্ডলী গড়ে তোলা আমাদের দেশে অত্যন্ত দুঃসাধ্য। শুনতে পাই আয়ারল্যান্ডে এই সমবায়-মণ্ডলীর খুব প্রচলন হয়েছে। সেখান থেকে কোঅপারেটিভ ডায়েরি প্রভৃতি কাজের প্রণালী যদি তুমি কিছুদিন দেখেশুনে আসতে পার তাহলে এদেশে সেটা কাজে খাটাতে পার। আয়ারল্যান্ডের অবস্থা নানা কারণে অনেকটা আমাদের দেশের মতো, তারা রক্ষা পাবার জন্যে কী রকম চেষ্টা করছে তা দেখে এলে বোধ হয় সে অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগবে। আমার বিশ্বাস কুষ্টিয়ায় আমাদের প্রজাদের নিয়ে কোঅপারেটিভ ডায়েরি খোলার ভালো ক্ষেত্র আছে... ।[৮]

অতঃপর আয়ারল্যান্ডের কোঅপারেটিভ পদ্ধতিকে ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁর ম্যানেজারকে উপদেশ দিচ্ছেন এবং নিজেও এ কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। দেশকে কতদূর ভালোবাসলে এমনিভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে জীবন ও মনকে উৎসর্গ করা যায়, রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত তার প্রথম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ কাজে তাঁকে অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর নিজের জমিদারির ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের অনেকেই রবীন্দ্রনাথের এই উদার-মানবিক কর্মকা- কে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন। তথাপি তিনি দমে থাকেননি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহেই তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন শত বাধার মধ্যেও। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা মানুষ ছিলেন। গ্রামউন্নয়নের ক্ষেত্রে মণ্ডলীপ্রথার পাশাপাশি সমবায়নীতি বাস্তবায়নে এবং সর্বোপরি সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে দরিদ্র চাষিদেরকে মুক্ত করতে ‘কৃষি ব্যাংক’ প্রতিষ্ঠা তাঁর গ্রামউন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিলাইদহেই তিনি সর্বপ্রথম ‘কৃষি ব্যাংক’ স্থাপন করেছিলেন।[৯] রবীন্দ্রনাথ জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে শিলাইদহে আগমন করার পরপরই কৃষকদের প্রতি জমিদার মহাজনদের অত্যাচার সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর ভাষ্য নিম্নরূপ: রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসেবে মহাজনের কবল থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কী করে এসেছেন তা আমি সম্পূর্ণ জানি,– কেননা তাঁর জমিদারি-সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে শেক্‌দের বাঁচানো।[১০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পল্লীসমাজের সর্বপ্রকার কাজে প্রজাদের সম্পর্কের দিকটাতেই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এর ভিত্তি ছিল তাঁর মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তন। কিন্তু শিলাইদহে এই মণ্ডলীপ্রথা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ধনী-কৃষক বা জোতদার এবং কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল এবং তারা এই প্রথার বিরোধিতা করতে শুরু করল। কারণ, তারা এযাবৎকাল যে সুবিধা বা অর্থনৈতিক সুযোগ লাভ করেছে, এই প্রথা প্রবর্তনের ফলে গ্রামের বিত্তহীন মানুষও তা ভোগ করবে এবং সমাজে তাদের অবস্থানের ভিত নড়ে উঠবে। নতুন নেতৃত্বের সূচনা হবে। অধিকন্তু, শিলাইদহ ছিল হিন্দু-প্রধান অঞ্চল এবং এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষও ছিল প্রবল। এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে সুদীর্ঘ দশ বছরেরও অধিক সময় তাঁর

পল্লীউন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত শিলাইদহে তাঁর পরিকল্পনা বড়ো-একটা সফল হয়নি। তাছাড়া শিলাইদহের জমিদারির মালিকানাও তাঁর ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর নিজস্ব মালিকানার মুসলমান-প্রধান কালিগ্রাম পরগনাকেই বেছে নিলেন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে। কালিগ্রাম পরগনার কুঠিবাড়ি ছিল পতিসর গ্রামে। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ্য যে, কবির পল্লীউন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনের পরিকল্পনা সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সাড়া জাগাতে পারেনি। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের অনেকেই শ্রেণিস্বার্থের কারণে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন তথা কৃষকশ্রেণির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চেষ্টাকে সুনজরে দেখেননি। এ দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর প্রভাব ফেলেছিল, আর বিদেশি শাসকদের পক্ষে এ চেষ্টা তো গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথাই নয়। প্রভাতকুমার তাই যথার্থই বলেছেন, ‘বাঙালি তাঁহার গান কণ্ঠে তুলিয়া লইল। তাঁহার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল না।’[১১] তাতে কিছু যায়-আসেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজের মাটিতে নিজস্ব লোকজন নিয়ে নিজের সাধ্য ও বুদ্ধিমতো শক্তি প্রয়োগ করলেন।

বাংলাদেশের আর-পাঁচটা গ্রামের মতোই পতিসর ছোটখাট একটি গ্রাম, স্থানীয় লোকজনদের ভাষায় ‘গণ্ডগ্রাম’। কালিগ্রাম পরগনার সদর কাছারি এই গ্রামে বলেই এর গুরুত্ব স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার। তা না হলে পাখি-ডাকা, ছায়াঘেরা, গাছগাছালি ভরা পতিসরকে বাংলাদেশের অন্য গ্রাম থেকে আলাদা করা যায় না। এই পতিসরকে বুকে চেপে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে নিতে এগিয়ে গেছে নাগর নদী, কখনো ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে, কখনো কোনো কিষাণবাড়ির উঠোনের পাশ কাটিয়ে, বনজঙ্গল বা বুনো ঝোপঝাড়ের ছায়া বুকে নিয়ে।

পতিসরে যাতায়াত রবীন্দ্রনাথের আমলে সহজ ছিল না। একশ বছরেরও বেশি সময় পর এখনো প্রায় তেমনি আছে। নওগাঁ জেলা (তখন মহকুমা) সদর থেকে ২৯ কিলোমিটার দক্ষিণে আত্রাই রেলস্টেশন, সেখান থেকে মাত্র ১২ কিলোমিটার পূর্বদিকে পতিসর। এছাড়াও রয়েছে রানীনগর, রাতোয়াল, আবাদপুকুর হয়ে পতিসর যাওয়ার রাস্তা। নওগাঁ থেকে এ পথের দূরত্ব ২৬ কিলোমিটার। বঙ্গবন্ধু-তনয়া শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র-অনুরাগী তৎকালীন স্থানীয় সাংসদের চেষ্টায় নওগাঁ-রানীনগর থেকে পতিসর পর্যন্ত রাস্তাটির পাকাকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। আত্রাই থেকে পতিসর পর্যন্ত সড়কও বর্তমানে যানবাহনযোগ্য হয়েছে।

সে যাইহোক, রবীন্দ্রনাথ এই পতিসরেই শুরু করলেন তাঁর নয়া পল্লীসমাজ গঠনের কাজ। এখানকার প্রজাসাধারণ তাঁকে দেবতার আসনে বরণ করে নিল। এখানকার মানুষ শিলাইদহের তুলনায় বেশি সহজ ও সরল মনের অধিকারী ছিল। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি কাজে তারা সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে এল। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন– বিরাহিমপুর ও কালিগ্রাম– এই দুই পরগনা তাঁর হাতে ছিল। তিনি সেখানকার গ্রামবাসীদের দুরবস্থা ঘোচাবার একটা প্ল্যান করলেন। বিচারের ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল। মহাজনদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করা, চাষের উন্নতি করা, ঘরেঘরে ছোটখাট শিল্প প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি গ্রামোন্নতির নানা দিকে চেষ্টা যাতে হয়

তার ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করলেন। ... শান্তিনিকেতন থেকে কালীমোহন ঘোষ প্রভৃতিকে পতিসরে নিয়ে এলেন। কাজ আরম্ভ করে দেখলেন পতিসরেই উপযুক্ত ক্ষেত্র পাওয়া যাবে– ...। পতিসরে বাবা পল্লীসংগঠনের যে পরীক্ষা করলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার যে আশাতীত ফল পেলেন, দুর্ভাগ্যবশত দেশের লোকের সেদিকে দৃষ্টি গেল না। ১৯০০ সালে তিনি এ কাজে হাত দিয়েছিলেন।[১২]

রবীন্দ্রনাথের পতিসরের ক্ষুদ্র পরিসরে পল্লীউন্নয়ন ও নয়া পল্লীসমাজ গঠনের কার্যক্রমকে একপর্যায়ে গোটা বঙ্গদেশে বিকশিত করেছিলেন এক নতুন মাত্রায় তাঁরই ভাবশিষ্য অনুজপ্রতিম বন্ধু বিশ্বনন্দিত ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীগুরুসদয় দত্ত আই.সি.এস.। এ বিষয়ে পরবর্তীতে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ কাজের সুবিধার জন্য প্রথমেই গোটা কালিগ্রাম পরগনাকে পতিসর, রাতোয়াল ও কামতা– এই তিনটি বিভাগে ভাগ করেন। পল্লীসংগঠনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে সাধারণ সভা নির্বাচিত হয় তার নাম ছিল 'কালিগ্রাম হিতৈষী সভা'। প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দা সবাই মিলে সেই গ্রামের একজন প্রবীণকে 'গ্রাম-প্রধান' হিসেবে নির্বাচন করে। প্রতি বিভাগের নির্বাচিত গ্রাম-প্রধানদের নিয়ে 'বিভাগীয় হিতৈষী সভা' গঠিত হয়। আবার তিন বিভাগের প্রধানরা মিলে তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে 'কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভা'-র সদস্য নির্বাচন করে। এদেরকে বলা হত 'পঞ্চপ্রধান'। এদের ছাড়াও কেন্দ্রীয় সভায় জমিদারের একজন প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা ছিল। শান্তিনিকেতন থেকে আসা রবীন্দ্রনাথের কর্মীবাহিনী এক-একটি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উন্নয়ন কাজে পরামর্শসহকারে অংশ নিত। অতএব, দেখা যাচ্ছে গোটা সংগঠনটির রূপরেখা 'গ্রাম', 'বিভাগ', 'কেন্দ্র' এই ক্রমিকতায় বিন্যস্ত ছিল।

এখানে আরও দেখার বিষয় যে, 'হিতৈষী সভা'-র কাজ চালাবার জন্য প্রজারা স্বেচ্ছায় চাঁদা দিয়েছে, খাজনার সঙ্গে টাকায় তিন পয়সা করে। এ টাকা চলে যেত সমানভাগে তিন বিভাগীয় হিতৈষী সভার তহবিলে, যেখান থেকে মূল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। সভার পক্ষ থেকে হিসাব-নিকাশ রাখা ও কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য ছিল একজন বেতনভুক কর্মচারী। বছরে একবার কেন্দ্রীয় হিতৈষী সভার বৈঠক ডাকা হত– উদ্দেশ্য আগামী বছরের কর্মসূচি নির্ধারণ ও বাজেট তৈরি, বিগত বছরের কাজের পর্যালোচনা এবং জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীদের অন্যায়, ত্রুটি বা প্রজাদের উপর অত্যাচারের বিষয় জমিদারকে অবহিত করা।

এর সুফল দেখা গেল গ্রামে গ্রামে একে একে অবৈতনিক পাঠশালা, তিন বিভাগে তিনটি মধ্য-ইংরেজি (M.E.) স্কুল এবং পতিসরে একটি হাইস্কুল স্থাপনে। স্কুলগৃহ ও ছাত্রাবাস তৈরির খরচ 'এস্টেট'-ই বহন করত। শিক্ষার পাশাপাশি এসেছে স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। কালিগ্রাম অঞ্চলে তখন একজনও পাশ করা ডাক্তার ছিল না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রথমে পতিসরে, পরে অন্য দুই বিভাগে ডাক্তারসহ ডিসপেন্সারি খোলা হয় চিকিৎসা-সেবা প্রদানের জন্য। এছাড়া রাস্তাঘাট তৈরি, ডোবা-জলাশয় সংস্কার, পানীয়জলের জন্য কূপ খনন, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি

জনহিতকর কাজে হাত দিয়েছে হিতৈষী সভা। পতিসরে ধর্মগোলারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিভিন্ন ধরনের কুটিরশিল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন বাংলার ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্পের বিকাশের জন্য। তাঁতিকে কাজ দেয়া, সুতোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রামে কৃষির বিকল্প অর্থ-উপার্জনের ব্যবস্থা নিশ্চিত হতে থাকে। বয়নশিল্পের উন্নতির জন্য শ্রীরামপুর থেকে একজন ভালো তাঁতিকে আনা হয়েছিল পতিসরে। এসব দেখে স্বভাবতই গ্রামের নিরীহ প্রজাসাধারণের মনেও উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। তাঁরা ঠিকই বুঝে নেয় যে, এই জমিদার তাঁদের মঙ্গলকামী দেবতা জমিদার। পরে কালিগ্রামেরই মুসলমান জোলাদের মধ্য থেকে উৎসাহী একজনকে শান্তিনিকেতনে পাঠানো হয় নানারকমের নক্‌শাতোলা কাপড় বোনা শেখার জন্য এবং একসময় এখানে বয়নস্কুলও খোলা হয়।

কিন্তু কালিগ্রামেও দেখা গেল শিলাইদহের মতো কৃষকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। প্রায় সবাই সুদখোর বেনিয়াদের চক্রসুদের জালে আবদ্ধ। উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'বিরাহিমপুর কৃষি ব্যাংক' নামে যে কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ইতিপূর্বে, তা নানা কারণে বিপর্যস্ত হয়। প্রথমত ওটা তাঁর নিজস্ব মালিকানার জমিদারিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল না, দ্বিতীয়ত সমবায়ভিত্তিক ঋণদান সংক্রান্ত কোনো সরকারি বিধিবিধানও তখন প্রবর্তিত হয়নি, তৃতীয়ত ওটা অত্যন্ত সীমিত পরিসরে গঠিত হয়েছিল এবং চতুর্থত এর মূলধনও পর্যাপ্ত ছিল না। সামান্য কিছু টাকা মেয়াদি আমানত হিসেবে গচ্ছিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের এ কৃষিব্যাংকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেই প্রথম ব্রিটিশ সরকার এদেশে Co-operative Credit Society Act– 1904 প্রবর্তন করে। এর ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথ নিজ জমিদারি কালিগ্রাম পরগনার পতিসরে নতুন কাঠামোতে আর একটি কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন আরো বৃহৎ আকারের পুঁজি ও নতুন নীতি নির্ধারণ করে। অনেক ভাবনা-চিন্তা করে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব ও দু'একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা সুদ ধার করে পতিসর কাছারিতে সরকারের Co-operative Credit Society Act–1904-এর আলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি (কারো কারো মতে দু'এক মাস আগে) একটি কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম দিলেন 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক'। শিলাইদহের কৃষিব্যাংকের আমানতের সব টাকা 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে' স্থানান্তরিত করা হল এবং সেটা কেবলমাত্র ঋণ প্রদান ও আদায়ের জন্য একটি শাখা হিসেবেই বহাল থাকল, কিন্তু সেখানে কোনো আমানতের ব্যবস্থা রাখা হল না। 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' ব্যাংকিং সংক্রান্ত সরকারি সকল বিধিবিধানের ভেতর দিয়েই পরিচালিত হচ্ছিল। এজন্য 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক'-কেই আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম আনুষ্ঠানিক কৃষিব্যাংক হিসেবে মূল্যায়ন করব। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন এভাবে– ... তখন বাংলাদেশে সরকারি কো-অপারিটিভ আন্দোলন আরম্ভ হয় নাই। ১৯০৫ সালে ব্যাংক বলিতে কী বুঝাইত, তাহার কোনো ধারণা সাধারণ লোকের ছিল না। সুতরাং 'কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠাকে নতুন ঘটনাই বলিব।[১৩]

আমি দৃঢ়ভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করতে চাই যে, দেশহিতৈষী জমিদার কবি রবীন্দ্রনাথের নয়া পল্লীসমাজ পরিকল্পনার সর্বোত্তম প্রকাশ যদি গণতান্ত্রিক গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় এবং এর অর্থনৈতিক ভিত্তি সর্বজনীন সমবায় ব্যবস্থায় ঘটে থাকে, তাহলে সে সমবায়চিন্তার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে পতিসরে 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে। 'গণতান্ত্রিক গ্রামীণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থা' এবং 'সর্বজনীন সমবায় ব্যবস্থা' এ দু'য়ের সমন্বয় ঘটিয়ে কৃষিপ্রধান মাতৃভূমির অর্থনৈতিক মুক্তি ঘটানোর লক্ষ্যেই দূরদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজস্ব মালিকানার জমিদারি কালিগ্রাম পরগনার পতিসরেই বপন করেছিলেন কৃষিব্যাংকের বীজ আজ হতে শতবর্ষ আগে। শতবর্ষ পরে আজ একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেই সুপ্ত বীজের মহীরুহ রূপটিকে। এর মূলে একদিকে যেমন রয়েছে সর্বজনার ঐক্যবদ্ধভাবে পথ-চলার চেষ্টা, এবং সে ঐক্য চিন্তায়, মানসিকতায় ও কাজে; অপরদিকে তেমনি রয়েছে গ্রামের সর্বাধিক শোষিত ও দারিদ্র্যনিষ্পেষিত মানুষের ভয়াবহ মহাজনি ঋণের কবল থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন ও আদর্শ পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় 'কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা ছিল একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার এ ব্যাংকের বহুমাত্রিক কার্যক্রম বিচারে এটিকে কখনো বলেছেন 'সমবায় ব্যাংক' আবার কখনো বলেছেন 'সঞ্চয় ব্যাংক'।[১৪]

সর্ববাদীসম্মতভাবে 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকের' প্রতিষ্ঠাসাল ১৯০৫ খ্রি. হলেও ঠিক কোন মাসের কত তারিখে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। পতিসরের কাছারিবাড়িটিই ছিল এর প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কার্যালয়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পরে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনই ছিল কৃষিব্যাংকের প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয়। সে যাইহোক, সম্ভবত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি বা এপ্রিল-মে মাসের কোনো এক শুভদিনে কৃষি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এমন অনুমানের কারণ, কৃষিব্যাংকের প্রয়োজনীয় যে-সব কাগজপত্র জমিদারিপ্রথা বিলুপ্তির পরেও পতিসর কাছারিবাড়িতে ছিল সেগুলো স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার উক্ত বাড়িটি তহশিল অফিসে রূপান্তরিত করার সময় পুড়িয়ে ফেলে। ফলে রবীন্দ্রনাথ ঠিক কোন তারিখে এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনেও কোনো নির্ভরযোগ্য দলিলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। পতিসরের কাছারিবাড়ির যে ঘরে কৃষিব্যাংকের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল সেখানে রক্ষিত কাগজপত্র যেভাবে পুড়িয়ে ফেলেছিল বাঙালিবিদ্বেষী পাকিস্তান সরকার, তা নিঃসন্দেহ একটি গর্হিত ও নিন্দনীয় কাজ। কৃষি-ব্যাংকের কাগজপত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত অনেক মূল্যবান দলিলও সেই আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে।[১৫] তবে কোনো কোনো রবীন্দ্রগবেষক এ অভিমত দিয়েছেন যে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের ১ তারিখে অথবা জুলাই মাসের কোনো এক শুভক্ষণে এই ব্যাংক উদ্বোধন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এমন অনুমানের পক্ষে তাঁদের যুক্তি, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কৃষিব্যাংক সংক্রান্ত মাইক্রোফিল্মে ১ আগস্ট ১৯০৫-এর আগে 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে' টাকা জমা দেওয়ার কোনো ভুক্তির সন্ধান মেলেনি। ঐ তারিখে ১৫০০ টাকা জমা এবং ১২ আগস্টে আবার ১৫০০ টাকা জমার পর ১৯০৬-এর জুলাই মাসে (তারিখ অস্পষ্ট) ৪০০০ টাকা এবং এরপর থেকে প্রায় নিয়মিতই বিভিন্ন তারিখে টাকা জমার রেকর্ড রয়েছে। ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর প্রধানত ঠাকুর পরিবারের সদস্য অনেকে এবং তাঁদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবই টাকা জমা

রেখেছেন। ব্যাংকের স্বত্বাধিকারী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রতনয় রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু কোথাও ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ নেই। ব্যাংকটি পতিসরে সদরে স্থাপিত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে 'পতিসর কৃষি ব্যাংক' নামে জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রভবনের তথ্যমতে কাগজপত্রে নাম দেখা যায় 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক'। প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর লেখায় একাধিকবার এ নামই উল্লেখ করেছেন। কাজেই 'কালিগ্রাম কৃষিব্যাংক' এই নামের ক্ষেত্রে কারো কোনো দ্বিমত নেই। সে যাইহোক, শিলাইদহেই যে সর্বপ্রথম কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ– এ বিষয়ে আমরা কেবলমাত্র সুধীর সেনের লেখায়ই পেয়েছি। তবে একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায় রবীন্দ্রভবনে পতিসর-বিষয়ক ১৪৬ সংখ্যক মাইক্রোফিল্মে। এতে দেখা যায়, ২ বৈশাখ ১৩১৩ তারিখে 'বিরাহিমপুর কৃষি ব্যাংক' থেকে স্থায়ী আমানতের টাকা 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে' স্থানান্তর করার জন্য চিঠি লেখা হয়েছে। কাজেই, শিলাইদহে 'কৃষি ব্যাংক' স্থাপনের ঘটনা ভিত্তিহীন নয়।[১৬] সে যাইহোক, শিলাইদহে স্বল্প মূলধন নিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে একটা 'কৃষি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করলেও এর ক্রমাবনতিহেতু অচিরেই এটিকে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব মালিকানার জমিদারিতে নতুন কাঠামোয় বর্ধিত পরিসরে প্রতিষ্ঠিত 'কালিগ্রাম কৃষিব্যাংকের' সাথে একীভূত করে কৃষি ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ ব্যাপ্তি ঘটিয়েছিলেন পতিসরে।

'ঠাকুর এস্টেট' থেকে যে টাকা নগদে আয় হত তার অধিকাংশই জমা হত 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে'। তাছাড়া প্রজারা যে টাকা চাঁদা হিসেবে প্রদান করত তা-ও সংশ্লিষ্ট সমবায় বা মণ্ডলীর নামে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা করা হত। এই সঞ্চিত টাকা আবার কৃষকদের মধ্যে ঋণ হিসেবে প্রদান করা হত।

রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের ঋণের পরিমাণ ও সুদ নির্ধারণে তাঁর কর্মচারীদের উপর নির্ভর না-করে পল্লীউন্নয়ন-কর্মীদের মতামতের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন। উল্লেখ্য যে, কৃষকদের ঋণ দেওয়া হত ফসল উৎপাদন খাতে আর নারীশ্রমিকদের ঋণ দেওয়া হত কুটিরশিল্প খাতে। ব্যাংক থেকে প্রজাদের বার্ষিক শতকরা নয় টাকা সুদে ঋণ প্রদান করা হত। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন প্রজারা অনেক সময় না-বুঝে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে তা ভোজন-বিলাস বা অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে বিপন্ন হয়ে পড়ত। অতুল সেন ও তাঁর কর্মীসংঘ হিসাব করে প্রজাদের প্রয়োজন নির্ধারণ করতেন। অতঃপর ভোজন-দক্ষিণার পরিবর্তে সাধারণ ফান্ডে কিছু চাঁদা নিয়ে তাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাজটি সেরেস্তার নায়েবদের হাত ছেড়ে দেননি। কৃষিব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। অতুল সেন ছিলেন এই ব্যাংকের প্রথম ব্যবস্থাপক। কারণ, রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে, জমিদারি সেরেস্তার বেতনভোগীদের হাতে এ কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হলে অনাচার বৃদ্ধি পাবে। ঋণ গ্রহণের কারণে চাষি তার ফসল সরাসরি ঘরে নিতে পারত না। তাকে সে ফসল ঠাকুর-এস্টেটে জমা দিতে হত। অতঃপর ফসলের দাম হিসাব করে ঋণ শোধ হবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকত তা কৃষক ঘরে নিতে পারত। এই সময় কৃষকের শতকরা ৩ টাকা সুদ রেয়াত (Rebate) করে দেওয়া হত। এর পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমতো ঋণ গ্রহণ করার অধিকারী হত। এর ফলে কৃষক বা প্রজাসাধারণকে চক্রবৃদ্ধি হারে সর্বনাশা সুদের কবলে পড়তে হত না।

রবীন্দ্রনাথের এই কৃষি বা প্রজাঋণ পরিকল্পনা কালিগ্রাম পরগনায় অত্যন্ত সফল হয়েছিল। ফলে কাবুলিপন্থী অন্যান্য মহাজনি ঋণদান প্রকল্প অচল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের ঋণআদায় প্রক্রিয়ার জন্য অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কৃষকের ফসল সরাসরি কৃষকের ঘরে না-যেয়ে জমিদারের ঘরে যেয়ে উঠত। এ কারণে অনেকে মতে করত যে, জমিদার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এই ফসল আত্মসাৎ করে নিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটি ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। একটি কেন্দ্রস্থলে ফসল জমা হবার পর ফসলের দাম নির্ধারণ শেষে ঋণের টাকা কেটে নিয়ে উদ্বৃত্ত ফসল কৃষককে ফেরত দেওয়া হত। ঋণ অনাদায়ী হবার ভয়ে চাষিরাই স্বেচ্ছায় এই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছিল। রবীন্দ্রনাথের কোনোরূপ হস্তক্ষেপ এতে ছিল না। এর ফলে দেখা গেল কৃষকের কৃষিঋণের ভার ক্রমশ লঘু হয়ে আসছে। আবার এরূপও হয়েছিল যে, অনেক কৃষক অবহেলাবশত কৃষিঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে পড়ে যার ফলে কৃষিব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তথাপি 'কৃষি ব্যাংক' পরিকল্পনা কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নের পথকে এদেশে আশাতীত সুগম করে দেয় যার সুফল আজকের প্রেক্ষাপটেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শিলাইদহ এবং পতিসরে কৃষি-ব্যাংক স্থাপিত হলে রবীন্দ্রনাথ সমবায় পদ্ধতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

রবীন্দ্রনাথ কৃষিক্ষেত্রে সমবায় বাস্তবায়নে লাঙলের পরিবর্তে কলের লাঙল (Tractor) প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন; কারণ তিনি জানতেন, সমগ্র জমি একত্র করে কলের লাঙলে চাষ করতে পারলে অল্প সময়ে সব জমি যেমন চাষ করা যায় তেমনি এই পদ্ধতিতে চাষি অর্থনৈতিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারে। প্রথমে শিলাইদহে ও পরে পতিসরে কৃষিব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদেরকে সমবায়ী হবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন। পতিসরে তাঁর নিজের জমিদারিতে এবং শিলাইদহেও রবীন্দ্রনাথ কলের লাঙল ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথ সমবায়ের মাধ্যমে কুটিরশিল্পেরও প্রসার ঘটাতে পেরেছিলেন। পতিসরের 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' কৃষকদের কৃষিকাজে ঋণপ্রদান ছাড়াও কুটিরশিল্প, চিকিৎসা, পথ-ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঋণ প্রদান করেছিল।[১৭]

ইতোপূর্বেও বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের এই পল্লীউন্নয়ন ও স্বদেশি সমাজ গঠনের প্রয়াস সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে অবাঙালি নেতৃত্বের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। স্বদেশি আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শ্রেণিগত ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতাই ছিল এর মূল কারণ। কবি ঠিকই বুঝেছিলেন কেন ওরা তাঁর তৃণমূল স্তরের উন্নয়নে আগ্রহী নয়। স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে গ্রামীণ জনসাধারণের রাজনৈতিক ফারাক ও চৈতন্যগত প্রভেদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাষায় লিখলেন– যাহাদিগকে আমরা 'চাষা বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখ দুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে হইলে আমাদিগকে গভর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ... তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিষ কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল।[১৮]

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সামন্ত মধ্যবিত্ত নির্ভরতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন গ্রামউন্নয়ন এবং দুঃস্থ অবহেলিত কৃষকশ্রেণির উন্নতির গুরুত্ব স্বাদেশিকতার পটভূমিতে তাদের বুঝিয়ে দিতে। তাই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পাবনায় অনুষ্ঠিত জাতীয়

কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তাঁর পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনাকেই মুখ্য বিষয় হিসেবে তুলে ধরেন। কংগ্রেসনেতাদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে শ্রোতাসাধারণের বোধগম্য মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন যা কংগ্রেসের ইতিহাসে সেই প্রথম। তাঁর ভাষণ পুস্তিকা আকারে ছেপে বিলি করা হয়। যে তিনটি বিষয়ের উপর তিনি তখন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন সেগুলো হল– (ক) গ্রাম পর্যায়ে সংগঠন গড়ে তোলা (খ) গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণির বিচ্ছিন্নতা দূর করা এবং (গ) গণসমাজের মধ্যে গ্রামউন্নয়নের কর্মপ্রচেষ্টাকে প্রসারিত করা।[১৯] কবির এই চিন্তার মধ্যেই নিহিত ছিল সম্প্রদায়গত ঐক্যের বিষয়টি। কারণ, গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শুধু দরিদ্রই নয়, তারা অধিকাংশই মুসলমান কৃষকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

দীর্ঘ এ অভিভাষণে কবি আবারও তাঁর স্বনির্ভর স্বদেশি সমাজ গঠন ও পল্লী পুনর্গঠনের রূপরেখা তুলে ধরেন। এখানেও সেই মণ্ডলীপ্রথা, সমবায়নীতির কথা, পল্লীমণ্ডলী থেকে জেলা হয়ে প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা গঠনের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। মণ্ডলী ব্যবস্থাই গ্রামে গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, কৃষিব্যাংক ইত্যাদি অপরিহার্য প্রয়োজনের দিকগুলো গড়ে তুলবে, স্বনির্ভর পল্লী গড়তে সাহায্য করবে। এ উপলক্ষে তিনি প্রজাদের শিক্ষিত ও শক্তিমান করে তোলার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন, যাতে জমিদার-জোতদার বা মহাজন তাঁদের উপর অত্যাচার চালাতে না-পারে। এই পরিকল্পনার 'মডেল' হিসেবে সুনির্দিষ্ট কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত তরুণ কর্মীদের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেন– তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক-একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ করো। শিক্ষা দাও, কৃষি, শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত করো।[২০]

রাজনৈতিক সংগঠন থেকে সাহায্য-সমর্থন না-পাওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে-কাজ শুরু করেছিলেন তাঁর নিজস্ব বলয়ে, ক্রমে তিনি তার বিস্তার ঘটাতে প্রয়াসী হলেন। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন কৃষিবিদ্যা শিখে আসার জন্য, যাতে তাঁর গ্রামউন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞানভিত্তিক মেধা ও শ্রমের সাহায্য নিশ্চিত করা যায়। আবার কনিষ্ঠা কন্যা মীরার বিবাহের পর ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকেও আমেরিকায় পাঠালেন কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য। সেযুগের বাঙালি ধনী পরিবারের লক্ষ্য ছিল সন্তানদেরকে জজ-ব্যারিস্টার অথবা ব্রিটিশ আমলা বানানো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ওইরকম ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ ছিল সেযুগের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই একটি অভূতপূর্ব দুঃসাহসিক ঘটনা। তাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে তিনি এক পত্রে লিখলেন– তোমরা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজার অন্নগ্রাসের অংশ নিয়ে বিদেশে কৃষি শিখতে গেছ– ফিরে এসে এই হতভাগ্যদের অন্নগ্রাস কিছু পরিমাণেও যদি বাড়িয়ে দিতে পার তাহলে মনে সান্ত্বনা পাব। মনে রেখো জমিদারের টাকা চাষীর টাকা এবং এই চাষীরাই তোমাদের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেরা আধপেটা খেয়ে এবং না খেয়ে বহন করছে। এদের ঋণ সম্পূর্ণ শোধ করবার দায় তোমাদের উপর রইল। নিজেদের সাংসারিক উন্নতির চেয়েও এইটেই তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে।[২১]

ছোট্ট এ পত্রে জমিদার রবীন্দ্রনাথের সমাজহিতৈষণা ও মানবিক বোধের এক অনন্য প্রকাশ ঘটেছে। এমন সমাজসচেতন জমিদারের পক্ষেই তো বলা সম্ভব– 'জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর। ... চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে।'[২২] যাতে জমিদার তাদের উপর অন্যায় অত্যাচারের সুযোগ না পায়। এর কারণ, অধিকাংশ জমিদারের শোষক-চরিত্র, তাদের প্রভুত্ববাদী স্বৈরাচারী চরিত্র মহানুভব রবীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না, অচেনা ছিল না একই সঙ্গে তাদের শাসক-নির্ভর চরিত্র। তাই নিজে জমিদার হয়েও ওসব জমিদারকে চিহ্নিত করেছেন, 'জমির জোঁক, প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব' বলে; 'প্রজারা যাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা সে অন্ন যাদের মুখে তুলে দেয়।' একই সঙ্গে জমিদারের শাসক-স্বার্থনির্ভর চরিত্রও তুলে ধরেছেন প্রমথ চৌধুরীর কাছে লেখা এক চিঠিতে– 'বাংলাদেশে জমিদারদের চেয়ে গভর্মেন্টের বড় কর্মচারী আর কে আছে?'[২৩]

এবার কৃষিব্যাংক প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। পতিসরে কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরপরই তা কৃষকদের মধ্যে এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে, তাঁদের ঋণের চাহিদা মেটানো স্বল্প শক্তির এ ব্যাংকের সম্ভব হচ্ছিল না। এমতাবস্থায় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ ব্যাংক চলল অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। এদিকে কবিগুরু তাঁর বিখ্যাত 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য মনোনীত হলেন নোবেল পুরস্কারের জন্য। পুরস্কার ঘোষণার তারিখটি ছিল ১৩ নভেম্বর ১৯১৩। এ সংবাদটি প্রথম ১৪ নভেম্বর কলকাতার সান্ধ্য দৈনিক 'Empire'-এ প্রকাশিত হয়। এ উপলক্ষে ২৩ নভেম্বর কবিকে শান্তিনিকেতনে প্রথম সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গে প্রথম সম্বর্ধনা দেন তাঁরই জমিদারি এস্টেটের 'স্নেহানুরক্ত কালিগ্রাম পরগনার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ' ১৩ জানুয়ারি ১৯১৪। এতে তাঁকে 'সুইডেনের নোবেল পুরস্কার দান', 'এশিয়ার রাজকবি' হিসেবে সম্বোধন, দেশে সম্বর্ধনা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট' উপাধি দানের সার্থকতা উল্লেখিত হয়েছে, এমনকি তাঁর প্রজা হিসেবে তাঁদের সৌভাগ্যের কথাও উচ্চারিত হয়েছে।[২৪]

কলকাতা লাটভবনে বঙ্গের ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল নোবেল পুরস্কারের স্বর্ণপদক, কাগজপত্র এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা (মতান্তরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার) মূল্যমানের Chartered Bank-এর একটি চেক রবীন্দ্রনাথের হাতে হস্তান্তর করেন। রবীন্দ্রনাথ এই টাকা পেয়েই কলকাতার Bengal Bank -এর মাধ্যমে প্রথমে পঁচাত্তর হাজার টাকা পতিসরের 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে' জমা করেন সাধের ব্যাংকটির আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য।[২৫] এই টাকা কৃষিব্যাংকে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের নামে 'স্থায়ী আমানত' হিসেবে গচ্ছিত রাখা হয় এবং এর থেকে প্রাপ্য সুদ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পাঠাবার বিধানও রাখা হয়েছিল। এভাবে ক্রমান্বয়ে নোবেল পুরস্কারের পুরো ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকাই কবি জমা করেছিলেন 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকে'। প্রথম প্রথম নোবেল পুরস্কারের টাকার পরিমাণ নিয়ে বিভিন্ন জনের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলেও শেষপর্যন্ত ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকার কথাই রবীন্দ্রগবেষকদের মতে স্থির হয়। যাইহোক, এই টাকা মূলধন হিসেবে পেয়ে পতিসরের কৃষিব্যাংক সচ্ছল হয়ে ওঠে। ফলে সুযোগসন্ধানী সুদখোর মহাজনদের এ অঞ্চল থেকে পুরোপুরিভাবে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে হয়। এই টাকা থেকে কৃষকদেরকে বিভিন্ন উৎপাদন খাতে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ঋণের কোনো টাকাই কৃষকদের কাছ থেকে ফেরত আসেনি। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথেরও কোনো অনুশোচনা বা দুঃখবোধ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন কার্য ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংকের' সে সময়ের ব্যাপক অবদানের কথা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ারে তৎকালীন সিভিলিয়ান L.S.S.O' Malley বিশেষ প্রশংসার সাথে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন–

It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zamindars.

A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahsildars, whose accounts are strictly supervised. Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office.

Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted of a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee. Remissions of rent are granted when inability to pay is proved. In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary Schools in each division and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary.

These are maintained out of a fund to which the estate contributes annually Rs. 1250 and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240 for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 per cent per annum. The depositors are chiefly Calcutta friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000 invested in loans.[২৬]

এই মন্তব্যের সারাংশ হল: নোবেলবিজয়ী বাংলাসাহিত্যের কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু সাহিত্যচর্চার মধ্যেই তাঁর বৈশিষ্ট্য সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর প্রজাদের আর্থিক সচ্ছলতা বিধান, সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে মুক্তিদান, তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিতরণ, স্বাস্থ্যসচেতনতা সৃষ্টি, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ প্রচলন প্রভৃতি কর্মকাণ্ড ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অভিনব ঘটনা। বিশেষ করে তাঁর কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠার ফলে এ দেশের মধ্যস্বত্বভোগী সুদখোর মহাজনদের ভাগ্যের চরম বিপর্যয় ঘটে এবং প্রজারা আর্থিকভাবে বহুলাংশে সচ্ছল হতে সক্ষম হয়।

কতদিন চলেছিল রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাংক? অমিতাভ চৌধুরীর ভাষায়, 'ব্যাংক চলেছিল পুরো কুড়ি বছর। তারপর ফেল (দেউলিয়া), রবীন্দ্রনাথ আরো ঋণগ্রস্ত।'[২৭] অর্থাৎ তাঁর হিসাবমতে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছে রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাংক। অপরদিকে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কৃষিব্যাংক সংক্রান্ত শেষ ভুক্তি জুলাই ১৯২৩। মোদ্দাকথা হল অনেক ভাঙা-গড়ার ভেতর দিয়ে কৃষিব্যাংক মোটামুটি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব কোনোমতে টিকিয়ে রেখেছিল। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'পিতৃস্মৃতি'-তে কৃষিব্যাংক সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করলেও এর মধ্যে কোনো সন-তারিখ উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন–

গ্রামের অভাব দূর করার জন্য হিতৈষী সভা নানান দিকে চেষ্টা করেছে–

শিক্ষাবিস্তার, তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি গ্রাম্য-শিল্প প্রচলন, চাষের উন্নতি, মাছের ব্যবসা, রাস্তাঘাট প্রস্তুত, সালিশের বিচার, জলকষ্ট নিবারণ, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি– কিন্তু একটি অভাব দূর করতে পারেননি, দূর করার ক্ষমতা ছিল না বলে। জমিদারির সঙ্গে পরিচয় হবার পরই বাবা লক্ষ করেছিলেন প্রজাদের মধ্যে সকলেরই ঋণ আছে। গ্রামে অবস্থাপন্ন লোক খুব কম, অধিকাংশ গ্রামবাসী ঋণে ডুবে রয়েছে, দেনা থেকে সারা জীবনেও তারা মুক্তি পায় না। তখনকার দিনে এইটাই ছিল পল্লীসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যা বাবাকে সর্বদাই পীড়া দিত, তাঁকে চিন্তিত করত, এর প্রতিবিধানের কোনও উপায় অনেকদিন পর্যন্ত তিনি খুঁজে পাননি। প্রজারা মহাজনকে টাকা শোধ দেবার চেষ্টা করত না তা নয়– কিন্তু সুদের হার এত বেশি আর সুদেও সুদ আদায় হত বলে আসল কোনো দিন শোধ হত না। এই অবস্থায় তাদের দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায় যুক্তিসংগত কম সুদে প্রয়োজনমতো কর্জ দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু সে ব্যবস্থা করতে অনেক টাকা লাগে, বাবার পক্ষে সেটা সম্ভব ছিল না।

সে সময়ে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের জন্য তাঁকে যথেষ্ট দেনা করতে হয়েছে, তবু প্রজাদের দুঃখ নিবারণের জন্য কিছু চেষ্টা না-করে তিনি থাকতে পারলেন না। বন্ধু-বান্ধব ও দু'একজন ধনী মহাজনের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। এই ব্যাঙ্ক যে মূলধন নিয়ে কাজ আরম্ভ করল সবই ধার করা টাকা– ধার করতে বাবাকে শতকরা ৮ টাকা সুদ দিতে হচ্ছিল। বাবা নিয়ম করলেন প্রজাদের কাছ থেকে ১২ টাকা সুদ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক চালাবার খরচা দিয়েও অনাদায়ী টাকার হিসাব করলে ব্যাঙ্কের কোনো লাভই থাকে না। তবু ব্যাঙ্কের কাজ এইভাবে চলতে থাকল। মূলধন সামান্য, তাতে প্রজাদের চাহিদা সংকুলান করা সম্ভব হল না। এর জন্য বাবা যখন খুবই চিন্তিত তখন আকস্মিকভাবে একটি সুযোগ উপস্থিত হল। নোবেল প্রাইজের ১,০৮,০০০/- টাকা তাঁর হাতে এসে পড়ল। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে দেবার তাঁর নিতান্ত ইচ্ছা, অথচ প্রজাদের হিতার্থে লাগাতে পারলেও তিনি খুশি হন। এই দো-টানার মধ্যে তিনি স্থির করতে পারছিলেন না কী করবেন। সুরেনদাদা (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ও আমি তাঁর কাছে তখন প্রস্তাব করি যে, প্রাইজের টাকাটা পতিসরে কৃষি ব্যাঙ্কে ডিপোজিট রাখা হোক শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের নামে। এতে দুদিকেরই উপকার হবে। তা-ই করা হল। যতদিন কৃষি ব্যাঙ্ক ছিল বহু বছর ধরে বিদ্যালয়ের ও পরে বিশ্বভারতীর বছরে আট হাজার টাকা করে একটি স্থায়ী আয় ছিল। ব্যাঙ্কেরও সুবিধা হল এই মূলধন পেয়ে। কৃষি ব্যাঙ্ক থেকে কর্জ নেবার চাহিদা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। কালিগ্রাম

পরগনার মধ্যে বাইরের মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। এমনকি কয়েকজন ডিপোজিট রাখতে আরম্ভ করেছিল। ব্যাঙ্ক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণমুক্ত হবার। কৃষি ব্যাঙ্কের কাজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল যখন Rural Indebtedness-এর আইন প্রবর্তন হল। প্রজাদের ধার দেওয়া টাকা আদায় হবার উপায় রইল না– নোবেল প্রাইজের আসল টাকা সেইজন্য কৃষি ব্যাঙ্ক বিশ্বভারতীকে শেষ পর্যন্ত ফেরত দিতে পারেনি।[২৮]

এভাবেই কবির নোবেল পুরস্কারের পুরো টাকাটাই প্রজাহিতে বানে ভেসে গেল। শুধু নোবেল পুরস্কারের টাকাই নয়, ব্যাংকের দুরবস্থার কারণে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ের রয়্যালটি এবং আমেরিকায় বক্তৃতা বাবদ প্রাপ্ত টাকা থেকে নয় হাজার টাকা কৃষিব্যাংকে জমা রেখেছিলেন। সবই একসঙ্গে নিঃশেষ হয়ে গেল। নোবেল পুরস্কারের টাকা জমাদানের পরও যখন কৃষিব্যাংকের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাচ্ছিল না তখন রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রমথ চৌধুরীকে বারবার অনুরোধ করে লিখেছিলেন, 'দোহাই তোমার যত শীঘ্র পার ব্যাংকটাকে Joint Stock Company-তে পরিণত করে দাও।'[২৯] কিন্তু সে সতর্কবাণী ও নির্দেশ পালিত হয়নি।

পঞ্চান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে সমবায় পদ্ধতি প্রবর্তন ও কৃষিব্যাংক কার্যক্রমকে অনেক ভর্তুকি দিয়েও জোরালো গতিতে সচল রেখেছিলেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসন, কতিপয় আমলা ও মহাজনদের বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, রাজনৈতিক অঙ্গনের অসহযোগিতা প্রভৃতি প্রতিকূলতার কারণে পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন প্রচেষ্টা ও কৃষিব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাবনতির দিকে ধাবিত হতে থাকে। ১৯২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে কৃষিব্যাংকের কার্যক্রম প্রায় স্থগিত হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীউন্নয়ন পরিকল্পনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। তা হচ্ছে– বাংলার লোকসংস্কৃতি। শিলাইদহে পল্লীউন্নয়নের কাজে নেমে তিনি বাংলার আবহমান লোকসংস্কৃতি উদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি নিজেও এ কাজে ব্রতী ছিলেন। শিলাইদহেই এই কাজ তিনি শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, উন্নয়নের সঙ্গে আনন্দ না-থাকলে যথার্থ উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্য তিনি বিভিন্ন ধরনের মেলা ও উৎসবের ব্যবস্থা করেছিলেন। পৌষ-পার্বণ, নবান্ন উৎসব, মধুমেলা, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি অনুষ্ঠান তাঁর সময়ে নিয়মিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে আসায় বাংলা সাহিত্যের আরো একটি হারানো অধ্যায়ের পুনরুজ্জীবন ঘটে। তাঁর শিলাইদহে আগমনের ফলেই লালনগীতিসমূহ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি নিজস্ব উদ্যোগে লালনগীতির ২৯৮টি গানের অমূল্য পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে ছাপানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি শিলাইদহে না-আসলে লালনশাহের গানগুলো হয়তো হারিয়ে যেত কিংবা বিকৃতভাবে লোকমুখে প্রচারিত হত। গানগুলো উদ্ধারের পর রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে প্রথমে পত্রিকায়, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী' পত্রিকার হারামণি বিভাগে প্রথম লালনগীতি প্রকাশিত হয়। এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন যে, শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আগমন না-ঘটলে বাংলা গানের জগতে লালনগীতির কোনো অস্তিত্বই হয়তো থাকত না।[৩০]

আবার কৃষিব্যাংক প্রসঙ্গে ফিরতে হচ্ছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ১৮৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে 'ঠাকুর এস্টেট' এজমালীতে থাকাকালে শিলাইদহে যৎসামান্য মূলধন ও ক্ষুদ্র পরিসরে প্রথম কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে পতিসরে মোটামুটি সন্তোষজনক মূলধন ও আরো ব্যাপক পরিসরে 'কালিগ্রাম কৃষিব্যাংক' নামে প্রতিষ্ঠানিকভাবে কৃষিব্যাংকের গোড়াপত্তন ঘটান এবং এরসাথে শিলাইদহের বিপর্যস্ত ব্যাংক শাখাটিকেও একীভূত করে নেন। শিলাইদহ-পতিসরে কৃষিব্যাংকের সূচনালগ্ন থেকে ক্রমান্বয়ে যেসব স্বদেশপ্রেমী মহামানব এই ব্যাংকের বিকাশ সাধনে কবিগুরুর সাহায্যার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানাবিধ অবদান রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন হলেন– বিশ্বখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, ব্রিটিশবিরোধী রাজনীতিবিদ শেরেবাংলা এ.কে.ফজলুল হক, কুষ্টিয়ার তদানীন্তন কৃষি কর্মকর্তা কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারতের সেরা আই.সি.এস. বিশ্বনন্দিত ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীগুরুসদয় দত্ত প্রমুখ মহারথী বঙ্গসন্তানগণ। এঁরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশপ্রেমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

শিলাইদহে পল্লীসংস্কার এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম যে উদ্যোগ রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন তার পাঁচটি অঙ্গ ছিল। যথা: চিকিৎসা বিধান, প্রাথমিক শিক্ষাদান, পূর্ত বিভাগ স্থাপন বা কূপ খনন, রাস্তাঘাট প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গল পরিষ্কার প্রভৃতি সর্বজন মঙ্গলকর্ম সমাধান, ঋণদান থেকে গরিব চাষিকে রক্ষার জন্য সমবায়-সমিতি স্থাপন ও কৃষিব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং সর্বনাশা মামলাসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সালিশি গঠন। শিলাইদহে এসব দেশ ও জনহিতকর কার্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পরামর্শ দিয়ে বাধিত করেছিলেন কবির বন্ধু উদ্ভিদবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। কবির জমিদারিতে চাষাবাদের বৌদ্ধিক ও আর্থিক সহযোগিতা দানের পাশাপাশি ব্যাংকের একজন উপদেষ্টা হিসেবেও বিশেষ অবদান রেখেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হচ্ছে– রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী-বন্ধুর পরামর্শে শিলাইদহে গুটিপোকার চাষ করেছিলেন। গুটিপোকার সমৃদ্ধি সম্পর্কে কবি তাঁর বিজ্ঞানী-বন্ধুকে এক পত্রে রঙ্গ করে লিখলেন–

> শ্রীযুক্ত অজয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি– দশ-বারো জন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে– লরেন্স রান-আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করিয়া প্রায় পাগল করিয়া তুলিল।[৩১]

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে যখন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন তখন তাঁর বিশেষ অনুরোধে বিজ্ঞানী-বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসু এই 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সহ-সভাপতি পদ অলংকৃত করেছিলেন। আবার জগদীশচন্দ্র বসু যখন কলকাতায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠা করলেন তখন এর একাধিক কমিটিতে কবি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে সহ-সভাপতি করেছিলেন। উভয়ের বন্ধুত্বের বহুবিধ নিদর্শনের মধ্যে অক্ষয় স্থাপত্যকীর্তি হয়ে আছে কবির 'বিশ্বভারতী' আর বিজ্ঞানীর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির'। কবির 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান ছিল তাঁর বিজ্ঞানী-

বন্ধু জগদীশচন্দ্র বসুর, অপরদিকে বিজ্ঞানীর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠায় সর্বাধিক অবদান ছিল তাঁর কবি-বন্ধু রবীন্দ্রনাথের। কবি ও বৈজ্ঞানিকের এমন অপূর্ব সমন্বয় শুধু বাংলার ইতিহাসকেই নয় পৃথিবীর ইতিহাসকেও সমৃদ্ধ করেছে।

আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এ পরিকল্পনার সাথে রাজনৈতিক অঙ্গনের কেবলমাত্র প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ তৎকালীন বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য জননেতা এ.কে.ফজলুল হক একাত্মতা ঘোষণা করেন। ফজলুল হক কৃষক-প্রজার মুক্তির লক্ষ্যে আত্মনিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনিও উপলব্ধি করেছিলেন এদেশের কৃষক-প্রজাদেরকে জমিদার-মহাজনদের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সোজা করতে হলে ব্যাংকিং পদ্ধতিতে কৃষিঋণ প্রদানের ব্যবস্থা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এ ব্যাপারে 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' প্রবর্তনের বিষয় অবহিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ জননেতা ফজলুল হকের চিন্তাধারায় এক নতুন মাত্রার যোগ ঘটাল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন জামালপুর জেলার কামারিয়া চরে (কুমার চর) জননেতা ফজলুল হক কৃষক-প্রজাদের এক বিরাট সমাবেশে কৃষক-প্রজার অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কৃষিব্যাংকের সুফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন এবং দেশের সর্বত্র সমবায় সমিতি গঠন ও 'কৃষি সমবায় ব্যাংক' গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৩২] তাঁর প্রস্তাবকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কৃষক-প্রজাগণ সাদরে গ্রহণ করেন। এভাবে রবীন্দ্রনাথের 'কৃষি ব্যাংক' ব্যবস্থা বৃহত্তর বাংলার সর্বত্র কৃষকদের মধ্যে এক নতুন পথের সন্ধান দিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালিগ্রাম কৃষি ব্যাংক' সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যে উপদেষ্টা ও সহায়করূপে জননেতা ফজলুল হকের সর্বাত্মক সহযোগিতা পেয়েছিলেন। কৃষিব্যাংকের প্রদত্ত অর্থ দরিদ্র কৃষকরা ফেরত দিতে না-পারায় ব্যাংকের অবস্থা যখন নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন তখন জননেতা ফজলুল হক এ ব্যাংক রক্ষার স্বার্থে অর্থনৈতিক সহায়তাও প্রদান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কৃষি-ব্যাংকের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হচ্ছিল। আর এ অবস্থা-দর্শনে বিচলিত রবীন্দ্রনাথ তাই প্রমথ চৌধুরীকে প্রস্তাব করেছিলেন, ব্যাংকটিকে অবিলম্বে Joint Stock Company-তে পরিণত করার জন্য। যাইহোক, শেষপর্যন্ত ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে কবি জাপান ভ্রমণে গেলেন জাপানের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের সূত্রগুলো স্বচক্ষে দেখে স্বদেশে তা প্রয়োগ করার মানসে।

এল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ। কৃষিব্যাংকের কার্যক্রম কোনোমতে চলছে। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবন কৃষিব্যাংকের অস্থায়ী প্রশাসনিক কার্যালয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে বহুমুখী শিক্ষার কার্যক্রম চলছে। সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্যকলা প্রভৃতি শিক্ষণের পাশাপাশি কৃষিবিদ্যা ও পল্লীউন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ের শিক্ষাদানও চলছে। এ বছরের জানুয়ারি মাসে কবি পুনরায় জাপান ভ্রমণে যান, এ যাত্রায় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন কেবলমাত্র পিয়রসন। পিয়রসন ছিলেন শান্তিনিকেতনের নিবেদিতপ্রাণ অধ্যাপক। তিনি জাতিতে ইংরেজ। এই পিয়রসনের অবদানে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন সম্ভব হয়েছিল। মাসকয়েক জাপান ভ্রমণ করে কবি স্বদেশে ফিরে এলেন আর পিয়রসন চীন ও জাপান ভ্রমণের মানসে আরো কিছুদিন জাপানে রয়ে গেলেন।

কবি জাপান থেকে ফিরে এসে দেখলেন– এ বছরই বীরভূমের জেলাশাসক হয়ে এসেছেন বাংলার আরেক ক্ষণজন্মা পুরুষ বঙ্গ-ভারতের সেরা আই.সি.এস. গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয় দত্ত ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন প্রবল রবীন্দ্রভক্ত এবং তাঁর ভাবশিষ্য।

কবিগুরু সেই অনুজপ্রতিম বন্ধু গুরুসদয়কে আহ্বান জানালেন, বাংলার কৃষককুলকে বাঁচাতে তাঁর পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ও কৃষিব্যাংকের করুণ দশা নিরসনে এগিয়ে আসতে। এই মহান বাঙালি দেশপ্রেমিকের পরিচয় ও কর্ম বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পল্লীপ্রকৃতি' বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৯৬২, পৃ. ২২৪-২২৫

২. Mr. William T. Harris, The US Commissioner of Education presented this speech before the American National Council of Education at a meeting in Cleaveland in 1903. উদ্ধৃতি, ড. আনোয়ারুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা', ছাত্র সম্ভাষণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৩৯৭, পৃ. ১৩২

৪. অমিতাভ চৌধুরী, 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী, ১৩৮৩ বাং, পৃ. ৯-১২

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পল্লীপ্রকৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২৪

৬. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১-২২

৭. Sudhir Sen, 'Rabindranath Tagore on Rural Reconstruction', Calcutta, P. 93.

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র, ৩০ ফাল্গুন ১৩১৩, দ্র. 'পল্লীপ্রকৃতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

৯. ড. আনোয়ারুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

১০. প্রমথ চৌধুরী, 'রায়তের কথা', বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৫৪, পৃ. ২১

১১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী-২', পৃ. ১৭৬

১২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮

১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-৭৭

১৪. আহমদ রফিক, 'রবীন্দ্রভুবনে পতিসর', সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, মে ১৯৯৮, পৃ. ৮৬

১৫. সালাম আজাদ, 'রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড প্রত্যাখ্যানের দলিল ও অন্যান্য প্রসংগ', ঐতিহ্য, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩, পৃ. ৯০

১৬. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

১৭. ড. আনোয়ারুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

১৮. রবীন্দ্ররচনাবলী-১০, বিশ্বভারতী ১৯৭১, পৃ. ৬৩০

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-২১

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী-৪', আনন্দ, কলিকাতা ১৩৯৫, পৃ. ৩৯৩-৯৪

২২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিঠিপত্র-৬', বিশ্বভারতী, ১৩৫২, পৃ. ৯০

২৪. আহমদ রফিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

২৫. সালাম আজাদ, 'রবীন্দ্রভুবনে বাংলাদেশ', বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১০, পৃ. ৪৩

২৬. L.S.S.O' Malley I.C.S. 'Rajshahi District Gazetteer-1916', উদ্ধৃতি, আবদুশ শাকুর, 'মহামহিম রবীন্দ্রনাথ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৭, পৃ. ৭১-৭২
২৭. অমিতাভ চৌধুরী, 'জমিদার রবীন্দ্রনাথ', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা ১৯৭৬, পৃ. ৫৫
২৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫-২৫০
২৯. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী-৭', পৃ. ২৯৭
৩০. সালাম আজাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩১. প্রাগুক্ত

৩২. মো. জয়নাল আবেদীন, মহাব্যবস্থাপক (হিসাব), 'বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বর্তমান সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও বিভিন্ন প্রকল্পে সাম্প্রতিক অর্থায়ন', বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা, তাং ১৯ মার্চ ২০০৬। নতুন পদোন্নতিপ্রাপ্ত পরিদর্শকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রদত্ত হ্যান্ডনোট ও বক্তব্য।

সত্তর, আশি, নব্বই, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা

কবিতা

স ত্ত রে র দ শ ক

মু হা ম্ম দ সা মা দ

দাদিমার শুয়োর পেটানো লাঠি

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল পতিত জঙ্গল
অড়হর ক্ষেত জংলি কচুর বন
জমিদার প্রিয়নাথ বাবুদের শ্মশানের পাশে ছিল
কচুরিপানায় ভরপুর দিগন্তবিস্তৃত ঝিল ।
পৌষের মধ্যেই ধানকাটা শেষ হয়ে যেতো
ধানের নাড়ায় অগ্নি-উৎসব করে তাড়িয়ে দিতাম
বাঘকাঁপা মাঘের হিমেল শীত ।

ঝিলের কচুরিপানা কাদামাটির ছোঁয়াচ পেয়ে
খোঁপায় বেগুনি ফুল আর সবুজ পাতায় রুপালি শিশির নিয়ে
খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো সূর্যের দিকে চেয়ে ।
আর, ঠিক সেই সময়ই গারো পাহাড়ের ঢাল বেয়ে
একদল ডোম ঝাঁক ঝাঁক শূকরের পাল তাড়াতে তাড়াতে
তল্লাট কাঁপিয়ে ডেকে উঠতো – হো-ও-ও উ হোঃ...

ছোটবেলা আমি খুব ভীরু আর শীর্ণকায় বালক ছিলাম
শুয়োরের ঝাঁক দেখলেই আমার দাদিমা বাঁশের একটি
লম্বা লাঠি ধরিয়ে দিতেন আমার দুর্বল হাতে
আর উচ্চস্বরে বলতেন, – দে, জো... রে বাড়ি দে
বুকের সাহস বাড়ে, দে! বাড়ি দে জোরে

আজ দাদিমা'র কথা খুউব মনে পড়ছে আমার
আমাদের ছোট বাড়িটার ভেতরে বাইরে চতুর্দিকে
ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে দাঁতাল শুয়োরের ঝাঁক...
আমি এই শুয়োরের পিঠগুলো পিটিয়ে গুঁড়িয়ে
বুকের সাহস ফিরে পেতে চাই!

দাদিমা, তোমার সেই শুয়োর পেটানো লাঠি
আজ আমাদের বড়ো প্রয়োজন...
বৃক্ষ: এক

আমার তালুতে দেখো – গেঁথে আছে
কালের পেরেক ।

আমার যৌবন খোঁড়ো

দেখো, কী সুন্দর অন্ধ এই খাণ্ডব দহন
সঞ্জীবনী প্রেম আর মাটির বিশ্বাস ।

আমার দেহের ভাঁজ খোলো, দেখো,
কেমন সুতীক্ষ্ণ জ্বলে লাঙলের ফলা
বাৎসায়ন, চাষের চৌষট্টি কলা
আর
সুস্বাদু গন্ধম ।

হিরন্ময় পৃথিবীর এইসব সরস কাহিনী-কথা
সে তো আদিম রক্তের উষ্ণ মহাকাব্য– ঝড়;
অনল বিশ্বাসী এক কবি
পাথরে প্রোথিত যাঁর আমূল শেকড় ।

বৃক্ষ: ছয়

কুমারী, জোনাকি তুমি
মিটিমিটি জ্বলে ওঠো আমার আকাশ-দেহে
সবুজ পাতারা দেবে তোমাকে আশ্রয় ।

সারাদিন নিদ্রা যেয়ো ঝিরিঝিরি দক্ষিণা বাতাসে
রাখাল গরুর পাল নিয়ে ফিরে যাবে ঘরে
গোধূলি ছড়াবে মায়া গাঁয়ের হালটে
বলাকার বাঁকা ঢেউ ডুব দেবে কিশোরীর চোখে
কাঁখের কলস থেকে ভেজাশাড়ি
মেঠোপথে ছিটাবে রূপের ফোঁটা;
মাটির মসজিদ থেকে মুয়াজ্জিন ঢেলে দেবে সুধার নহর
ধবল শঙ্খের স্নিগ্ধ হাতে পিদিমের আলো আর
সিঁথিতে সিঁদুর মেখে নরম-কোমল ঠোঁটে
উলুধ্বনি পেতে দেবে লক্ষ্মীর আসন!

কুমারী, জোনাকি তুমি
মিটিমিটি জ্বলে ওঠো আমার আকাশ-দেহে
সবুজ পাতারা দেবে তোমাকে আশ্রয় ।

গাঁয়ের মন্দির

ভিতরে বিগ্রহ ভাঙা
দাঁত ও স্বর্ণের দুল সেই কবে চুরি হলো
স্বল্প তেলে সমৃদ্ধ সলতে, ছোটমোম
রাত দশটায় মরে যায়!

আয়ুষ্মতী অন্ধকার তেড়ে আসে
বাদুড়ের বিষ্ঠা ঝরে
শ্যামার কুন্তলে ।
গোখরোর হিম বুক স্তনের গোড়ালি বেয়ে
পোকা খোঁজে
শ্যাওড়ার ঘনঝোপে – শটিবনে ।

কাকভোরে যুবতী নেয় না তুলে
বাসিফুল দুধ কলা ফলার প্রসাদ ।

দুপুরে দোয়েল আর শালিকের ঠোঁট
চুনকাম করে
দেবীর শরীর – গলা ঘাড় চারটি লতানো বাহু ।

সন্ধ্যায় কাঁসর-ঘণ্টা উলুধ্বনি খোল-করতাল
কিছুই বাজে না আজ;
কাঁপে না কিশোরী-বুক, নাচে না তল্লাট, ছোটে না কিশোর!

সারারাত ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে
পুরনো সুড়কি – ঘুমানো আস্তর
যেনো স্তব্ধ আর্তনাদে ফেটে পড়ে রোঁয়া ওঠা শহুরে কুকুর!

তবুও কঁকিয়ে ওঠে
সিঁদুরের ফোঁটা
লাজুক ঘোমটা সাদা শাঁখা মাটির প্রতিমা
বোন
আমাদের গাঁয়ের মন্দির ।

একুশে ফেব্রুয়ারি

একুশ আমার বোনের দুঃখ
মায়ের চোখের জল

একুশ আমার ভাইয়ের রক্ত
চির-সমুজ্জ্বল

একুশ আমার পিতার আক্রোশ
পুত্রের তাজা খুন

একুশ আমার অস্তিত্বের রথ
বাংলাদেশের ভ্রূণ ।

একজন রাজনৈতিক নেতার মেনিফেস্টো

না
মার্কস
          লেনিন
                    মাও
                              গান্ধী
                                        ভাসানী
                                                  বঙ্গবন্ধু'র মতো নয়
তাঁরা তো মানুষের জন্যে রাজনীতি করতেন ।

দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতা
আকাশ-পাতাল সামাজিক বৈষম্য
দেউলিয়া অর্থনীতি
কপর্দকহীন রাজকোষ
অপসংস্কৃতির বাধভাঙা ঢল
নৈতিক অবক্ষয়ের গড্ডলিকা প্রবাহ
যার সঙ্গে আপনারা ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ত, যেমন
বাষ্প কিংবা মেঘের মধ্যে জল ।

এসব নিয়ে দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটছে দিন আমার;
আমি আপনাদের একজন জনদরদী মহান নেতা
আপনাদের হাততালি
                    জিন্দাবাদ
                      প্রাণঢালা ভালোবাসা
                              এবং রক্তিম অভিনন্দন থেকে
একবিন্দুও বঞ্চিত হতে চাই না ।

কারণ, বঞ্চিত জনগণই আমার রাজনীতির মূল অনুপ্রেরণা
এবং ক্ষমতার উৎস ।
অন্যেরাও বলবে একই কথা জানি;
তাছাড়া কিছু বেজন্মা বুদ্ধিজীবী বেশ্যা, শহরের সেরা
কিছু পেশাদার পাণ্ডা আর গ্রাম্য টাউটের হাতে
টাকার বান্ডিল ছুঁড়ে দিলে
একমাত্র আপনারাই আমার নামে আজীবন জিন্দাবাদ দেবেন;
আজন্ম সংগ্রামী জননেতা শিরোনামে
ছাপা হবে পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার বিপ্লবী ছবি –
এর চেয়ে একজন নেতার জীবনের কিইবা
বেশি প্রত্যাশা থাকতে পারে বলুন?

সমবেত সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা
তবু –
ঘাতকের নির্মম বুলেটে বজ্রকণ্ঠ স্তব্ধ হোক
সবংশে নিশ্চিহ্ন হোক স্বাধীনতার মহান স্থপতি
শান্তিপূর্ণ মিছিলে অবৈধ অস্ত্রের ব্যারেল থেকে ঝরুক বুলেটের ঝাঁক
দুখিনীর বুকের মানিক ঢলে পড়ুক কালো রাজপথে
আইনের অন্যায় ষড়যন্ত্রে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুদণ্ড হোক
পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ স্থান জেলের অভ্যন্তরে
নৃশংস হত্যা হোক রাজবন্দিদের ।
অনশন চলুক – কারাগার হোক বিক্ষোভের জ্বলন্ত অগ্নিগিরি
গর্জে উঠুক পুলিশের রাইফেল
নির্বিচারে নিরীহ বন্দিরা নেতিয়ে পড়ুক চিরতরে ।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উসকানির আখড়া হোক
জনসভায় বোমা মেরে কল্যাণের রাজনীতি শুরু হোক নতুন স্টাইলে

কালনাগিনীরা বিষাক্ত ফণা তুলে উঠে আসুক রাজনৈতিক মঞ্চে
সৈনিকের সক্রিয় রাজনীতির খায়েশ দৃঢ়মূল হোক
ঘন ঘন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটুক
প্রয়াত প্রেসিডেন্টের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাক ।
দেশের সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠান আর্তচিৎকারে ফিরে যাক
কসাই মালিকের ঘরে

শ্রমিকেরা বিক্ষুব্ধ হোক
উৎপাদন ব্যাহত হোক জরুরি পণ্যের ।
হাসপাতালে হ্যারিকেন জ্বেলে অস্ত্রোপচার চলুক মুমূর্ষু রোগীর
ডাক্তাররা ধর্মঘটে যাক
নার্সেরা সেবার হাত গুটিয়ে নিক
বসন্তের কোকিলের কণ্ঠ কর্কশ হোক ।

প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাক টাকার প্রয়োজনে
সম্মানিত অধ্যাপক লাঞ্ছিত হোক ছাত্রের হাতে
অভিভাবকের নির্মম প্রহারে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু হোক
নিরীহ শিক্ষকের;
হল-হোস্টেলগুলো অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার হোক
সন্ত্রাসের রাজত্ব হোক রাজনীতির নাম ।
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিরতরে ঝুলে যাক
সিলমারা প্রকাণ্ড তালা ।

চোরাপথে অজস্র সম্পদ পাচার হোক
দক্ষ জনশক্তি দেদার চালান হোক বিদেশে
সরকারের পররাষ্ট্রনীতি আরো নতজানু হোক –
আমাদের প্রতিনিধিদল কিছুটা সময় নগ্ন যুবতীর দেহে
রৌদ্রস্নানে কাটিয়ে আসুক বিদেশি সাগরসৈকতে ।
প্রচারমাধ্যমগুলো ক্ষমতাসীনদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হোক
রাতারাতি অগ্রগতির বানোয়াট পরিসংখ্যানে ছেয়ে যাক দৈনিকের পাতা ।

একটুকরো কাগজ আর কলমে সম্পদশালী
সাহসী সাংবাদিকের বুক ঝাঁজরা হোক আততায়ীর ব্রাশফায়ারে
বুদ্ধিজীবীরা বুদ্ধির মাথা খেয়ে নির্বোধ হোক
আতঙ্কে থেমে যাক লেখকের প্রতিবাদী কলম

শিল্পীরা 'মানুষ'-এর ছবি বদলে রমণীর নগ্ন-শরীরে
দিক তুলির উত্তপ্ত আঁচড় ।
আধুনিক ছ্যাঁচড়া কবি গাঁজায় টান দিয়ে
রঙিন স্বপ্নে বিভোর হোক
সাহিত্যে অশ্লীল শব্দের অবাধ আমদানি শুল্কমুক্ত হোক ।

লালফিতার একটানা দৌরাত্ম্যে প্রশাসন শিথিল হোক
কর্মচারীরা বেপরোয়া ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ হোক
প্রকৌশলীরা অসৎ হোক
অট্টালিকা দালানকোঠা স্বল্পায়ু হোক
ব্রিজ-সেতু দরদর ভেঙে যাক
আইন ব্যবসার নামে অর্থলোভে
উকিল-ম্যাজিস্ট্রেটের মধ্যে অন্যায় চুক্তি হোক –
আমার গরিব বাবা ভিটেমাটি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত হোক ।

দেশের সমস্ত নদ-নদী ভরাট হোক
বন্যায় তলিয়ে যাক ভিটে
সবুজ শস্যের সমারোহ বিলীন হোক ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে ।
নরনারী বিবস্ত্র হোক
কৃষকের গোয়াল শূন্য হোক
পুকুর শুকিয়ে চৌচির হোক
দীর্ঘস্থায়ী খরায় শ্যামল শস্যের মাঠ
পুড়ে ছারখার হয়ে যাক ।
অনাহারে ধুঁকে ধুঁকে শীতল মৃত্যুর মুখোমুখি হোক
গ্রামের সরল মানুষ
অপুষ্টিতে হাজারো নিষ্পাপ শিশুর অপমৃত্যু হোক
অর্থাৎ
প্রভু যিশু ক্রুশবিদ্ধ হোক না-ফুরাতে সাধ ।
যৌতুকের যাঁতাকলে সুন্দরী গৃহবধূ গলাকাটা লাশ হোক ।
ক্ষমাহীন ক্ষুধার তাড়নায় অবগুণ্ঠিতা বোন বেশ্যা হোক
কন্যাদায়গ্রস্ত আমার হতাশ পিতা ফাঁসিতে ঝুলুক ।
লাগামহীন কাগজিনোটের প্রচলনে
বাজারে মুদ্রাস্ফীতি আসুক
দ্রব্যমূল্যের লেলিহান শিখায় দাউদাউ জ্বলে যাক
বৃদ্ধ বাবার পেনশনের ফান্ড ।
বিয়ের স্মৃতিমাখা মায়ের গহনা বন্ধক থাকুক

টাউট মহাজনের হাতে ।

বেকার যুবক ডাকাত হোক
ছিনতাই হাইজ্যাক হোক সদাই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার,
যানবাহন দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মাথামুণ্ডু থেঁতলে যাক
মর্মান্তিক সলিল সমাধি হোক অসংখ্য মানুষের ।

অফিসার্স ক্লাবে বউ বদ্‌লাবদ্‌লি করে মনোরম নিশি ভোর হোক
বিদেশি মদের মদির সুবাসে নূহের প্লাবনের মতো
ভরে যাক সারাটা শহর ।
হোটেলের আলোঝলমল রঙিন ক্যাবারে
নাচুক উদোম উর্বশী ।
অভিজাত গৃহিণীর রতিক্রিয়া শুরু হোক চাকরের সাথে ।

বিভিন্ন শহরের তথাকথিত অভিজাত এলাকায়
রাতারাতি গজিয়ে উঠুক বিলাসবহুল একতলা বাড়ি
ধনীর দুলালীর মুখ সৌন্দর্যে রাঙা হোক গরিবের রক্তে ।
বিদেশি ক্রাইমছবি পর্নোগ্রাফি ভিসিআর ব্লু-ফিল্‌মে
চুমু খাক অপ্রাপ্ত কিশোর-কিশোরী ।
বিকিনি পরে কলকল জলে গোলাপি নরম বুক
ঘন কুয়াশার মতো প্রশস্ত মসৃণ গ্রীবা এবং নদীর মতন
পেলব উরু সুইমিং শিখুক ।
দেশের মূর্খ মন্ত্রীরা
অনাহারী মানুষের মুখে প্রস্রাব করে দিয়ে
মহাসমারোহে
জাতীয় কুকুর প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করুক ।

প্রতিটি পদক্ষেপেরই তীব্র নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছি
একটি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বহুবার বলেছি
আপনারা বিশ্বাস করুন
এইসব গর্হিত সামাজিক কর্মকাণ্ড
অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ আজন্ম লালিত
আমার সংগ্রাম ।

তবে, আমি চাই –

আমার সন্তানেরা কিন্ডারগার্টেনে পড়বে
আমার লোকেরা মঞ্চ তৈরি করবে –
আপনারা যাদের চাম্‌চা বলেন;
আমি গাড়ি করে গিয়ে সরকার উৎখাতের
জ্বালাময়ী বক্তৃতায় উপস্থিত জনতার
সব হাততালি কুড়াব একাই ।

মফস্বলে সাংগঠনিক সফরে গেলে

রিজার্ভেশন কিংবা বিমানই আরামদায়ক জার্নি;
খাবারের মেনুটা অবশ্যই এলাকার নেতার কাছে
জানিয়ে দেবে আমার ব্যক্তিগত বাবুর্চি আবদুল ।
আমার নামে শ্লোগান উঠবে
... তুমি এগিয়ে চলো ... আমরা আছি ...

কতটুকু এগোব – সীমারেখা সম্পর্কেও আমি অত্যন্ত সতর্ক
কারণ,
গান্ধি আলেন্দে লুমুম্বা বঙ্গবন্ধু'র বুকে
বুলেট বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দে
আমি আজো আতঙ্কে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি!
দেশ ও জাতির এই দুর্যোগময় মুহূর্তে
আমি আপনাদের শুধু মিষ্টি কথার জোর আশ্বাসের ফুলঝুরি
এবং
জ্বালাময়ী বক্তৃতার ফেনায়িত সমুদ্র উপহার দিতে পারি ।

পঙ্গু দুর্বল কাতর অনাহারী জীর্ণ শীর্ণ বুঝি না
সমবেত সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুরা
আমি আপনাদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতা, জিন্দাবাদ
এবং তুমু-উ-ল হাততালি চাই ।

আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ।

রচনাকাল: ১৯৭৯–'৮০

জা হি দ হা য় দা র

নদীতীর তাকে রাখো

কবি জেগে ছিল আগুনের রাতে,
জেগে ছিল কবি শীতে;

পুড়েছিল চোখ, দেখার পালক,
কেঁদেছিল প্রাণ একা;
গিয়েছিল কবি পায়রা নদীর কাছে ।

কবি দেখেছিল, বিরতির পায়
ঊর্মিশর্ত দ্বিধা,
আকাশে বিছানো মলিন কাঁথা শ্রাবণগগন ।

তৃষামর্মরে জেগে থাকে কবি,
নদীতীর তাকে রাখো;

চলমানগুলি সামাজিক, নাকি অবিবেক?

আমরা যারা শাখা নদী

আমরা যারা সমতলের নদী
বানভাসি রাত, ভাঙা পাড়ের মুখ;
মাছধরা দিন, নবীন বর্ষা-জল,

শীতের হাওয়ায় বীজ বপনের ঋতু

দেখতে গিয়ে হঠাৎ রেল চড়া
বিকালবেলা বানর রাখা কাঁধ,
বাস্তুখোঁজা, দলিললেখক-হাঁটা,
চৈত্রদিনে নৌকা রাখা ঘর ।

এবং বুঝি গ্রামের সাঁঝবেলা,
কুপির নেভা, হাটের থেকে ফেরা,
ভরদুপুরে চালান দেওয়া বাটি,
সমাজবিধি, ঘাট রাখার ডাক;

বদলে যাই শ্রাবণরাত্রিতে,
বদলে যাই তাঁতিপাড়ার কাছে,
কাপড় পরা বাদক তবলিয়া ।

আমরা যারা কষ্ট নিয়ে থাকি
রাত্রিদিন ধুলায় মুছি মুখ,
চলাফেরায় পাকুরপাতা-গান,
দীর্ঘ পথে তৃষ্ণা-ডোবা দিন
নিরন্তর পথিক হয়ে ঘুরি
বাস্তু-ছবি দেখি পথের পাশে,
কারণসহ বুঝি দীর্ঘশ্বাস,
নদীরেখায় বালির গান শুনি ।

শাসনে কাবু ছোট্ট শাখা নদী,
এবং ঘুম এবং উপনদী;
ছিলাম সেই ব্রহ্মপুত্রবোধ,
অববাহিকা কাঁপছি ছেঁড়া পালে ।

কোথায় যেন ঘুমায় পিছুটান,
কোথায় যেন ঘণ্টা পড়া বাকি;
উৎস তুমি দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়াও;
আমরা আজ তোমার প্রতিবেশী ।

আরও কেঁদে যাও

ইহা বিষাদের
ইহা কষ্ট,
যদি দেখা নাই
নামে রাত্রি,
ডোবে সূর্য দিনমধ্যে ।

এই শান্তি
ঝরে বেদনা,
পাতা কেঁপে ওঠে
যেন হাহাকার,
ভাঙা ঊর্মি;
আমি দাঁড়ানো
নদী ডাকে না ।

ব্যথা কল্লোল,
আমি একা স্বর ।

শোনো বেদনা,
একা কেঁদে যাও;
আরও কেঁদে যাও ।

সেই সন্ধ্যা সেই রাত্রি

প্রশ্নটি ছিল স্বার্থের,
সেই সন্ধ্যার সেই রাত্রের;
প্রবল আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণার ।

কেউ দিল না উত্তর,
চোখ থেকে নেওয়া প্রশ্ন'র;
সময় ছিল কি মন্দার?
শব্দেরা দ্যাখে হাতড়ে ।

হলো না সে-কথার বিবাহ,
দেখা হলো কেন, এ-দাহ
বলতে পারতো সহজে,
কে আর কবে ছিল ঘৃণিত?

দীর্ঘ মরুভূমি সাঁতরে
এখনো কথারা জীবিত।

উত্তর খোঁজে তৃষ্ণা,
এ-দেখা কারো চোখে বিষ না;
এ-বোধ নয় দুর্বহ যে,
চাঁদ উঠেছিল ইতিবাচকে।

প্রশ্নটি ছিল স্বার্থের,
সেই সন্ধ্যার
সেই রাত্রির।

তিষ্ঠ হও

যদি-বা চমকালে হে বিদ্যুৎ
মেঘের জঙ্গলে তিষ্ঠ হও,
যদি-না উর্বশী দৃশ্যমান
মেট্রোপলিটন অন্ধকার।

আঁধার চলে যাক অন্য নীলে,
তুমি সে-রঞ্জন প্রতিরূপের
অমিয় মুদ্রায় মল্লিকা সারাভাই নীল মঞ্চতে;

অসীম শূন্যতে তিষ্ঠ হও,
যদি-বা জাগালে হে বিদ্যুৎ।

এবার বিমোচন দাও

নির্বাচিত ঘুম ভেঙে গেল,
ও সূর্য পূর্ণতা কই?

নির্বাচিত জাগরণে দেখি,
আয়ু মাপে স্রোতের কল্লোল,
শিশিরের মধ্যে আলো;
মনে হলো, তোমাকে দেখেছি।

কখনো ভেবেছি,
সব নির্বাচন শীতের আহার,
সংহিতা পড়ে থাকে ধুলোর আশ্রমে;

কখনো জেনেছি,
কোথাও পরান আছে,
তাহা বিলাসিতা নয়।

ও চন্দ্র, এবার বিমোচন দাও।

বিদায়-গাথা

বিদায় চিত্রিত, প্রতিধ্বনিময় বোধের নির্মাতা।

পাল্লা ঝাপটায় : কই সে গৃহী কই?
গোলাপ পড়ে থাকে অসম পৈঠায়,
স্পর্শ কাঁপছে মলিন পাপড়িতে;
যত্নহীন ক্ষণ কষ্টে সংবৃত।

বৃষ্টি-ভেজা ঘরে শালিক একাকী,
মৃত প্রেমিকার না ওড়া ঢেকে রাখে পীড়িত পালকে,
আকাশ আবৃত ভেড়ার পশমে।

বিদায় চোখ তুলে দেখছে তাজা ঘাস,
ঊর্মি কাহিনী পড়ছে ভাঙা পাড়,
পাতারা ঝরে পড়ে বিনয়মাত্রায়।

ট্রেন ধরবো না আজকে সন্ধ্যায়।

বাবা মুস্তাফা, সেলাই করেছিলে মানুষের শরীর

১.
তোমাকে খুঁজছি আমি,
পা দুটো ভীষণ ক্লান্ত, ক্ষয়ে গেছে শিরা-উপশিরা;
অনেক বালির পথ, জীবিত নদী আর সবুজের চড়াই-উৎরাই
আমার পায়ের চিহ্নে ক্ষতবিক্ষত,
যে-কোনো মুহূর্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে স্বপ্ন আমার,
স্বপ্ন-রক্তে ভিজে যাবে শস্যক্ষেত, আকাশ, শিশুর চোখ;
হে মুস্তাফা, তার আগে তোমাকে আমার চাই,
জমে গেছে জলপাইপাতা
আর ভালোবাসার জন্যে জরুরি সেলাই।

২.
যেন আমি মানুষের চেহারার মতন কোনো প্রাণী,
অবাক হয়ে তাকাচ্ছ কেন?
আমি বলছি মানুষের ভাষা;
এসেছি দক্ষিণ এশিয়ার গরিবতম এক দেশ থেকে,
এই যে বাড়াচ্ছি হাত– বোঝো তুমি হাতের আগ্রহ;
এই যে বিষণ্ন চোখ– জানো তুমি কোথায় বর্ষণ;
এই যে হাসছে না মুখ– উজ্জ্বল ক্রন্দন;
তুমি কি বুঝতে পারছো না আমার ব্যথার উচ্চারণ?
মনুষ্য-ভাষায় তোমার কি কৌতূহল নেই?

এ কেমন কাল এলো,
যার প্রতিনিধির অনুরোধে পূর্বপুরুষ নির্বাক!

৩.
না, তোমার চোখ আমি বাঁধবো না;
বলবো না, গোপনে আমার সাথে চলো,
আমি চাই খোলা চোখ,
দিবালোকে হোক প্রকাশ্য যাত্রা তোমার;
কারো লুণ্ঠিত হীরে আর স্বর্ণমুকুট চুরি করতে যেয়ে

হয়নি খুন আমার ভাই ডাকাতের হাতে;
হাজার খণ্ডে টুকরো আজ মানুষের বাঁচবার দেহ ।

৪.
যতদূর যাচ্ছে মানুষের পথ,
মানুষ ভুলে যাচ্ছে সংহতির মুখ;
পাশাপাশি সময় যাপন করে,
প্রশ্ন তোলে : তুমি কে?
হে মুস্তাফা, মানবিক ভাষারা অচেনা,
জাতিসংঘ এখন বাবেল নগর ।

৫.
অস্বীকার করছি না,
আমরাই ভেঙেছি সকল মৈত্রীমমতা;
এই আকাশ এখন সেনানায়কের আর বণিকের,
এই সমুদ্র নয় আর শঙ্খচিলের, বরং যুদ্ধজাহাজের;
পান্থ-পাখি মৃত পড়ে আছে নদীতীরে,
একটি শাদা গতি ঘুমিয়ে পড়েছে ।

নদী মরে : মানুষ বদলায় ।

৬.
আমরা অনেক নিয়ম গড়েছি
পাশাপাশি চলতে আমাদের;
তুমি নও বধির, অন্ধ নও তুমি;
কেন তুমি স্থবির, তুমি কি নও আমার আশার বাহক?
নাকি মানুষের নিয়মের চলা আর কথা বলা
শুধু শূন্যতার জাল আর আঁধারের স্রোত?

৭.
আসবার পথে ছিল না কোনো ছায়া,
প্রকৃতির শুভার্থীরা বিলুপ্তির পথে;
শীতের হাওয়া আর মরুপ্রবণতা ছিল সঙ্গী আমার;
তোমাকে এখন ঘাসের মাথায়
দেখাতে পারবো না প্রজাপতির মাঙ্গলিক বিভা;
তবে দেখাবো তোমাকে, কার্তুজের বিজ্ঞাপন পিঠে

বহুজাতিক ঘোড়াগুলোর কুচকাওয়াজে যাওয়া ।

৮.
আমার পিঠের 'পরে নাম না জানা কবরের ঘাস,
মাথার উপর বীজ মরা ফল;
আমি জানি না, জানে না হাজার ঘড়ির সময়
তুমি কতদিন নেবে, কত প্রহর ডেকে যাবে পাখি,
উদয়ের ঝরনাগুলো কত রাত্রি ধুয়ে দেবে
করতে সেলাই ছিঁড়ে যাওয়া আমার স্বপনগুলোকে ।

৯.
আমাদের পড়ে না মনে,
কেমন অবয়ব প্রেমের;

আমাদের মনে পড়ে,
আমরা দেখিনি তার চোখ;
কেবল দেখেছি মাথাহীন মূর্তি তার,
ভাঙা বাহু পাথর-শরীরে,
কেবল দেখেছি ভাঙা স্তনে শিল্পিত আঁধার ।

১০.
আমরা কখনো ছিলাম না ব'সে,
উদয়াস্ত শ্রমিকতা করে, যেন দাস,
কেবল করেছি জড়ো
ছিটকে পড়া লাল-কালো কুঁচফলের মতো
হারানো অহিংসতা ।

তুমি প্রস্তুত হও,
পরে নাও আঙুলে রুপোর ঠুলি;
জীবনের বস্ত্রে চাই বৃষ্টির সুতো,
চৌচির শেকড়গুলো যেন পায় জলের মিত্রতা;
তুমি সখা হতে পারো আগামীদিনের
সেইসব মানুষের
যারা উড়ন্ত কার্পাসে দ্যাখে জামার পূর্ণতা ।

১১.

তুমি জানো,
মানুষ নিজেকে শুধু ভবিষ্যৎ শেখায়
আর পথে পথে হাঁটে,
হাতগুলো ক্ষয়ে যায় স্বপ্ন বুনে বুনে;
চোখের গহ্বরে রাখে সূর্যোদয় ।

১২.
চলে যাবার সারল্য বাধা পাক
সে আমার কাম্য নয়,
ফিরে আসার সারল্যে কিছু হোক
সে আমার কাম্য নয়;
দৃশ্য দুটি পূর্ণ হোক সহজ দৃশ্যে ।

বাবা মুস্তাফা, আমার সাথে চলো ।

আ শি র দ শ ক

জু য়ে ল মা জ হা র

চন্দ্রজাল-১

আলস্যে উপুড় হ'য়ে মেদালস ঘড়ি শুয়েছিল

সেই ফাঁকে ঘড়ির তিনটি কাঁটা

চুপিচুপি উড়াল দিয়েছে

নেতানো শরীর মেলে ডানাহীন ঘড়ি শুয়ে আছে

ডায়ালে ছড়ানো একা, জবুথবু এলানো সময়
নিথর ঘড়ির চোখ একটি অনড় কাচপোকা

এই দৃশ্যে আমোদিত পাতালের বেশ্যাদের দল
খদ্দের বিদেয় ক'রে আলটপকা ঘুমিয়ে পড়েছে

ব্রহ্মাণ্ড-বৃক্ষের ডালে ঝুলে আছে দীর্ঘলাস্য ঘুম

এইভাবে কয়েক শতক গেছে। তারও বহু পরে
চরাচরে জেগে ওঠে চতুর্মুখি তরঙ্গের দোলা
স্বর্গ থেকে নেমে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ডম্বরু, ঢোলক
সেই শব্দে ঘড়ির ভেঙেছে ঘুম;

ইতিমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পিছিয়ে গেছে কয়েক শতক

–ঘড়ি তা জানে না।

ঘড়ির তিনটি কাঁটা এসে ফের ঘড়িতে বসেছে।

চন্দ্রজাল-২

সহসা ভেঙেছে ঘুম পিরিচের মতো খান খান

একা ঘরে বসে আছি চাঁদে-পাওয়া স্তব্ধ, বিমূঢ়;

দু'চোখে ঢুলছে ঘুম, ঘুমের রেশম

শিথানে পৈথানে প্রেতস্বর

কালো-লোম ভালুকের ডাক

বত্রিশ দাঁতের পাটি খুলে হাসে একশো করোটি

আমুণ্ডু ভয়ের সাপ লোল জিভে চাটছে আমাকে

দুই হাতে শিশ্ন ঢেকে বসে থাকি মাটিতে উপুড়
একমাথা কালো চুলে অযুত ভয়ের হুল নিমেষে গজালো

হা-কপাট দরজা দিয়ে পালালো বাতাস
শ্রবণে চাঁদের বাঁশি, কালো-লোম ভালুকের ডাক

মাথার ভেতরে ঝিম, অজস্র সর্ষের ফুল মগজ-কোঠায়

সহসা দাঁড়িয়ে গেছি ঘরময় ছড়িয়ে শেকড়
এইবার জানালা-কপাট গ'লে এক লাফে বাইরে এলাম

গোগ্রাসে গিলে খাচ্ছি চাঁদের সুরুয়া
ললিতাভ চন্দ্রমাছ উঠে এলো আঙুলে জালে

ট্রাটোস্ফিয়ার ছেড়ে উড়ে যাচ্ছে ধ্রুপদ বেলুন
আমার শরীরে সাপ, কূটজাল, ভয়ের করাত!

মেরুন রাতের ডায়েরি

তোমাকে খুঁজতে এসে ঝরনার কিনারে গিয়ে দেখি
সমস্ত জঙ্গল ঘিরে ঠুসকে পড়ছে কালো রাত

সাঁকো নেই, চতুর্দিকে নদী

জলের ডানার নিচে ওঁৎপাতা হাঙ্গর, কুমির
তদুপরি ভয়! মাংসলোভী কাফ্রিদল
ছুরি আর অজস্র মুষল নিয়ে ঘোরে

তবু আমি তোমাকে দেখার লোভে
সকল গাছের দৈর্ঘ্য মেপে মেপে উপরে উঠেছি;
চাক্ষুষ প্রমাণহীন সেই ছবি জ্বলবার আগে গেছে নিভে

তবু আলট্রা মেরুন রাতে
একটি ইঁদারা তার সাক্ষ্যে টলোমল

হে গরুড়, ক্ষিপ্র ওজনহীন ডানা
তোমার স্ফটিকজলে শুয়ে আমি দেখবো আকাশ
অবসরে কনুইবন্ধের নিচে
মদেচুর লাটাই নাচাবো ।

মধুব্রজনের জ্যামিতি

মধুবসন্তে আমরা রওয়ানা হলাম

উৎপ্রেক্ষার বাড়ির দিকে

পথে উপমার গিরিখাতে এসে

তুষারে আটকে গেল আমাদের গো-শকট

আর চলমান পায়ের মর্মর

আহা! এখানে অনুপ্রাসের মতো বয়ে গেছে পর্বতচূড়া

এখানেও উপমার আক্রমণ

ব্যাজস্তুতির বাঘ নেচে বেড়াচ্ছে নৃশংস অরণ্যপথে

আর এই আপাত সরোবর

সে তো স্বপ্নহননের শীতল চাকুতে ভরা

বরফ গলার প্রতীক্ষায় আমাদের মদ শেষ

অপচয়িত সকল যবদানা

শুধু হাওয়া এসে বলে যায়: অপেক্ষা ভালো

রানি আসবে তার উচ্ছ্রিত ঘোড়ার বাহনে চড়ে!

জানি না কী করে পেরোতে হয় কেওক্রাডংয়ের পথ

–ডানায়, জেব্রার পায়ে, নাকি উড়ে?

শুধু আধোঘুমের ভেতর গতায়াত করছে

চিত্রকল্পের পাখি আর টুসুগানের সুর

কেবলি ঢুলছি আর হাই তুলছি

রক্ত-সরোবরের জলে কেউ শানাচ্ছে শীতল চাকু

–কেউ আঁকছে জ্যামিতি!

রাত্রি ও বাঘিনী

বাঘিনী আমারে শুধু ডেকে চলে ভরা পূর্ণিমায়
বারবার কাতর মিনতি করে আমি তারে বলি:
দয়া করো, আমায় খেয়ো না, আমি অসহায় অতি ছোট জীব

বাঘিনী করুণা করে, আমাকে থাবায় পুরে কী ভেবে
ঘুমিয়ে পড়ে– এ-সুযোগে আমি তার মুঠো গ'লে নামি

বুকে হেঁটে-হেঁটে তার গর্জনের সীমানা পেরোই
সন্তর্পণে ঢুকি পড়ি বনপ্রান্তে, পরিত্যক্ত ঘুমের গুহায়

ভাবি, বাঁচা গেল! ভাবি, আমাকে পাবে না আর তার
দাঁত নখ, অত্যধিক প্রেমের আঁচড়–
অবশেষে এ-গর্ভগৃহের ছায়ায় বসে আমি নিরাপদ!

থ্যাঁতলানো অণ্ড-শিশ্ন, কালশিটে উরু ও জঘন আর
এই দুটি রক্তমাখা ঠোঁটে বিশল্যকরণী ঘষে ফিরে পাবো
অনাঘ্রাত আমাকে আবার–

আমাকে পাবে না আর বাঘিনীর অতিরিক্ত রতি-আক্রমণ!

কিন্তু হায়, প্রতিবারই স্বপ্নে বাঘিনী তবু পিছু নেয়
তীব্র চোখে ফসফরাস জ্বেলে এক লাফে সীমান্তের নদীটি পেরিয়ে
অতর্কিতে সামনে আসে; ভয়ানক দু'পায়ে দাঁড়ায়, আর
দু'বাহু বাড়িয়ে তার আমাকে সে কোলে তুলে নেয়
ধীরে ধীরে চুমু খায়, ঠোঁটে ও গলায় তার দাঁত-নখ গেঁথে রক্ত চাটে
বেপরোয়া জ্বালামুখে আমাকে পুড়িয়ে শুধু কাবাব বানায়

শেষ রাতে মাতাল চাঁদের নিচে অ্যাম্বুলেন্স এসে
আমাকে উদ্ধার করে দ্রুত কোনো হাসপাতালে ছোটে

কৌতূহলে সূর্য এসে মুচকি হেসে জানালায় উঁকি মেরে যায়!

অভিজ্ঞান

১.
চোখ দুটো দেখাও আমাকে– আমি
রাত্রির বাতাস, ঘ্রাণ
তবেই-না বয়ে নিয়ে আসি

২.
কোথায় আশ্চর্য মেঘ?
কোথা গেলে ভিনদেশি? আমি যে কাতর
তোমার বাড়ির পাশে দুপুরে কোকিল হয়ে

বসন্তে গোপনে এসে ডাকি

ব দ রু ল হা য় দা র

কবি ও আধিপত্য

১.
কবি সময়ের অন্তর্ঘাত জানে
তাকে কেন শূন্য হতে বলো
সে তো অফুরন্ত অনিদ্রার ভ্রূণে
চুপ হয়ে থাকা একটি অখণ্ড ।

বোবা বাতাসের আ–শরীরে মিশে থাকা
বেদনার সবুজ স্বদেশ
ভাষার রক্তকে ছুঁয়ে সে-ও
যুদ্ধ ও যুদ্ধবিরতিতে
অসংখ্য তারকার বুকে দোল খাওয়া
বিনাশের শেষ থেকে শুরু ।

তাকে আ–শূন্যের গান গেয়ে
প্রলোভনে চুপ করে রেখে
ভুলের আকাশে তুমি উড়ে বেড়াও স্ব-বেগে
আর আমি যতবারই উড়েছি
জন্ম ও মৃত্যুর বিভাজন আমাকে নির্মাণ
করেছে একটি পূর্ণ আধিপত্যের ।

২.
কবি প্রতারক নয় বলে কবিতাও সত্য হয় ।

আত্মার প্রাসাদ ক্যু

আত্মা সবেমাত্র লিপ্ত হয়েছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে ।

আনন্দের মতো কতগুলো ঘৃণা আর
কঠিন মৌনতা ঘিরে আমি
হৃদয় অরণ্যে ফোটালাম গ্রেনেডের ফুল
তুমি বিস্ফোরিত হয়েছিলে তখন আত্মায় ।

অবিশ্বাসী ষাঁড়ের শিঙে তুমি দুলেছিলে
অনুবীজের রহস্যে । সাতটি দুঃখ আর
আটটি আনন্দে নিরাশায় মেতে ছিলো
মানুষ তোমাকে ঘিরে ।

জলপ্রপাতের ঢেউ থেকে মালভূমি এমনকি
নিষেধের অবাধ্যতায় আমিও সংজ্ঞাবিহীন
সমুদ্রের আরাধনা শুনে বুঝে নিই
হিসাবের কোলাহল ।

ঢেউ খেলে ঢেউয়ের শরীরে । আমিও
মধুর ঈর্ষাকে ঢেলে তৈরি করি
আত্মার মিলন জলে রঙের প্রভেদ
তুমি হয়ে ওঠো মেঘনা আর আমি পদ্মা ।

অজ্ঞতাকে ঘিরে গোপনে চলতে থাকে প্রাসাদ ক্যু ।

ভোগবিলাসের ইন্দ্রজাল ছিঁড়ে ফেলে আমি
ভাঙা ম্যান্ড্রেক্সের চাঁদে শুয়ে থাকি । আর
সীমাহীন আত্মার পরিধি জুড়ে কেঁপে ওঠে
ভালোবাসার পৃথিবী ।

তুমি আমাতে অবাধ্য হও আমিও তোমাতে

তিলমাত্র শব্দ হলে পরিকল্পনার বারোটা বেজে যাবে ।
ঘুমিও না । আলো জ্বালিয়ে আমরা বসে থাকবো কৌশলে ।

যখনই প্রয়োজন হবে ব্যবহার করবো হৃদয় পিস্তলটি ।
আমি বিছানার এক পাশে আর তুমি বসবে ওপাশে ।
ঈশ্বর চেয়ারে বসে আছে । আমরা আলোতে বসে থাকলাম ।
আত্মাগুলি বের করে রাখলাম টেবিলের এক কোণে ।

ফিসফিস শব্দ করলো কথারা । স্নেহধন্য
বিচিত্র পেশার জানোয়ার ছিলো কথাগুলি ।

আমাদের দুই জোড়া চোখ ভেন্টিলেটারের
ফাঁক দিয়ে আলো দেখে । আমরা একটি
রেললাইনের সমান্তরাল মাত্রাকে খুঁজে বের করলাম ।
অনুসরণের দৃষ্টি আর ইঙ্গিত শলাকা রাখলাম
টেবিলের এক কোণে । তার সাথে একবাক্স দেশলাই
আর মোমবাতি ।

তারপর বাতিটা নিভিয়ে দেয়া হলো
আমরা দু'জন অন্ধকারে বসে থাকলাম ।

প্রিয় বন্ধুগণ কোনো কিছুর জন্যই এ সুযোগ হারাতে চাই না
তুমি আমাতে অবাধ্য হও আর আমিও তোমাতে ।

বনসাইয়ের কান্না

ভারী অগভীর বুটের গলায়
শ্বাস-প্রশ্বাসেরা তেমন খেলে না ।

শিল্পীমন প্রায়শই ঘুরে বেড়ায় বিষণ্নতায়
আর মানুষেরা হয়ে ওঠে
অলৌকিক বিষণ্নতা ঘিরে দেবশিশু ।

অম্লান মহান আহ্বান এক

জাগতিক মহাবিশ্বে ব্ল্যাক হোলে
অবিরাম নিঃশেষ
আকারের পরিমাপে আর্তি হয়
বেদনার বাঘ ।

গভীর গোপন থেকে তুলে আনি হীরে
জ্যামিতিক নকশার বেপরোয়া
বুনিয়াদি সন্ত্রাসের অমিল পোর্ট্রেট ছিঁড়ে ফেলে
আমি তুলে আনি মানুষের বনসাই ।

বাধ্যতামূলক ছাঁটাই করানো স্মৃতিগুলি
আশাতীত সফল অনুসন্ধানে সংস্কার করি
ভবিষ্যতের চোখ ।

দিলকুশা তুমি
বাণিজ্য নারীর মতো উদাস দাঁড়িয়ে থাকো
আমি সমুদ্রের শিহরণ ভুলে
সাফল্যের শিখরে আরোহণে মত্ত থাকি ।

যুদ্ধ মানেই আলাদা হৃদরোগ

পৃথিবীর চোখ আঁকতে আঁকতে রাত
কাটিয়ে দিলাম স্বপ্নে ।
ভেজা চোখ বাল্বের হৃদয়কোণে
আগুনের প্রেম খেলে আর দিন
মৃত্যুর কপালে চুমু খেয়ে কামের আরতি ।

বোধের আলাদা ঘ্রাণ থেকে
রাত অপ্সরার হাসি-কান্না
নীরব কামনা দিয়ে ভেবেছিলো
সনাতন জাতিস্বরে পৃথিবীর ভূ-ভাগেই
আমিও তোমার অভিন্ন স্বভাব ।

যুদ্ধ মানেই আলাদা হৃদরোগ ।

আমিও আমার ভেতরের অপরূপ দেখে
নিদ্রার জানালা খুলে আমৃত্যুর পাঠ ঘরে প্রেমের গড়াই ।
সুখতারা বেদনার অবকাশে লাভ সিটি
ভালোবাসা ক্রয় করে নকল নগরী গড়ে নিরিবিলি ।
রাত চোখ পৃথিবীর বানানো ভাষায়
জীবনের কথা বলে ।

লাভ পয়েন্ট

মগজের ই-মেইলে ভালোবাসা
পাঠিয়ে দিয়েছি মহাশূন্যে ।
সিটি হার্ট তোমাকে নিলামে কিনে
পৃথিবীর প্রেমিকেরা গড়েছে ফ্রি-পোর্ট ।

তুমি আন্দামান নিকোবরে
প্রাগৈতিহাসিক অভিশাপ থেকে
ফোটাও বহুজাতিক পাষাণের ফুল ।
একটেল আবেগের বিপরীতে
ধ্রুবতারা চোখ মেলে
প্রহসনে কান পেতে শোন ভুল
আনন্দের ঝরনায় ডুবিয়ে রাখো হাসি ।

প্রিয় মানুষের ঘুম কেড়ে নিলে
জীবনের বিবরণে হৃদয়ে পাষাণ নাচে ।
সিটি ক্যাব তোমার মিটার প্রেমে
ভালোবাসারা বাতাসে ঘর বাঁধে ।

লাভ সিটি প্রিয় মানববাগান
তোমার প্রেমের ফুলে
আশারা আগাম লিখে জীবনের গান ।

ভাগ্যকুল উপকূলে

তোমার চরম নাটকীয়তার স্বভাবে
আলাদা স্বরূপ চিনে আমি
গোল অধিবেশনে তোমাকে
পাল্টানো প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি করি প্রতিদিন ।

পে-স্কেলের অতৃপ্ত ক্ষুধার গোঁজামিলে
নিন্দুকের পালাবদলের অদৃশ্য আহাজারি
সমনজারির নানা ডিক্রিদারে
তোমার বহতা মনে ঝড় তোলে ।

রত্ন বিধানের আয়োজনে
বাঙালির কাজল কাননে
হোগলার চরে জীবনের নৌকা বাঁধি ।

তোমার সমুদ্র বুদবুদ রসায়নে
অচিন প্লাবনে সোনাঝরা রোদ মাখে ।

স্বপনেরা ঢেউ খেলে উথাল পাতালে ।

বেদনারা বেড়ে ওঠে প্রেমভুলে
ভাগ্যকুল উপকূলে উজান-ভাটার টানে
তুমি নদী আমি নিরবধি ডাকাতিয়া
পদ্মা মেঘনা গোমতি ।

হৃদয়ঘটিত অনুরাগ

ভালোবাসার আদরে ও সমাদরে মিশে
সরষেবাটার সংসারে তুমি অভিসারে
প্রযুক্তির ব্যাপকতাকে মুখস্থ করো ।

আশা-নিরাশার নিত্যচালে খেলে যাই
পাশা খেলা । সমূলে দু'কূলে হেলে দুলে
বাঁশি বাজাই আপন সুরে ।

তুমি ঘুরে ফিরে বাতাসের বিয়েবাড়ি
পাড়ি দিয়ে মহাশূন্যে মিশে যাও ।

ভোলানাথ দেওয়ানায় আমিও অবমাননায়
তোমাদের শাস্ত্রজ্ঞানে রক্ষিত হৃদয়-বাক্সে
জমা রাখি প্রেম ।

হরিয়ানা কুঞ্জের দিলে তুমি অন্ত্যমিলে
হৃদয়ের বাণিজ্যিক মতিঝিলে
দলিলে লিখিত করো প্রেম ।

নিবিড় নিয়মে আমি উজানের ঢেউ খেলে
এলোমেলো হাওয়ার চলাচলে
হৃদয়ঘটিত অনুরাগ বুকে রাখি ।

সিটি লাইফ

তোমাকে আলাদা করে বিশেষণ দিলে
তুমি সুখে থাকো । আর
নগরে স্বাধীন বাংলার স্মৃতিটুকু
নিরাপত্তা সেজেছে যাদুঘরে ।

ধারণার সম্প্রসারণ তোমার
বাড়তি স্বভাবটুকু নগ্নতার কোলাহলে
জনমনে বাধাহীন গতির দূষণ ।

মহল রচিত হয় সন্ত্রাসের প্রেম বলিদানে ।
আমি পৃথিবীর প্রচলিত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে
বিরোধী অযোদ্ধা গড়ি উন্মুক্ত বাজারে ।

মনে ও মাফিয়া প্রতিদিন রাত
রঙিন নেশার টোপ গিলে
হৃদয়ের কেবিনেটে প্রেম খেলে
ঢেকে রাখে স্বাধীনতা, মহৎ সম্মান ।

আশার ঋতুতে শুধু সময় বদলে যায় ।
ধারণার সবিনয়ে মহাপাপ নামে
সবুজ ভূমিতে । অগোছালো প্রেমের ক্যাসেটে
বেজে উঠে আগামীর গান ।

আত্ম দার্শনিক

আমি ফুল কিংবা প্রিয়ার মুখ দেখে
তোমাকে ভালোবাসিনি ।

জোয়ার সাহারা বুকে তোমার উত্তরা
হাওয়ার দখলে নকলে মূল্যবোধে
বিবিধ কবির মনে সময়ের শত অভিধান ।

স্বপ্ন হারানোর ভয়ে প্রতিরাতে
ঘর বিড়ালের মনের ইঁদুরে আমি
বেঁধে রাখি রাত ঘুম ।

প্রভাতের অধিবেশনে তোমার
বৃক্ষমায়া জুড়ে ক্রমাগত অতিথিরা বুনে
পাইকারি ও খুচরা বুনিয়াদি ।

আঁধারেরা বাড়তে থাকলে প্রহরী বাঁশির সুরে
দূর অশেষের গতিপথ ধরে
বেসুরে অচেনা দিন বলী হয় আপোস নগরে ।

হৃদয়ের দুঃখগুলোকে আত্মা থেকে
খুলে নিলে বাসনার হৃদভূমি জ্বেলে দিলে
জোনাকিরা কান্না ভুলে হয় স্বপ্নতারা ।

আকাশের বাসরে আসন পেতে ছিলে বলে
মনের বাসনাগুলো প্রতিবেশী চোখে
অধিক স্বীকৃতি মুছে উড়াল বাতাসে রেখাটানে ।

ন ব্ব ই য়ে র দ শ ক

র ও শ ন ঝু নু

অন্ধকারে অন্য আলো

মুঠোর মধ্যে চাঁদ নিতে নিতে চন্দ্রমাতাল যে বৃক্ষ
সুনিবিড় জ্যোৎস্না লুকিয়ে ঢুকে পড়ে মধুবনে,
মগ্ন সে দ্রাক্ষাদেহ মিশে যায় লতায়-পাতায়
ঘন রস মুগ্ধ অন্ধকারে...

গভীর ঘাসের বুক পেতে শুয়ে থাকে মোহন যে মাঠ, তার
কানে বার্তা পাঠায় শিশিরের গোপন কপাট, হৈমন্তী রাতে!
দানাভরা শস্যবুক; সারা দিন তীব্র সূর্যালোক ক্লান্ত করে তাকে!
নিবিড় কুয়াশা ভেজা রাতের আকাশ, অকুণ্ঠ উপুড় হলে
কমলালেবুর ঘ্রাণ ছোটে নক্ষত্রের দিকে!
ধীরে ধীরে নক্ষত্রদেহে ফুটে ওঠে প্রজাপতি-পাখা!
স্বভাবে উড়তে মানা, তবু সে উড়ে ওঠে অন্য অন্ধকারে,
বন্য আলো অঝোর অরণ্য স্বাদে...

দিবসবিমুখ জোনাকিরা আপন আলোর ঋণ শোধ করে
অন্ধকারে, দ্বিগুণ আগুন জ্বেলে;
তার চে' অধিক অগ্নিবলয়, অদেখা উত্তাপ
আড়াল করে প্রেমিক হৃদয়...

প্রপাতিত জল বয়ে চলে নিরিবিলি স্বচ্ছ ঝরনাধারা;
সুশীতল নদী গিরি-মাটির আয়না
টলমল মুখ দ্যাখে উদ্ভাসিত নিজের আদলে!
বন্য জল অতল স্পর্শে, পাথরও ভুলে থাকে অগ্নিসম্ভাবনা...
চারু চাঁদ কখনো নামে না জলে, সমুজ্জ্বল ছায়া শুধু ফেলে!
চন্দ্রমাতালেরা খেলা করে ছায়াটুকু নিয়ে...

জলঘর

বারো মাস ডুবে থাকি জলের ভেতর,
বারো মাস ভেসে বেড়াই বেদনা-মাছ...
বর্ষার নতুন জল, খলখল আলোড়ন ওঠে নতুন জন্মের;
পুরাতন আমারই জলে জন্ম নেয় প্রতিনিয়ত
মাছের পোনার মতো নতুন বেদনা!
অদৃশ্য অথই জলে হাবুডুবু বালিশ বিছানা,
বিলীয়মান ভাঙন মুছে নেয় নদীর সীমানা;
কূল থেকে কেড়ে নেয় মাটির শেকড়, বিরান পাথারে
সন্তাপ সাঁতার কাটি দিনভর রাতভর অকূল আঁধারে...

ভেজা কাঁথা জড়িয়ে ভোরের অপেক্ষায় হিম হতে হতে
ক্লান্ত অশ্রু শুকিয়ে যাবার পর, অবসরমতো ভোর এলে
আলো আর সইতে পারে না অবসন্ন চোখ;
নির্ঘুম অসুখ নিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকি চুপ, উপুড় আড়ালে!
দুপুর গড়ালে, বিগলিত বিকেলের ছায়া এসে বিপন্ন বিষাদে বলে,
অঝোর বৃষ্টির ভেতর পাখিও ভেজে পাতার আড়ালে;
চোখ মেলে চেয়ে দেখি মুহূর্ত মলিন
বিষণ্ন পালক বেয়ে পড়ে জল, ব্যথা ঝুরঝুর
কদমও ভেজে অসহায়,
নিজের নরম দেহে মিশে যায়, নিজেরই অঙ্গ
কোমলতা অবিরাম...

আকাশের কান্না দেখে সূর্যালোকও পারে না কাটাতে মলিনতা,
মেঘেদের দুঃখভারে থেমে যায় প্রাকৃতিক সব চঞ্চলতা;
শুধু আমারই ঘরে থামে না দীর্ঘশ্বাসের আনাগোনা,

ঝড়ের পদচারণা...

কোমল কদম, পাতা ও পাখির মতো, অবিরত
আমিও অনড় ভিজি নিরিবিলি একা, শুধু আমারই নির্বাসন
নির্মম প্লাবন, নিমজ্জিত জলঘরে ডুবে থাকা...
আমার আকাশে বারো মাস ঋতুদণ্ড
আষাঢ়ের নাম লিখে দিয়ে গেছো তুমি;
মানুষ ভাবোনি কখনো আমাকে...
অমোঘ আষাঢ় যদি প্রকৃতির অংশ হয়
তবু এই অমানুষ-অশ্রুজলধারা গলাতে পারেনি তোমার হৃদয়!
তবু কোনো অবসরে, আমারই কণ্ঠস্বরে, পুরনো দিনের কোনো গান
পড়ে না তোমার মনে...
আমাকে ভুলেছো একেবারে! প্রিয় নাম ধরে ডেকে
একবার দাঁড়ালে না এসে এই জলঘর আঙিনাতে...

ঘুড়িসুতা

মলিন নেমেছে সন্ধ্যা, বিরহ নিশ্চুপ;
নিবিড় নিশ্বাসে কেঁপে ওঠে বুক!
মনে পড়ে মায়ের মমতামাখা মুখ
মনে পড়ে মৌন ধুলামাখা দেহ, শাসন শৈশব...

মধুময় স্মৃতি কখনো মধুর নয়
তবু ফিরে যেতে হয় নিঃসঙ্গ বলয়ে ।
আমিও মুহূর্তে ফিরি ফ্লাশব্যাক ফ্রেমে
উদার আকাশ, খোলা মাঠ-প্রেমে;
কানামাছি গোল্লাছুট, বালু-সংসার, বউচি
মায়ামাখা সব খেলা ছিলো সত্যির মতোই সত্যি, তা মেনেছি
অথচ জেনেছি আজ জীবনধর্মই ঠিক তার বিপরীত
আজ চেয়ে দেখি এই খেলাঘর, খেলারও অধিক নড়বড়
আজ চেয়ে দেখি জীবনের সাথি খেলার সাথির চে'ও পর!

আজ এই অবেলার একাকী সন্ধ্যায়
কেবলই ভুল হয়ে যায়
ব্যস্ত ধুলা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াই

দ্রুত বলি, বন্ধু যাই
শব্দের শূন্যতা হেসে ওঠে প্রতিধ্বনিময়
চমকে তাকাই চারপাশে
কেউ নেই কোনোখানে, ছায়া শুধু নড়ে, নিজের;
আজব অচেনা ছায়া নিজেরই কাঁধে হাত রেখে বলে,
বসো। কেউ নেই অপেক্ষায়, শাসনের আড়ালে
আঁচলে আদর গিঁট দিয়ে
জোনাকিদের বাতিমেলা শুরুর প্রাক্কালে
হারিকেন হাতে কেউ খোঁজে না তোমায়
তবু এমন অস্থির কেন ডাকের আশায়!

হায় হাহাকার, হায়রে বিরান ভূমি, একলা আসর
আমি কি চেয়েছি কখনো সোনার মোহর!
আমি তো চেয়েছি কেউ গুনুক প্রহর
শুধু স্নেহছায়া মায়াবী নিবিড় ঘর...

শুধু মনে হয় মায়ের মতন ভালোবাসা নিয়ে
কে যেন তুমুল দাঁড়িয়ে থাকে
কে যেন আমার শিশুমুখ মুছে দিতে আদর-আঁচলে ডাকে

প্রিয় কত কী এসেছি ফেলে কোথায় কে জানে
ঘুড়িসুতা অদেখা নাটাই সেইদিকে শুধু টানে
কোন সে গৃহের তৃষ্ণা আমাকে ফেরায় পথে পথে
গৃহ থেকে গৃহান্তরে...

আয়নার ভেতর নিবিড় দুঃখ

মমতা মাতাল বেসামাল নেশা, নিমজ্জ অসুখ
নিয়ে যায় আমারে আজব অন্ধকারে
পাঁজরের হাড়ে পরত পরত ভুল মাটি খুঁড়ে
হামাগুড়ি পথ ঘুরে, ফিরে আসি এ শ্মশান-ঘরে!

মুহূর্তে মোমের আলো যায় নিভে বিষাদ বাতাসে
জ্বলে ওঠে অলীক ওমের গুপ্ত আশা,
অসীম পিপাসা পুড়ে খাক হয় করুণ বিলাপে

কেটে যায় গভীর ঘুমের সুপ্ত নেশা!

একা জেগে থেকে মুখস্থ নির্ভুল ধারাপাত পাঠে
অমিল শূন্যের পিঠে বাড়ে শূন্য ঘর
প্রার্থনার তালিকায় শুধু অবহেলা, কাঁটা চিহ্ন
তামাশা-পুতুল খেলা করে রাতভর!

ভোরের আবছা আলো আনে সুখবার্তা অনাবিল
নিমগ্ন পাখির সুর, প্রাণ জাগে গানে,
অথচ, আমার আয়নার ভেতর নিবিড় দুঃখ
খেলা করে অচেনা অদ্ভুত মায়াটানে...

নিরিবিলি জলোচ্ছ্বাস

সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা তবু সময় মেপে চলে,
ঘূর্ণিঝড় ঘটে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে...
সম্প্রসারিত সর্বনাশ ফেনায়িত কাদাজল
চলে যায় ঘরে ঘরে...
বেদনার ভাগাভাগি, গলাগলি বিলাপের রোল ওঠে
কূল-উপকূলজুড়ে
সূক্ষ্ম সুখের হাওয়া এসে লাগে ত্রাণকর্মীর চুলে...

অথচ এদিকে সামান্য নদীও নই আমি,
জলের রেখার মতো চিকন চিহ্নমাত্র
নিরিবিলি পড়ে থাকি একা, অযত্নে ফেলে রাখা
শীর্ণ সুতার মতো;
তবু এখানে অদেখা জলোচ্ছ্বাস প্রতিনিয়ত
অথই ভাসান, ভাঙচুর, নিঃশব্দ প্লাবন ও প্রার্থনা

কোনো দুঃখই আমার মতো এতটা একা না...

জলস্পর্শে গলে পড়ে জলের দানা

উচ্ছল আড্ডার ভেতর হাসির কাঁধ ছুঁয়ে
নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে যে কান্না,
তাকে ডেকে পাশে বসাতে পারি না!
তবু সে করুণ দৃষ্টি নিয়ে অপলক চেয়ে থাকে
নির্লিপ্ত বেদনার গোপন কৌটোর দিকে!
জলের তুফান তুলে এখনই সে দেখিয়ে দিতে পারে
মানুষের ভেতরের ঝড়
কালবোশেখির চেয়েও কতটা ভয়ংকর,
তবু সে দেখায় না কিছুই!
তবু সে জলের বুকে নির্মোকে নির্মোকে
চাপা দিয়ে রাখে দানা বাঁধা আশ্চর্য পাথর!

অসম্ভব নিয়ন্ত্রণে মেঘলা মানুষ
নির্জনে একলা শোনে পাঁজর ভাঙার গান!
তাকে আমি রেখে আসি তালাবদ্ধ ঘরে
বালিশের কোণে, তবু সে পা গুনে গুনে
দুঃখ বোনে আমার পায়ের চারপাশে!

আমার তো ছায়া পড়ে না কোথাও
শুধু মায়া পড়ে থাকে এখানে-ওখানে
রোদ-চিকচিক ভাঙা আয়নার টুকরোর মতো...

সামান্য দ্বীপের নিচেই থাকে কেবল অন্ধকার;
অসামান্য সূর্য কিংবা চাঁদের নিজস্ব কোনো ছায়া নেই ।
যদিও চাঁদের নিজস্ব আলোও নেই,
তবু যে অন্ধকারে কাটে তার
অমাবস্যা অমোঘ সময়
তাতেও অকৃতজ্ঞ নয় সে বাধ্যদাতার কাছে!

বৃক্ষছায়ারও যেটুকু মূল্য আছে,
কোনো কোনো মানুষের সেটুকুও নেই!
মানুষের ছায়ায় কখনো বাঁচে না মানুষ,
দৃঢ় দাঁড়াতে পারে না কেউ!
আমাকেও যদি দীপ্ত দাঁড়াতে বলো
সুকোমল আঙুলের কঠিন ছায়ায়
কখনো পারবো না তা...

মানুষের কোমলতা, লজ্জাবতী লতার মতন,
ছুঁয়ে দিলে নুয়ে পড়ে,
নুনের মতন গলে পড়ে জলস্পর্শে জলের দানা!

কান্নার মতো হাসিও দাঁড়িয়ে থাকে
অমলিন অপরাধে, বিষণ্ন নিবিড় কাঁধ ছুঁয়ে;

মানুষই কেবল পথ চেয়ে থাকে মানুষের আশায়...
অগণন ছায়া ছেড়ে প্রতিটি মানুষ
তবু ফিরে যায় একা একা...একা

অবরোধ

তার সাথে দেখা হবে না কি আর কোনো দিন!
উত্তরবিহীন প্রত্যাশায় তবু
বীণভক্ত নাগিনের মতো
এ কেমন অসাপ, অভিশাপ আমি...
টুঁটি টিপে ধরা নিশ্চিত যে হাত খেলা করে সুরের ইশারা
ইঙ্গিতে নাচায় অবাক সর্বাঙ্গ, সুকৌশলী তারই অনঙ্গ
আঙুল জড়িয়ে দুলে উঠি মৃত্যুর দ্যোতনা, দেহলতা...
কত কথা বুকে চেপে, তৃষিত ইচ্ছের ডানা মেলে
থেমে আছি উত্থিত উড়াল;
অদৃশ্য আড়াল খাঁচা ফ্রেমবন্দি শেকলের ক্যানভাস,
অস্থির যন্ত্রণা কী রকম গায়েব রেখেছে
আশ্চর্য ম্যাজিকওয়ালা!

নিশিদিন নিদ্রাহীন খুঁজে ফিরি অমৃত সঞ্জীবনী সুধা,
নিবিড় অদেখা ক্ষুধা নিরাময় কেন্দ্র নেই কোনোখানে!
দূর ভ্রমণে নিলো না আমারে আত্মীয় বাতাস!
হাহুতাশ দীর্ঘ হলে, দীর্ঘশ্বাস আরো দীর্ঘ হয়
জোড়া দেয়া রেলের বগির মতো;
বুক ভাঙা ওরকম কত রেল পড়ে আছে জংশনে,
জং ধরা রঙ নিয়ে, একা...
তবু এই পড়ে থাকা পণ্য নয়...

অসংখ্য মানুষ আছে ধন্য হয় নিলামে উঠলে;
অগণিত ক্রেতাও থাকে সুযোগের লোভে!
আমি তো লাভ ও লোভের নৌকায় পা রাখিনি কোনো কালে
মানুষকে দেখিনি পণ্যের আদলে,
তবুও মানুষ নিজেকে পণ্য করে বস্তুর বদলে!
দলে দলে দুঃখ আসে পুরনো ফেরিওয়ালা বেশে;
লাল ফিতা মাথায় পেঁচিয়ে, ঘুঙুর বাজিয়ে আমাকেই হাট
করে, হাটের একলা ভিড়, তাবিজ বিক্রির দর্শক
পাঁচ আঙুলের খেলা
আমাকেই করে হারানো শিশুর কান্না,
অসহায় অবহেলা...

শৈশবে ছেলেধরার ভয়ার্ত বস্তার মতো বাক্সে
বন্দি নিরীহ যে সাপ, তাকে জিম্মি করে বিক্রি করে
যারা বিষ-প্রতিষেধক-শেকড়, স্বাধীনতা;
তারই উদ্ধার, অভয় আশ্রম, ফিরিয়ে দেয় কি তারা!
অথবা অন্য কেউ!

অজ্যোতিষীর কেরানি যে টিয়াপাখি,
ঠোঁট দিয়ে খুঁটে তোলে মানুষের ভাগ্যচিঠি,
সে কি কভু জানে তারও ভবিতব্য বাঁধা
ওই শোষিত মনিবের সাথে!
সাদা কিংবা রঙিন খামে থাকে না মুক্তির বাণী
নিঃসঙ্গ নিজের নামে...

এসো যূথবদ্ধ হই
মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরি মাথার ওপরে...

দিবসে সূর্যের গভীরে

কেউ কেউ বলে, বড় দেরিতে এলে যে!
আমি বলি, দেরি বলে কিছু নেই;
দীর্ঘ প্রতীক্ষাতেই ফোটে প্রার্থিত নাইট কুইন।
এ কথাও বলে রাখি,

যেহেতু মানুষ আমি, সেই স্পর্ধায়
মুহূর্তে মিলিয়ে যেতে আসিনি জেনো...

পাখি বুনো হলেই মানায় ভালো, ফুলও;
ধুলো থেকে শুষ্ক মৌসুম, ঋতুবার্তা মেলে, ঝড়ের আভাসও;
বৈশাখে বন্য বাতাস উঠলে টের পায় গরু-ছাগলও;
মাঘে কিংবা পৌষে, মিশে থাকে যে ঝড় পাঁজর ছুঁয়ে,
সে খবর জানে কয়জনে!

নিজের আদলে প্রিয় মুখ দেখে দর্পণ,
নিজের আদলে বামনেরা বনসাই রাখে ঘরে
আর পাখি পোষে খাঁচার ভেতরে!
পোষ মেনে মেনে, এতটা আপোস জমিয়েছে রক্তে যে
চাইলেও এরা আর
উচ্চতা উড়ালের কথা ভাবতেই পারে না!
এমনকি অনুমান-ক্ষমতাও এতটা কম যে
সূর্যের রঙ দেখে বুঝতে পারে না
মেঘ অথবা রোদের ভাষা!
আকাশ কতটা নীল হলে গাঢ় হয় গোধূলি গগন
কতটা গোপন ঋদ্ধি শুধু পারে
অসময়ে ওড়াতে সমৃদ্ধি
সুসময়, এ কথাও ভাবতে পারে না তারা...

যত্রতত্র শোনা যায় শেয়ালের ডাক;
সিংহের গর্জন থাকে অরণ্য গভীরে;
অনন্য সে কণ্ঠস্বর, নিজস্ব নির্ভর আওয়াজ তোলে
নিদ্রামগ্ন পাথরেরও কানে! লুকোচুরি নেই কোনোখানে,
কোনো ভয়, অবক্ষয় নেই তার নামে!
জয়ের লাগামে, ঘোড়া বেঁধে ছোটে না সে রাসভের রেসে;
জয় এসে আপনি কুর্নিশ করে সাত্ত্বিক সিংহের পায়ে...

অগ্নি উদ্ভাবনের আগেও আগুন ছিল পাথরের বুকে,
মানুষই শুধু জেনেছে দেরিতে;
এখনো সে প্রকাশিত শক্তি নিয়ে
সবচেয়ে চুপ করে থাকে!
যে আকাশ একদিন ভাগ করে দেবো

আরো অনেকের নামে,
আজ তার আগাম খণ্ডিত দামে
লিখে দিয়ে যাই উদার দলিল,
যদি পারো মুছে দিয়ো এই নক্ষত্রের নাম
পুরোটা আকাশ জুড়ে আমি একা জ্বলে উঠলাম...

প্রতিদিন দুঃখকাল

অন্তহীন শূন্যতার ভেতর স্বপ্ন ও শপথ বুনে দিয়ে
বলেছি, বাতাসে ছড়ালাম অক্সিজেন, মানবিক মন্ত্রপাঠ;
দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ দূরাকাশ, তালগাছ মিশে যাক এক সুরে
পরম প্রশ্রয় নিবেদনে; অহর্নিশ এই কথা গেয়ে যাই মনে মনে;
স্বাপ্নিক সময় ছেড়ে স্বপ্ন তবু চলে যায়
অসহায় শিশুটির মতো ক্লান্ত আহত আড়ালে!
সারা দিন কোলাহল, সারা দিন কালো ধোঁয়া,
চোখ ভরে ওঠে জলে...

প্রতিদিন নতুন স্বপ্ন, প্রতিদিন নতুন সকাল
প্রতিদিন স্বপ্নভঙ্গ, প্রতিদিন দুঃখকাল!

রাতের আশ্রয়ে ঋদ্ধ অন্ধকারে প্রতিদিন ডুবে যায় সূর্য
রেখে যায় গোধূলির লালরঙ,
অহং মুহূর্তে জ্বলে ওঠে অন্য আগুনের আভা;
আধফোটা ডিম থেকে পাখির ছানার মতো উঁকি মারে মন,
কখন বদল হবে আন্তঃস্বদেশ লোকাল ট্রেন,
অনিয়ন্ত্রিত গতি, বিরতিভ্রমণ...

ভরা ফসলের মাঠে, কাঁধে বয়ে কে ছড়িয়ে গেলো কীটনাশক,
এতটা বিষ! এখন যে অহর্নিশ উড়ালের সাথে ভারি হচ্ছে
প্রতিটি পাখির পালক, প্রকৃতি, আবাদি জমির বুক;
পচে যাচ্ছে পাকা ধান মূলবীজ,
কুয়াশাচ্ছন্ন আগামীর স্বচ্ছ এই সর্বনাশ মানবো কীভাবে
চাপিয়ে দেওয়া জোর হতাশা?

আমি তো বিরুদ্ধ বাতাসের সাথে একাই লড়েছি এতকাল;
এক থাল সাদা ভাতের পাতের পাশে
এক চিমটি নুনও তুলে দেয়নি কেউ!
তবু কোনো লোভ, ক্ষোভ, প্রতিশোধ-স্পৃহা
বন্দি নেই পাঁজরের খোপ কিংবা কোমরের বাঁটে!
কিছু আড়াল বেদনা শুধু পায়ে পায়ে আড়ালেই হাঁটে!
মন খারাপ করা পান্তাভাতের তৃপ্তির মতো গিলে ফেলি
আর সব দুঃখ, প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা!
বৃদ্ধমূল্যের বাজারে তবু মুখভরা হাসি নিয়ে হাঁটি
রাজার মতো! পরিচিত অনেকেই ঈর্ষান্বিত বলে,
এত সুখ পাও কই?
এত খুশির জোয়ার আসে কোত্থেইকা?
হাসির আওয়াজটা আরেকটু বাড়িয়ে বলি,
গরিব মানুষ, ওষুধ কেনার পয়সা তো নাই,
হাসি দিয়াই চালাই হার্টের চিকিৎসা...
দীর্ঘশ্বাস সযত্ন আড়াল করে, মনে মনে বলি,
এত যে সুস্থতা বিলাচ্ছি বাতাসে
তবুও তা অক্সিজেন হয় না অঢেল কেন!
তবু কেন বুক এত ভারি হয়ে থাকে,
চারপাশের বাতাস কেন এতটা নির্মম, এত ক্ষিপ্ত,
কেন বিষমাখা তীর ছুটে আসে আমারই দিকে! কেন এসে
বিঁধে থাকে আমারই বুকের বাঁ পাশে অমঙ্গল নিপীড়ন,
অদেখা মাছের কাঁটার মতন!

এইসব বিবিধ যন্ত্রণা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আমি তবু যাবো বহুদূর...
আমাকে আঘাত করে করে শেষ হবে একদিন অকারণ নিষ্ঠুরতা,
শেষ হবে আমার শূন্যতা; সুনিশ্চিত এই কথা জেনে
আমি আছি ফুল ফোটানোর পথে, হুল বিপরীতে...

অক্ষমতাসমূহ

(**উৎসর্গঃ** কবি ত্রিদিব দস্তিদার, যাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি...)
'...তোমার চারপাশে এখন কালো মেঘ, সূর্য-ডোবার দিন...,
ঘুমের মধ্যে, না-নেশা ঘুম ঘুম কামার্ত তৃষ্ণার মধ্যে
কিংবা তোমার অস্তিত্বের একান্ত তৃষ্ণাগ্নির ছোঁয়ায়

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছো...’

এতটা অসম্ভবে এভাবে রাত্রিতে যাবে বলেই কি
বিকেলে অতটা হেসে ছিলে!
আর কোনো ভোরে পরকীয়া ঘোরে লিপ্ত সূর্য দেখবে না,
এই কথা বলোনি তো আগে!
আমি না হয় দূরের মানুষ,
যারা তোমার কাছের ছিলো, যারা এখন কাঁধে নিলো,
তাদের কাছে? দিমা নেফারতিতি, যে তোমার কবিতার
তৃতীয় নয়ন ছিলো, তাদের তুমি জানিয়েছিলে এই অভিমান?
তারা কি কেউ শুনেছিলো বুকপকেটে জমিয়ে রাখা পাঁজরভাঙা গান?
ভাবের হরি ‘ভালোবাসার শাদা ছড়ি’
অন্ধকারে ঠুকে ঠুকে, অন্ধ পথিক বাজিয়ে গেলো
বেদনা বিভোর...

বলেছিলে ‘পোড়াবো তাজমহল’ ‘পুড়িয়ে, ফেলে
দেবো যমুনার জলে’ অথচ তোমার ‘গৃহপালিত পদ্যেরা’
তোমাকেই পুড়িয়ে, ডুবিয়ে রেখে এল বুড়িগঙ্গার অতলে!
অকৃতজ্ঞ তোমারই কবিতার পঙ্ক্তি তোমাকে এতটা একা
রেখেছিলো যে,
একফোঁটা জলও স্পর্শ করলো না তোমার তৃষ্ণার্ত ঠোঁটজোড়া...
কে তোমাকে পরিয়েছিলো পরম দুঃখদানা, কসমের মালা?
এত জ্বালা বুকে নিয়ে, মুখে এমন শান্তির হাসি
বাঁধিয়ে দিয়েছিলো কে? এসব প্রশ্ন কখনোই উঠতো না
যদি অবিশ্বাস্য এভাবে না যেতে...

ভীতু ছিলে না তো তুমি, নাকি ছিলে?
তবে যে প্রতিটি মিছিলে দেখেছি মুখরিত, শ্লোগানে শ্লোগানে,
প্রভাতফেরির গানে, সম্মিলনে!
সম্মোহিত আড্ডা থেকে মিলন মোহনা আচমকা
কেমন করে গেল বেঁকে, একা একা একাগ্র নিভৃতে!
স্বভাবে যদি রোদ্দুরই ছিলে
তবে রাত্তিরে পালালে কেন না-নোটিশে!?
বাড়িভাড়া বাকি ছিলো? মুদি দোকান? নাকি দুটোই!
‘অঙ্গে আমার বহুবর্ণের দাগ’ নিয়ে
‘ভালো বাসতে বাসতে ফতুর হয়ে যাবো’ বলেছিলে;

এত কিছু বাকি রেখে, কাকে ফাঁকি দিলে মুগ্ধ মুখস্থ চোখ!
কোনো অভিযোগ, দাবি না-জানিয়ে,
কাকে বাঁচাতে, মৃত্যুকে করলে আলিঙ্গন–
প্রিয় মুক্তিযোদ্ধার মতন!
শাস্তির বদলে কাকে দিয়ে গেলে নির্লজ্জ আশকারা!
যারা তোমাকে পাঠালো এতটা অসম্ভবে, অ-সুখের ডাকে,
জেনে রাখো, ইতিহাস কোনো দিন ক্ষমা করবে না তাকে...

মু ক্তি ম ণ্ড ল

সমুদ্রদৃশ্যের নর্তকী

আজ সন্ধ্যার নিটোল ঢালুপথ বেয়ে উঠে এসেছে দেবদূত
সমকালের কলঙ্ক মুছে
শূন্যতার শিহরণে কেঁপে উঠছে পেরেক ফোটানো দশটি আঙুল

স্ফীত বাহুতে সুগভীর সহমর্মিতা
ঘন জঙ্গলের অন্তরালও খুলে দিয়েছে তার সমস্ত বিস্তার

পেরেকের কম্পিত সিঁড়িতে
নেচে উঠছে আজ কণ্ঠ থেকে বের হওয়া রক্তের ফিনকি

নিজের উন্মত্ত শিরায় ফুটেছে কোমল রোদন
অগ্নিমত্ত প্রণয়ীর কাছে চুপ করে আছে বিশুদ্ধ ভঙ্গিমা

সে আমার দূরবর্তী অন্ধকার
বিলাপকারিণীর ঘুমিয়ে পড়া দেহ

আজ নেচে উঠবে সমুদ্রদৃশ্যের নর্তকী

কণ্ঠরোধী সকল দৈত্যরা একে একে উঠে আসবে আসরে

আমরা কুহকী পাখির আত্মায় গেঁথে রাখছি নজরানা
রক্তের কণায় কণায় ফুঁসে উঠছে ক্রোধ, রূপ কাতরতা

মাধবী সন্ধ্যার গ্রীবা

যত দূরেই থাকো শ্যামের অন্তরে চড়ে তোমার কাছে যাবো

নিজস্ব দর্শনের রূপে তুমি শাকাম্ভরী
তোমার পায়ের কাছে যেসব গ্রন্থ-প্রণেতাগণ
প্রতিদিনই বসুপতি সাজে
এরাই মহিষের শিঙে লাল ফিতে বেঁধে ফিরে যাচ্ছে আনন্দের ডাকবাক্সে

এরা বিদ্বান
এরা কাঠের পা

স্ফুলিঙ্গ দেখলেই এরা বসুমাতা দেবীদুর্গে ঢুকে পড়ে
পড়ে থাকে তাদের পুষ্পরথ

তুমি ফিরিয়ে দিয়েছো যাদের তারা এখন
বারুদ দস্যু

মধুখোর ওদের জ্ঞাতি সম্পর্কের কেউ না
ওদের কোনো জঙ্গল নেই

ওরা টবের গাছে বিদগ্ধ এক একটা হলুদ পাতা
শিরাসূত্রে
তুমিও ওই বংশেরই মাধবী সন্ধ্যার গ্রীবা তোমার কাছেই যাবো

শ্রীশুদ্ধতমা

একটা গলাকাটা মাথার ভেতর ডুবে গিয়ে দেখি
অসংখ্য জানালা
অসংখ্য ঝুলন্ত ব্রিজ ও কালো কফিমগ

ভেঙে যাওয়া ঘড়ির কাঁটায় লটকে দিচ্ছি

রজঃবতীর সুড়ঙ্গ ম্যাপ

উড়ে আসছে স্নিগ্ধ মধুবনের হাওয়া

সংকেতের বাইস্কোপে দেখছি সৃজনশীলার নৃত্য
দেবে যাচ্ছে পুষ্পরথের চাকা

মায়ামুকুরে চাকু বসিয়ে পুরনো নথের বাজার থেকে
একে একে বাড়ি ফিরছে মেঘশিকারের দল

চুপ করে আছে শুকনো বটপাতার লেঠেল বাহিনী

গভীর রাতে পদ্মপাতায় জেগে উঠছে শ্রীশুদ্ধতমা
হৃদপিণ্ডের খোলা খাম

কুমুদিনীর নিশি দর্পণে শুয়ে আছেন সর্পকুণ্ডলিনী
উনার হাত থেকে খসে পড়া আয়না ভেঙে
জন্ম নিচ্ছে
টুকরো টুকরো বিষাদের মমি

নৈশধ্বনির ডাকঘর

নৈশধ্বনির ডাকঘর খালি করেই
তোমার কাছে উড়ে এসেছে দমকা হাওয়া
স্নানঘরের রক্তিম টেলিগ্রাম

আজ বৃষ্টির আগমনবার্তা কি তবে বাতিঘরেই
ঘুমিয়ে থাকবে একা একা!
সেই কি তবে দেহভেদী আলো...

ওইতো সীমানার নাভিমূলে জ্বলে উঠছে
বিকিরণ

ওখানটাতেই ক্ষয়ে আসা ফলের আকার
বেড়ালের থাবার ন্যায় লুফে নিচ্ছে নদীপথে ভেসে
যাওয়া মানুষের মুখ

মুছে যাওয়া দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করছে সূর্যমুখী ফুল

তুমি একটা ডুমুরগাছের পাতা

তুমি একটা ডুমুরগাছের পাতা, কাগজের প্লেন, তোমাকে ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। চুপ হয়ে আছে সুঘ্রাণের ভেজা রুমাল, সে তার দেহ থেকে খুলে রাখছে সন্দেহ, খুলে রাখছে পেরেক চিহ্নের ব্যথা।

মধুগড়ে বিষাদের মৃগনাভি বেয়ে লতিয়ে উঠছে বিদ্যুৎলতা, থোকা থোকা কাকরোল।

আজ সারাদিন মস্তিষ্ক আকাশে একা একা উড়েছে ডুমুরের আভা। রক্তিম ফলের আকারে মিশে গিয়ে দেখেছি স্নিগ্ধ ত্বকের মাংসপিণ্ড। ড্রিল মেশিন যখন অগ্নিগর্ভের তলদেশ ছুঁয়ে ফিরে এসেছে তখন মনে হয়েছে নিঃস্বার্থ মমি প্রদেশে তুমি একটা সাদা পেন্সিল।

একটা লোহার ফুল

একটা জগৎকণার মতো মুক্ত বিহঙ্গ ডানায়

চিহ্ন রেখো না

উড়ে উড়ে দেখতে থাকো শশি নর্তকীর জলমহল
ঝোপের ভেতর মুছে যাওয়া ফুলের
দেহচিহ্ন

মোহনজঙ্গলে বন্ধনমুক্ত পাতাদের শিরায় শিরায়
উড়ে যাওয়া পতঙ্গের মতো

কেঁপে উঠছে অনুভবে মুগ্ধতার মেঘরেস্তোরাঁ

আপেল উদ্ভাস আকাশে উড়ে যাচ্ছে বসন্তের মেঘমালা

চুপ করে আছে
কুয়াশাঢাকা দিগন্তে ডালিমকুমারের দেহ সুন্দর
চন্দ্রসৌম্য

অস্থির হয়ে উঠছে গভীর রাতে একটা লোহার পুল

ঘুঘুদহ

জীবনের খানা-খন্দ ভরে গেছে

মাংসের ভেতর গেঁথে রাখছি শীতভরতি সিরিঞ্জ

সহসাই কেঁপে উঠছে
দেহখানা

কয়লার তলে জ্বলে ওঠা অগ্নিনায়িকার বাজুবন্ধে
মিলিয়ে যাচ্ছে মৃদু রোদের গতি

একটা পাতার মতো
উড়ে উড়ে ফিরে আসছে হলুদ বাটা হাতের কাঁপন

মনে পড়তেছে ঘুঘুদহ

তার পানির নিচে
নথ হারানো রমণীর একটা চুলের সাথে তলিয়ে গেছে
কার অন্তর!

স্মরণ

আজ কে যেন আমাকে ধুয়ে ফেলতেছে। শুদ্ধতার বিপরীতে জ্বরতপ্ত দেহ ফেলে রেখে– ভাবি সরলতা, নির্মমতা

মনে হয়, ভালুকের থাবা থেকে রোদ সরাতে সরাতে একদিন তুমিও
বালুর ভেতর যেই প্রাণ
যেই সম্পর্কের গাঢ়তা সেসব ঠিকই চিনে উঠতে পারবে

আমি গড়ে তুলছি কালিমার পাহাড়

পালকনির্মিত কেবিনে বসন খুলে কে দেখতেছে কাননবালা মেঘ-সিঁথি!

এই শুধু ভাবতেছি আর মেঘমালা
উড়ে যাওয়া দৃশ্যের মধ্যে ধুধু শাদা হাত থেকে খসে পড়ছি
খসে পড়ছি
হুড়মুড় করে কোথাও ভেঙে পড়ছে কি মোমালোর গম্বুজ!

টের পাইতেছি পুরনো ছুরির বাটে ফুর্তিবাজদের নিভৃত মৌনতা চুপ হয়ে আছে
কারা কালো বেড়ালগুলো দাবড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিশুতি দুর্গের ভেতর!

অগাধ যৌনতার টবে ফুটে উঠছে নির্লিপ্ত চাঁদ ।

একটা ঝাউপাতার দুঃখ

একটা ঝাউপাতার দুঃখ
স্ফীত । নিলো না বৈভব । নিতে চাইলো সে অন্তরমুগ্ধ
অচেতনতা । মুখের পাশ থেকে সরে গেলো দেওয়াল ।

* * *

যখন ফিরে আসলো কাঠের পা স্মৃতিতে তখনও রোদ মেশিনের চাকাতে জড়িয়ে ছিল আলিঙ্গন । হাতের ভেতর ঘুমিয়ে পড়েছে অজস্র বেড়াল । চেতনার শরীরটাকে আস্তে আস্তে টপকিয়ে দেখে নিচ্ছি মেঘসিংহ । উড়ে যাচ্ছে লাল চিঠির খাম ।
আমাদের প্লাস্টিকের নল দিয়ে পানি পড়ছে

* * *

একটা ফিকে হয়ে যাওয়া মন যতদূর দেখতে পারে ততটুকু পাতার নিচে বসে থাকা
দেহ নিথর ভাবনার সাথে তোমাকে ভাসিয়ে রাখে রোদের ভেতর কাঠের টুকরো
ছিটকে পড়া রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে
দেখতে চাওয়া আয়না কখন যে মনে মনে বয়ে যাওয়া নদীর সাথে
মিশে গেছে টের পাইনি আমি।

তারও তো পরিধির ভেতর বসে থাকে পায়রা পালকের গা থেকে বিচ্যুত
আলোর সরণি
ওকেই তো আমরা দেখি মস্তক ছিন্ন ছায়ার মধ্যে

আলিঙ্গনাবদ্ধ
ডুবুরির বাহুতে জড়ানো নার্সের স্মিতস্মৃতি সম্ভার

রাত পার্লার

মিথ্যেবাদী জীবনের ভেতর অনেক খাদ
অনেক গভীরতা
তার মধ্যেও অসংখ্য মায়া সংকেত
ঝিনুকের তৃষা

আজো বুঝতে পারিনি বাদামি দেওয়ালের ভাষা
রক্তপান দৃশ্যের অভ্যন্তরে
যেইসব কামশাস্ত্রের ছিন্নপাতাগুলো উড়ে এসেছে
সেইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি

ভাবি, প্লাস্টিকের নল বেয়ে উঠে আসছে
কোন বসন্ত দিন!

পাতাঝরা হাওয়ায় ভেসে আসছে
অসুখীদের আর্তস্বর
সেগুলো জোড়া দিতে দিতে ভোর হয়ে যায়

চুগলখোরেরা ঘুমিয়ে থাকে

আমি তাদের মুখের দিকে লক্ষ করে দেখি
ওখানেও খাদভরতি আকাশ
রক্তজবার নগ্ন প্রাঙ্গন

খাদের গভীরে ক্ষুদ্র ছুরিনায়িকার রাতপার্লার

ই ক তি জা আ হ সা ন

ঘোর বর্ষণ

দ্রবণ তোমাকে ডাকে, মেঘ
তোমাকে ডাকে খলবল জল
তোমার ঋতুতে অনাস্বাদিত কই
কানকো দিয়ে হাঁটে...
জলের সুরঙ্গে
এই ঘনানো সন্ধ্যায়
প্রকৃতি যেমতি পরকীয়ায় মাতে
দ্রবণ তোমাকে ডাকে...
ঝর ঝর ঝির ঝির
ছন্দে মাতোয়ারা
তোমার দেহে দ্যাখো ঘোর বর্ষণের পুরুষ
ঘরের বাহিরে ডাকে !
তোমার জলকণা ঝরাও মেঘ
তোমার জলকণা ঝরাও ।

চড়ুই-বৃষ্টি

এবার খুব চড়ুই-বৃষ্টি হবে
ভেজা ভারি মৌসুমি বায়ু সহকারে
দূর আকাশের কোন পাড়া-গাঁ থেকে

ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই নেমে আসবে
এই মৃতবৎ পৃথিবীর পাড়ে....

কোন এক অলৌকিক জ্যোৎস্নার মাঠে
চড়ুইদের সমাবেশে আদিম রহস্য নিয়ে
বিস্তারিত থাকবে উন্মুল শীত ।
তবু ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই নেমে আসবে
পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলয়ের মধ্যে এসে
তারা ফ্যাকাসে হতে থাকবে

হাজারো মোবাইল টাওয়ারে ধাক্কা খাবে
ভাইব্রেশনে কেঁপে উঠবে তাদের জ্বরতপ্ত শরীর
কেউ কেউ মুখ থুবড়ে পড়বে!
চড়ুইদের মৃতবৎ পতন
তোমাদের মাংসের লালসা বাড়াবে
তোমরা বনভোজনের নকশা তৈরি করবে...
কখনও ভাববে না চড়ুইদের মৃত্যুর নেপথ্য নিয়ে!

প্রতিকৃতি

প্রতিকৃতির উপর খসে পড়ে টিকটিকির লেজ
বর্ণহীন পেন্সিলের শিষের মতো
প্রতিকৃতি গুইসাপ চামড়ার আশ্রয়ে
রেখার দ্যোতনায় নগরের রাস্তায় ফুটে থাকে !

রাষ্ট্রের অমোঘ দেয়ালে
সাঁটানো প্রতিকৃতিতে
নিশিসখা কুকুর
ঠ্যাং উঁচিয়ে মুতে দেয় ।

ভেজা প্রতিকৃতি
তবুও নগরের রাস্তায় রেখার দ্যোতনায়
অবিকল ফুটে থাকে...
সবুজ প্রজাপতি

তার মুখের দিকে তাকালেই আমি একটি সবুজ প্রজাপতি উড়তে দেখি এবং আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়ে উঠে ভাবি, প্রজাতিতেও প্রবঞ্চনা থাকে... সকল ফুলে সে বসে না । আমি এক নাদান যুবক ফুল হয়ে ফুটে থাকি ।

মেঘবিদ্যা

পাঠশালায় মেঘবিদ্যা শেখায়নি !
ভোরবেলার শিউলিতলাকে যে দিঘির জলের রাজহাঁসও বলা যায়
সেটাও বয়স বাড়ার পর শিখে নিতে হয়েছে ।
একটি হাতছানি দেয়া দিঘির জলে কেবল মেঘবিদ্যা জানলেই
সন্তরণশীল মাছ হওয়া যায়, তা-ও অনেক পরে বুঝেছি ।
এরপর থেকেই আমি মেঘবিদ্যা শেখার বাসনা করি...
আমার বন্ধুরা কোনোদিন বোঝেনি
কিভাবে একটি দিঘি হাতছানি দিতে পারে !
কিংবা কিভাবে একজন পরিপূর্ণ যুবক মাছ হতে পারে ।
তারা আমাকে দেখলে ক্ষেপাতো, কি রে মৎস্য...
আমি বলতাম আরও গভীর পানিতে আবাস খুঁজছি...
মাঝেমধ্যে তারা বলত, দিঘির হাত কি তোর চোখে ছানি
ফেলে দিল যে টিয়াদের আড্ডায় আর আসিসই না !
আমি বলতাম, দিঘি বেশ খেলা জানে, পিছলা আছে ।
আমার বন্ধুরা হয়তো দিঘি বলতে বুঝতো পুবকান্দার
সৈয়দদের বাড়ির পেছনের দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়টিকে...
দিঘি বললেই আমার চোখে লেগে থাকতো পাশের বাড়ির মেঘাদি
মণ্ডলদের ভাগ্নি সে, চৌধুরীদের বেটি
তার শরীরে একটি হাতছানি দেয়া দিঘি নিরবধি বয়ে চলতো
তার স্রোতের প্রতিকণায় উদ্ভিন্ন ঢেউ...
দিঘি ডাকে, ও মেঘ থামো
মেঘ বলে, মেঘবিদ্যার কুহকে আমায় ধরো...
মেঘবিদ্যার কাঁচা পাঠে আমি তাকে ধরতে যাই
সে বিভ্রম হয়ে ওঠে !

মেঘবিদ্যা পরম বিদ্যা; দেয় প্ররোচনা

ও দিঘির জল তোরে করি বাঞ্ছনা
খেলাপ্রিয় মেঘ শোনো, শিউলিতলায়
চিরকাল ফোটে যে ফুল নব যোজনায়...

মাছ

সারারাত একটি বড়শি পেতে
বসেছিলাম এক কুহকী পুকুরপাড়ে
মাছও ধরা পড়েছে বেশ
স্পষ্ট খেয়াল পড়ে
সমবেত উৎসাহীদের বিমুগ্ধ করতালি
ভোজনরসিক আত্মীয়দের লালাপূর্ণ ঠোঁট ।

আমি বড়শি পেতে ধরছি ঘুম
যথাযথ কৌশল না-জানায়
বারবার উঠছে অ-চিন মাছ ।
আমার ব্যাঙমা ব্যাঙমী শুভাকাঙ্ক্ষীরা
উচ্চারণ করছে দূরাগত শব্দাবলি
বাজাচ্ছে করতালি....
জাদুকরি মাছ খাওয়ার লোভে
তাদের মুখভর্তি থই থই করছে
আঠালো লালা !

শা হী ন আ ল মা মু ন

শুদ্ধতম পথে গেছে– সে

গোপন আলোয় রহস্যকে হত্য করে– তীক্ষ্ণ ছুরি
স্বপ্নের গভীরে ঘুমিয়ে আছে– ঘুম
চলে যাচ্ছে– সে, বিচলিত সময়কে অতিক্রম করে
কাঙ্ক্ষিত তৃষ্ণা– আমৃত্য ছিলো জাগ্রত যার
সে চলে গেছে শুদ্ধতম মসৃণ পথে
ক্লান্তিকর শরীর– ক্ষুধার্ত কোষের শ্লোগান
অনর শরীরে গর্বিত মালিক হয়–

মধ্যরাতে জোছনার প্লাবনে ভাসছিলো যখন চাঁদ
মৃত্যুকে ডেকেছিলো– সে
শুদ্ধ শরীরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করবে
জাগতিক বসত পেরিয়ে
বিশ্বাস তার– উন্মোচিত রহস্যের দিকে পৌঁছে যাবে সে;

কনফেশন

মেঘ কালো আভা, কাঁকড়ার মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলে
হৃদয়ক্যানভাসে অজানা এক সংকেত
বাজপাখির মতো চিৎকার করে ওঠে
কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে– দৃষ্টির সীমানা

কালো পথ ভেঙে ভেঙে
বসন্তক্ষত মুখের মতো ভয়ঙ্কর
পানাহীন– ব্যাঙাচির পুকুর
পিপাসিত কুকুর লেহনে মাতে জলতৃষ্ণায়

ফেলে আসি– ব্যস্ততার অজুহাতে
ভাঙ্গাড়ির দোকানে– বন্ধুত্বের বাকি অংশ
সীমিত আয়ে– অসীম ভাবনায়
ঘৃণিত হয়ে দাঁড়াই– আবর্জনার কৌটায়

অরক্ষিত দানবের মতো– মেতে উঠি ধ্বংসার্থে
প্রেম– ভালোবাসা– বিশ্বাস– আস্তার অস্তিত্বে ।

অ-এর কবিতা র'য়ে যায়

হৃদয় কেঁপে ওঠে, বিদ্যুৎ স্পর্শের মতো
অজানা নেশা আসক্ত করে স্নায়ুকোষ
নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি মেথরের মতো;
তারপরেও কারো কারো ঘোলা চোখ
মন্ত্রমুগ্ধে দেখে–
থলের ভেতরে বেড়ালটাকে
হিংস্র চোখে নিয়ে বসে থাকে, ওঁৎ পেতে
ধারালো নখ চটের বস্তা কাটে
আর, তাতে বেরিয়ে আসে অজগর–
গিলে খায়, স্বপ্নময় রাজপথ ও কয়েকটা মায়াবী হরিণ;
ইতিহাস জন্ম হয়, আমরা রাক্ষসের পেটে জন্ম।

টেবিলে সাজানো থাকে সুসজ্জিত পাত্রগুলোতে
আর, তাতে আমরা থাকি, রক্তে ও মাংসে;
ফর্সা রমণীরা ঊরু দেখিয়ে বুড়োদের পাশে দাঁড়ায়;
বেজন্মার সংখ্যা বাড়ে ভোটার লিস্টে।

নদী সঙ্গমে যাবে

নদী সঙ্গমে যাবে! নদী সঙ্গমে যাবে!
সে কবে থেকে শুনে এসেছিলো
ঢেউ আসে, ঢেউ যায়।

নিকারির ছেলে স্বপ্ন দেখে
জলকুমারী জল ছেড়ে ডাঙ্গায় ওঠে
জাল জলে ডুবে...

এক ফালি চাঁদ ওঠে
জলবালিকার তরঙ্গে মাতে
রাত বাড়ে
চিমটির সলতে শেষ আশায় জ্বলে

আজ রাতে, নদী সঙ্গমে যাবে ।

গভীর হবে আজ গভীরতা
মিলন ব্যাকুলতা ছিলো আজ যারা
জলে উষ্ণ আলিঙ্গনে জলকুমারীরা ।

আমরা জটিল সব কৌশলে ব্যস্ত

গণতন্ত্রের চেতনা ঘুম কেড়ে নেয় আমাদের
সারাদিন মাথার মধ্যে বেদনা, মাইগ্রেনের
উগ্রে ফেলি নিজেদের অর্জন
বর্জ্য করে তুলি পথ, ঘাট, মাঠ
এমনি আমাদের প্রিয় বিদ্যপাঠ ।

'আমরা জটিল সব কৌশলে ব্যস্ত'

শরীর পুড়িয়ে মাংস রাখি খাবার টেবিলে
চেতনার ফসল ওঠে না আমাদের ঘরে;

চেতনার সাপ জেগে উঠে লকলকে ফণা তুলে
পিতার কোলে ঘুমন্ত শিশু ফিরে দগ্ধ লাশ হয়ে ।

আর কতটা ক্ষতি সাধন করতে পারো তুমি
দমকে দমকে র'নীতির নামে, ধ'নীতির নামে
বুঝি না তোমাদের যোগ-বিয়োগের ফলাফল
তবুও শতকীয়া কষি
এক একে এক
দুই একে দুই
তিন একে তিন
যায় দিন আসে রাত
উঠানে পরে থাকে অনাহারের লাশ ।

ক্ষতির সময়টা উৎসবে মাতে
রোজগারি ছেলে শূন্য হাতে ফেরে
কুলোতে চাল নেই, চুলাতে আগুন নেই

তবু কপাল পুড়ে অনেকের;

বসন্তের দিনে নববধূয়া সাদা কাপড় পরে
চুড়ি ভাঙে, সিঁদুর মুছে
বিলাপ করে উঠানে গড়িয়ে।

বুনেছি নিজেরে

লাঙ্গলের ফলায় বুনেছি নিজেরে
বীজতলায় জেগে ওঠে ভবিষ্যৎ
তফনে কাছা মেরে বাপ নেমে পড়ে...

বুড়ো বলদ জোয়াল টেনে টেনে
শরীরটাকে ক্ষয় করে...

ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত হয় ঈর্ষা থেকে

অগ্নি, বায়ু, পানি আর মাটি সংমিশ্রণে
এই আমি ও আমাদের পূর্বপুরুষ ও নারীরা:
কালের পরিক্রমায় আমরা তৈরি করেছি
ঈশ্বরদূত নিজেদের;
এমনটা যদিও পুরাণে বর্ণিত।

প্রাচীনকালের ঈশ্বরের শরীরে বহু কালের ঈশ্বর
বহুকালের ঈশ্বরের শরীরে আজকের ঈশ্বর–
বসিয়েছি নিজেদের সৃষ্টিতে;
এমনটা যদিও পুরাণে বর্ণিত নেই।

প্রাচীনকাল থেকে বহু কালের বিবর্তনে
আমাদের স্বরচিত মহাকাব্যে ঈশ্বরকে–
নাজির করেছি নাজরানা দিয়ে;
জেনেছি আমাদের অস্থায়ী বিশ্বাস থেকে
ঈশ্বর সৃষ্টি করতে হবে আগে।

তাই স্বপ্রলোচনা অথবা সমষ্টিগত ভাবনায়
ঈশ্বর সৃষ্টি হয়েছে;
এমনটা যদিও পুরাণে বর্ণিত নেই ।

প্র থ ম দ শ ক

তা রি ক টু কু

খঞ্জর

খুব ভোরে বজ্রের ঝিলিকে ঝিলিকে দেখি
সুপারিগাছ, কী রকম অলৌকিক, সাদা
হাওয়ায় দুলছে, তবু ঋজু– ঠাণ্ডা খঞ্জর এক, খাড়া ।

ভাষা নেই, ধাতু নেই, আছে লীলার কটাক্ষ
যেন লৌহখণ্ডের মাথা থেকে চারদিকে আন্দোলিত ফলা
বাতাসকে ঝাপটায় আর খুলে নেয় তার গোপন কথার ডালি

আর তাতে বাসা-বাঁধা দিশাহীন একটি পাখি
ঝলকানিতে বুঝে নিচ্ছে সকাল নয়, দ্বিপ্রহর নয়
এমনকি ফলের আভায় গড়ানো কোনো গোধূলিও নয়–
এখন সময়হীন অপেক্ষার কোনো সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত ।

তোমার দিকে

বুঝিনি তোমার দিকে এত মায়া, এই ঘুমহীনতা ছাপিয়ে
লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির মধ্য দিয়ে অপ্রকাশের দিকে কেন চলে যায়!

সেখানে কি ধাতু ধূমকেতুর মতো ছিটকে আসে, পতনের শব্দ হয়?
ঘুরতে ঘুরতে কোন-বা আকার পায় এই সব অবিমৃষ্যকারিতায়!

এরা ছিল বাঁকহীন– মৃদঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেসে ওঠা সুর
জানি না সে-ও কেন একই দিকে জলের লহরীর মতো বয় ।

দ্বিধা

একা ভেসে থাকা বিয়োগচিহ্ন এক
ভাসতে ভাসতে ধাক্কা খাচ্ছে জলে–
সে স্মৃতির মতো তোমায় জানালাগুলো
ভাবছি আমি, এখনো রয়েছে খুলে!

দ্বিধা নিয়ে আজ উড়ছে পর্দাগুলো
একটু একটু বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে
কী কথা আসে, কী কথাই-বা থেকে যায়
আলো খেলে যায়, ছায়াটুকু স্থির থাকে–

আমাদের দেখা হবে না এ জীবনেও
দূরে বসে থেকে কেঁপে যাবে শুধু কাঁটা
ঘড়িটির থেকে ক্রমে আরো দূরে গিয়ে
তুমি রয়ে যাবে অদেখা তারার ফোটা

পথ

চির অন্ধকার আসে নিজেরই মুখশ্রী চিরে । আমরা পাশাপাশি বসে আছি, বহু দূরে একটি পথ আমাদেরই কথা যেন বিসর্পিলভাবে বলে যায় । এইখানে ঘড়ি নেই । তাই সময়চিহ্নিত আলোটিও নেই ।

ধারা যাক রাত্রিঃ

আমি কি আর্দ্রা বা কেতুকে পাহারা দিচ্ছি? তাহলে কি তোমাদের এ ভোজসভায় এসে আমার অনুপযুক্ততাগুলো বোঝা যাবে। পাশে কোনো পশু এসে দাঁড়িয়েছে– পা থেকে রুধির ঝরছে। নিজেই অবাক হয়ে নিজের চুইয়ে পড়া রক্ত দেখছে। আমরা পথটির দিকে চেয়ে আছি।

কোথাও ঢুলি বাজছে।

ধরা যাক বিকেল:

বহু উল্লাসধ্বনি ফেলে এসেছি। কত উপকথা আর অশ্রু ফেলে ওই সূর্য গড়িয়ে নামছে। এখন গোধূলি, কোনো কোনো পাতার রঙ লাল। কী রকম ভার নিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। এমন ভাবনায় বিহ্বল আমি কথার তোরঙ্গ খুলে বসেছি।

রাস্তায় উন্মাদের গানের মাঝে ছায়া আর চির অন্ধকার দোদুল্যমান।
রাস্তায় উন্মাদের গানের মাঝে ছায়া আর চির অন্ধকার দোদুল্যমান।

এর মাঝেই পাখি ডাকছে, ছাত্রেরা বাড়ি ফিরছে। একটি আপেলের মাঝখান থেকে গড়িয়ে নামতে থাকা আভা যেন আরও রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। এর নামই কি সুর, আলোর সাথে সাথে নাচছে, নিভে যাচ্ছে

ব্যাধ

কত কিছুই-না হারিয়ে ফেলি। এই ধরো সবুজ বল্লম, বাইনোকুলার আর ধবলাগ্নি টর্চ। রাতে তাই বেরোতে পারি না। যদি কেউ চেপে ধরে, মরীচিকা ডাকে।

কেউ বলে– ওই তো তোমার বল্লম, রাত্রিভর হরিণের পেছনে উড়েছে।
শুনি– ওই টর্চই তো প্রভাস্বর, কুয়াশায় জেগে উঠে পৃথিবী দেখায়।

কিন্তু এসব জেনে আমি কী করব। এরা কি কখনো পশুশিকারের কাজে লাগতে পারে। এরা কি বসন্তে হারিয়ে যেতে শিখেছে, হিম থেকে উষ্ণ নিতে কিংবা রাত্রি হলে স্মৃতি-বিস্মৃতির চক্রে পশুরক্ত কীভাবে জবাফুল হয়ে জমে ওঠে– পেরেছে কি সেই কথা বুঝে উঠতে।

পি য়া স ম জি দ

তারায় পাওয়া

স্বপ্নের ভেতর কত জলাভূমি, দাহপথ।
বিজন স্বপনমহলে নিত্য আসা-যাওয়া
তবু পাইনি অগ্নি

পাইনি ভেলা

খিড়কি আর সিংহদরজায় দিনরাত বাঁধা থাকে
শুধু এক রক্তরথ।
এই উড়ন্ত নাও দিগ্বিদিক ঘুরেফিরে থামে যেখানে
তা তো নীলিমার রেশমি সমাধি।
সে সমাধির এককোণে ফুটে আছি ফুল;
বাস্তুচ্যুত, স্বপ্নহীন।

দূর সমুদ্রও ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না
আমার অপজন্মের ঢেউ।

কবি

তমসা মিনার ফেটে
বেরিয়ে গেছ।
আরো উঁচু আঁধারের
উড়ন্ত চুম্বনের
পিছু পিছু গেঁথে
এখন শুনছ
ফুলের স্বর।
নিরক্ষর তুমি;
এই গন্ধভাষায়
জরিপ করো স্বপ্ন।
রাত্রিভর
নক্ষত্রকল্লোলে

নিহত তুমি
আবার জ্বালাও মোম
সমূহ শবের উপকূলে ।
যেহেতু,
যুক্তাক্ষরময় পৃথিবীতে
তুমিই একমাত্র
সোজাসাপ্টা ব্যথা ।

কোমলগান্ধার

রাত্রি ।
মরুভূমি ছেড়ে যাই
ওই দূর
মালিনীর
অববাহিকায় ।
তার জলে
হাঁস হয়ে ঘুরে বেড়ায়
আমার দগ্ধ চৈতন্য ।

ভোর
এখন মালিনীই
মূলত মরুভূমি ।

অমলজীবন

চিঠি আসে
লালসবুজনীল
কত রং খামের ।
সুধাময় একটি
চিঠির প্রতীক্ষায়
বুড়ো ডাকঘর আমি;
এখনও
ঘুমোইনি ।

পরিবাস্তবতা

মোমপথের রেখা ধরে
গলমান কত বন!
রূপের মাটি শুষে নেয়
সেই গলিত সবুজ।

পৃথিবীতে তখন
অন্ধকারের অফুরান ঝনৎকার
আর সমূহ শিল্পকে তুড়ি মেরে
একগুচ্ছ রাতকুকুরের
তেতে ওঠা গান।

অদূরে সমুদ্র;
তিরিশ বছরের দাবদাহ-ঢেউয়ে
নাও ভাসিয়ে দেখি
ওই তো একলা আমার
কালিন্দীর কূল।

নিমজ্জন

ওই দূর চাঁদ।
চরকা কাটা হচ্ছে;
তিন লক্ষ
চৌষট্টি হাজার বছর যাবত।

এতক্ষণে বুড়ি সেলাই করে উঠল
পুরো একটা সমুদ্র।
ডুবব।

ক্রুশকুসুম

এই ফুল কুয়াশাক্রান্তি মাঠের প্রসূন ।
যখন বেদনার ডোলগুলো ভরে ওঠে
রাগ-আনন্দীর বিচ্ছুরণে ।
ভাঙাচোরা গান-অশেষে
ভেসে চলি আমি
ঝিরিঝিরি জলের প্রপাত ।
সোনার শকুন ডালে বসে চূর্ণ করে
মালিনীর রূপচক্র!
অরণ্যসবুজ অভিশাপের রেখা
ছলকে ছলকে উপচায়
তোমার গাঢ়-ঘন নিদ্রায় ।
সব বিভাবরী শুষে
তারপর স্ফুটমান আমি
দিগন্তেরও ঊর্ধ্বমুখী
তরঙ্গচ্ছায় ।

দ্বি তী য় দ শ ক

সা য় মা হা বী ব

পৃথুল প্রহর

হঠাৎ মধ্যরাতে কখনো
ঘুম ভাঙে কোনো বেওয়ারিশ বেড়ালের
একটানা ক্রন্দনে,
ওখানে ছাইয়ের মতো রাতে ও পথে
কী এক বিষাদ-নাটিকা জমে ওঠে যেন
অবশিষ্ট চাঁদ ফসফরাসের মতো জ্বলে;
এখানে আবেশ

ছড়িয়ে থাকে সন্নিহিত শান্তির মতো– কিন্তু না,
শান্তি নয় সেটা– শান্তির ভ্রম
যত অনুভব করতে চাই
যেতে চাই গভীরে– ততই ম্লান হয়ে আসে।
হঠাৎ ঘুম-ভাঙা স্রোতে
ভেসে এলাম কোথায়– প্রশ্ন পাই মনে;
কিছু ঘণ্টার ব্যবধানে
অচেনা হয়ে গেছে চারপাশে সমস্ত কিছু
আবছায়া-অঞ্চল টেনে দিয়ে গেছে অশরীরি কে–
সময়ের সকল বেলাকে
চুরমার করে এক অঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।
          এখন মধ্যরাত
মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো জ্বলে
পার্থিব সব অবয়বে; উজ্জ্বল আঁধারের অবভাস
ম্রিয়মাণ করে দিয়েছে সব অহংকার।

চারদিক থিকথিক

এ চিঠি লিখছি দুঃখের মতো গভীর অন্ধকারে
বেহিসাব আবহাওয়া
          শীতনেই মাঘের অতিশয় রাত
বলবার কথা শেষ হয়ে গেছে তাই লেখা
এসে পড়ে। হাওয়ায় তরবারির আস্ফালন
ঘটিয়ে কে হুকুমত করে জারি;
এ তরবারি
অনেক বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছে স্বভাবজাত রক্তপাতের মতো
বিশ্বময় রাজ্যজয় শেষে নুয়ে পড়ে কাগজের কাছে
ফুলাধর– কবিতা চেয়েছে
          দিয়েছি, যখন অবাধ সময়
স্রোতের মতো ছুটেছে, শামুকের বাস্তুসংস্থান
দুলেছে প্রবাহে– দিয়েছি কবিতা তাকে
শৈবালের মতো একফোঁটা;
          কল্পময় কাব্যময় রাত্রিদিন থেকে
কীভাবে আলাদা
করি তাকে, স্রোতস্বিনী থেকে তুলে আনি দু'একটা স্রোত–

স্বরের সুষুপ্তি থেকে কিছুটা সুষমা!
চারিদিকে কবিতার প্রশমন
অপয়া তরবারি তবু
লিখিয়ে নেয় কবিতা এবং নিচ্ছে এই বেহদ্দ কথকতা
অকপটে;
নাম দিয়েছি চিঠি
সেইদিন কবে গেছে যেদিন– বলতাম আর
ঝরিয়ে দিতে হাসি– দু'চারটে বকুল ;
তিনটি হাঁস লেইকে
নিরুত্তাপ ভেসে বেড়াতো, ফোয়ারার মতো কখনো– তপ্ত শোণিত এসে একরাশ
তাপিত করতো এ মুখ। চারপাশে সবুজের বিবিধ ব্যঞ্জনা
নামজানি না গাছগুলো মেলে দিত ডানা
হারিয়ে যেতে মানা
তবু আমাদের। অবাধ আকাশে
সুতোবাঁধা ঘুড়ি– মমতা কি বাড়ে?
কেটে তো গেলই, কী থাকে হাতে– কিছু না থাকা
নাটাইসুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দৈনন্দিন
সময়গুলো পাড়ি– থামে না কিছুই
শুরু যদি চলা; যেমন লিখছি
কবে থেকে চিঠি– বাতাসকাগজে
ধূম্রজালকফি উড়িয়ে নিচ্ছে দূরে
ফিরিয়ে আনছে আবার
জড়িয়ে রাখছে
এমন বেষ্টনী ঘন হয়ে আসে
থিতিয়ে পড়ে রাত, পৃথিবী বলতে যেন কিছু নেই
ছিল না কখনো, শুধু কবিতার কাঁধে থেকে যায়
পরম নির্ভরতা
চিঠির জড়তা
কুয়াশার মতো এখানে সেখানে
কার্নিশে– বালিশে– ; যাত্রীছাউনির ফ্যাকাসে অন্ধকারে
স্থির ঝুলে থাকে। দুঃখ পেয়ে কখনো
ঝরে যায় শিশির
কয়েক ফোঁটা। পোড়া তরবারি
কীসব ঘটায়, বিবরণী চায়, কবিতা টবিতা
দিচ্ছি না তাকে। শুধু এই চিঠি– বাতাসকাগজে
ধূম্রজালকফি উড়িয়ে নিচ্ছে দূরে

জীবন
জীবন নয়, ভাসমান তারকালোকে
এলায়িত একটি চিতাবাঘ

সিল্ক রুট

হাসি ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে যেটুকু প্রজ্ঞা
প্রয়োজন তার অধিকাংশ প্রস্তর থেকে পেয়েছি। প্রস্তরমাত্রই যেহেতু
প্রস্তরফলক নয় সেহেতু দিগন্তব্যাপী মেঘের ধারাভাষ্য,
মনের পূর্বাভাস দিতে পারে না কোনো আবহাওয়া বিভাগ–
এদিকে শুটিং প্র্যাকটিসে
বরাবর বিজয়ী তুমি বারবার হত্যা কর নিজেকে, কী করি আমি–
আমার বাইফোকালজন্ম, ভেন্টিলেটরহীন কবিতায় হাসফাঁস
ভালোবাসার অধিক তৃষ্ণায়
ছটফটিয়ে ওঠে খাঁচা, আমাদের মধ্যকার সিল্ক রুট
থিতিয়ে আসে

বহুদিন পর তুমি কিছু বলো
আমি বলি : ওহ! সেই অদ্ভুত রূপকথা–

সেঁ জু তি শু ভ আ হ্ মে দ

ফিরে ফিরে আসি

বুনোফুল তোমার কাছে

এক মোহনীয় খুব সাধারণ বুনোসৌরভ
কিভাবে প্রকট অসাধারণত্ব লাভ করে আমার ভেতর ।

ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভাবনায় ও ভালোবাসায়
এমনকি আমার সমস্ত সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় চেতনায়
গভীর প্রকোষ্ঠে অমোচনীয়ভাবে সঞ্চিত হয়ে গেছে
বুনোফুল, তোমার স্বকীয়তা ।

আমি আসব না আমাকে আসতে হয় অবশ্যম্ভাবী
বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথ মাড়িয়ে কাঁটাবিদ্ধ হয়ে হয়ে
যে পথে ফিরে গেছি তোমার কাঁটার সূচালো যন্ত্রণা বয়ে ।

ঠাস বুনোটের আড়ে আড়ে যে আরণ্যক সৌন্দর্যে
রঙবেরঙের সমাদৃত বুনোফুলদের উৎসব উদ্‌যাপনে
কখনো ভিড়ে যাই অভিমান ক্লিষ্ট আবেগীয় তাড়নায়
আবার ফিরে আসি আসতে হয় তোমার কাছে;
এইসব অকারণ ফেরাফিরিতে যে পথে নামতে হয়
তাতে বান্দরহোলা আর বিছুটি পাতার কী যে ভয়ানক
হুমকি, তুমি যদি জানতে একটিবার...

একদিন তুমি আমার নও

কোন এক হেমন্তে তুমি দেখতে পাবে
আমার গোলাভরা ধান হয়েছে
লাল নীল প্রাসাদ উৎসবে আতশবাজি
দেখতে পাবে তুমিই শুধু আমার নও

একদিন রুপোর মতো পূর্ণচন্দ্রালোকে
বিবর্ণ মাটি তৃণের সবুজে শোভিত হবে
একদিন তুমি হবে না ।

একদিন জোয়ার-ভাটার আদি কারুকাজ
থেমে যাবে নোঙর করা জাহাজের মতো
হয়তো সেদিনও থাকবে চাঁদের প্রবল আহ্বান
সেদিনও কথা থেকে যাবে কালো মেঘে ঢাকা

তোমার কাতান শাড়ির একটু ভাঁজ ভাঙার ছলে
তোমার নগ্ন পায়ে ধুলোর আঁচড় লাগার ছলে
যে তুমি কপট চোখে দাঁড়িয়ে আছো ঘাটের ওপারে
সে তুমি খুঁজে পাবে–একদিন তুমি আমার নও ।

প্রেমিক ও বিদ্রোহী

প্রেমিক আর বিদ্রোহী একই কথা
পাশাপাশি ফুটে থাকা স্টেনগান আর গোলাপের
যে কোনো একটি ছিঁড়লেই সে বিদ্রোহী হবে ।

বিদ্রোহীও পারে চাঁদ দেখে ক্ষুধা নিবারণ করতে
প্রেমিক পারে রণপায়ে ছুটতে রণাঙ্গন

আমি প্রেমিক কিংবা বিদ্রোহী কোনো দলেই নই
সারারাত ধরে মরুময় সমুদ্রের সাথে কথা বলি
জল সবুজ আর নীল উধাও, বালুচরের খেলা শুধু ।

আকাশ হারিয়ে বসে আছি কবে থেকে
রঙ্গনের পাপড়িগুচ্ছও হারাবার পথে ।

শিহরিত লিলুয়া বাতাসের স্পন্দন কানে বাজে
ঝরনার অদৃশ্য শোরগোলের ধারা নামে
বিদঘুটে স্বার্থের পিচ্ছিল ভালোবাসা ভারা ভারা
অন্ধকার বাতাবরণের সিম্ফোনি দেখি ঐ
লাল লিপস্টিকে নটীর মতো যুবতীর ঠোঁট খোলে
আমার তালাবদ্ধ ঠোঁটের কপাট খোলে না আর ।

গুলিবিদ্ধ গানের পাখির ছটফট মৃত্যু দেখি
ওটাকে রান্না করে খাই না, কবরও দেই না
আমি যে বিদ্রোহী বা প্রেমিক–কোনো দলে নই

দুইয়ের মাঝামাঝি একটা কিছু অথবা দুইয়ের বাইরে ।

সঙ্গমরত জুটির উপর খড়্গহস্ত ওঠে না আমার
প্রেমের স্বার্থে যা করতে হয়, বিদ্রোহের স্বার্থেও ।

শূন্যের সাথে পঙ্‌ক্তির গুণন

তখন বসন্ত ছিলো কিনা মনে পড়ে না
উঠোনের একপাশে ডেউয়াগাছটা সবুজ পাতায় ছেয়ে গিয়েছিল
তখন, শৈশবে, আমার সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিলো
আমার পিতা আমার জন্য উত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন
এবং আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম ।

সেবার আমার মৃত্যু হলেই ভালো হতো কেননা
ভীতিকর মৃত্যুযন্ত্রণাটা শুধু অতীত জীবনটাকেই
কষ্ট দিতে পারতো এবং বর্তমান জীবনটা সে যন্ত্রণা থেকে
বেকসুর খালাস পেতো । তা আর হয়নি । তারপর
কতবার পাণ্ডুরোগ হলো জলবসন্ত হলো–মরলাম না ।

মৃত্যুযন্ত্রণাটাকে, সেইসব ব্যারামের অছিলায়, শৈশবের
ঘাড়ে চাপাতে না পেরে আফসোসে জ্বলে মরছি এখন ।
একজন হতাশাবাদী না হলে আত্মঘাতী মনোভাবে
উজ্জীবিত না হলে কিংবা মর্মান্তিক বেদনায়
আত্মাভিমান ক্লিষ্ট না হলে বর্তমানে কিছুতেই
কেউ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছে করে না ।

তবুও, এই স্বাভাবিক অবস্থায়, এখন এই মুহূর্তে মরতে চাই
আমি মরবো আমাকে মরতেই হবে এবং তা এখনই
যাতে করে ভবিষ্যতে আফসোসের পুনরাবৃত্তি না হয় ।

তাহলে কি বর্তমানে মৃত্যুযন্ত্রণা গ্রহণ অপেক্ষা
'ভবিষ্যতের আফসোস' ঘোচানোকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছি?
মৃত্যুযন্ত্রণাটাকে মনে করি এক একক অর্থঋণ যা দিয়ে
কেনা হয়েছিলো জন্মনামক একটি উপযোগযুক্ত অবস্তু ।

এই মৃত্যুযন্ত্রণাটা বা এক একক অর্ধঋণকে এই মুহূর্তে
পরিশোধ করতে পারি আর পারি জীবনের শেষ মুহূর্তটিতে
তাই আমি এখন এই মুহূর্তে মরতে চাই না আমি মরবো না
আমাকে মারা যাওয়া যাবেই না এবং তা আমৃত্যু ।

অনির্দিষ্ট কালের জন্য প্রদেয় বিনাসুদ অর্থঋণ
অনির্দিষ্ট কালের পরিবর্তে বর্তমানে পরিশোধ করতে চায় কে ।

সৌ ম্য সা লে ক

মাতৃপ্রেম

"আত্মপ্রতারক সে–
অতীতে ও ভবিষ্যতে বহু নারী তার প্রতারণার শিকার
এ পর্যন্ত প্রতারিতের মধ্যে–প্রথম তার মা, ছেলের প্রতারণায় শোকদগ্ধ"
–ইয়েভগেনি ইয়েভতুশেঙ্কো
একমাত্র ছেলে তার ভণ্ড, নষ্ট, খুনি
আদালতের রায়ে কাল তার ফাঁসি হচ্ছে
এই ক্ষোভে-দুঃখে বেচারি আজই আত্মহত্যা করেছে

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছেলেটার অভিমান হলো
'মহিলা একবারও আসলো না কেন
একটু দুঃসংবাদে আমার যে অঝোরে কাঁদতো
আশ্চর্য কিছুক্ষণ পর আমার মৃত্যু হবে'
সামান্য সান্ত্বনাহীন মরে যাচ্ছে বোধোদয় হতেই
আক্রান্ত সিংহের মতো খুনিটা এখন 'মাগো মা মা ...' বলে
চিৎকার করছে –
কিন্তু সে জানে না কত দিন পর মাকে ডাকছে

এবং এ-ও জানে না গতকাল তিনি তার অপরাধেই আত্মহত্যা করেছেন !

কালো মায়ের গল্প

বাবা বকাঝকা করছেন, আমরা ভয়ে জড়সড় দুইভাই
দাঁড়িয়ে আছি মা'র পাশে
ভুল শুধরে দিবো কিংবা প্রতিবাদে আঙুল উড়াবো
তেমন বয়স আমাদের ছিলো না
তাই নির্বিকার আমরা –এরকম বহুবার
মায়ের কালো গাল বেয়ে অশ্রু গড়াতে দেখেছি

রোজ তিন বেলা আমরা রাঁধতে দেখেছি মাকে
কিন্তু হালিমের মা'র মতো সাজতে দেখিনি কখনো
অলংকার কিংবা অনাদৃত পালকের এসব আচ্ছাদন
স্পর্শ করেনি –ও জননীর কৃষ্ণমুখ

বাবা বাইরে বেরুতেন আর তিনি চুপচাপ পিছু নিয়ে
কাচারিঘর পর্যন্ত এগিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন
তারপর সারাদিন –অস্থিরতা, অপেক্ষার শ্বাস

মা কালো –কিভাবে বাবার মন ভালো থাকবে
তাই আমরা কৈশোরেই প্রৌঢ় হয়ে উঠি
আরো শান্ত হতে শিখি –
আর আমাদের মা ছিলেন মাটি ॥

বনসাই সংস্করণ

দু'চারজন অভ্যাগত আর আমাদের ঘরবাসিরার বিনোদনে সঙ্গ দিতে গিয়ে এ্যাকুরিয়ামের মাছগুলো বেঁচে চলছে বছরকে বছর ।
পানির উদ্দাম তোড় লেগে লাফিয়ে উঠার কথা তারা ভুলে গেছে – ভুলে গেছে বুকেবুক সঙ্গকাম– তারা যেন নতুন এক বনসাই সংস্করণ!

দেখি–চলনীতি ভুলে ছুটছে একটা মাছ–মাথাটা দেহ ছাড়িয়েছে অন্যটার–ঘুরতে ঘুরতে অন্ধ হয়েছে আরেকটা মাছ। বাঁচতে বাঁচতে হাঁফিয়ে উঠেছে ওরা। মাছগুলো মরতে চায় অথচ ফাঁসিটা বাঁধবে কে–লোক নেই, বিষ নেই, মন্ত্র নেই
কী নির্মম বেঁচে যাওয়া!

নির্লিপ্ত আমার মুখেরা

শোকাতুর চোখ পেতে– নির্লিপ্ত আমার মুখেরা
লুপ্তপ্রায় গীতিকা হয়ে বাঁচে
এমন দিনকাল দেখে একটুও সাড়া নেই, ক্ষোভ নেই

প্রীতি নেই প্রভুদের নজর কুড়াতে!

কবি–নির্বাক আমার মুখেরা আছে
শরবিদ্ধ পাখিটির মতো নিজের রক্তাক্ত বুক চেয়ে
দেখে যান, একবার দেখে যান...

নি ষা দ ন য় ন

মহাযানপন্থী, তবু আমরা মায়াবতী মায়ের সন্তান

একদিন বেড়াতে গিয়ে দেখি, দুর্গাসাগরের কোলের কাছে ঝোপঝাড়ে ভাঁটফুল এ্যাশটেল বনকাঁটা আর জগডুমুরের সাথে। ফুলের পাশে ফুল ভুল করে ফুটে আছে। অকারণে ছড়িয়ে দিচ্ছে রেণুকার গন্ধমেলা। তাকে ছুঁয়ে দেখিনি, দেখতে পারিনি; অপূর্ব মুগ্ধতায়। শুধু অনুভব করেছি তাদের গায়ের সোঁদা ঘ্রাণ। আর ভেবেছি আগত

কপোত-কপোতী যদি তীর্থের কাকের মতো হেসে ওঠে বনফুলের প্রতি পাগলামি দেখে…
সারাদিন বিকেলের মতো ঘোলাটে মংলা বন্দর, ডকইর্য়াডজুড়ে লোড-আনলোড, চালান রশিদে দুর্বোধ্য অনুস্বাক্ষর। এবার বর্ষা বড় বেশি খামখেয়ালি, রোদহীন ভেজাভেজা আদুরে আর গন্ধময় বৃষ্টি যাপনে কাটে। দুপুরগুলো ফাঁকা ফাঁকা, নির্জন। পাতলা মেঘের ছাউনি চুঁয়ে ইলশেগুঁড়ির ফোঁটা, পুরাতন টিনশেড থেকে এক চিমনি ধোঁয়া ওঠার দৃশ্য; এ যেন মনখারাপ করার জন্য একঘেয়ে বৃষ্টির মধ্যে মধ্যাহ্ন।

এখানে জোড়া বেঁধে বেড়াতে আসার কথা থাকলেও একাই এসেছি কবির সাথে, কাছে। যার নিবিড় প্রেম গ্রীষ্ম-বর্ষা, বর্ষাতি ভুল করে ফেলে এসেছি উত্তরবঙ্গের প্রবেশ পথে– দাশুড়িয়া। এখান থেকে যেখানে খুশি যাওয়া যায়। অথচ যেখানে গেলে আমি প্রতিবারই দিকনির্ণয়ে ভুল করি লসাগু'র উত্তর মেলানোর মতো। যেহেতু ছোটবেলা থেকেই ভূগোল ও পাটিগণিতে ফেল করতে শিখেছি। ক্লাসে পড়া না বুঝে মাকাই হতাম আর দিদিমনিদের দিকে তাকিয়ে থেকেছি অগুনতি দিন। ও মুখে রাগ দেখেছি, আদর দেখেছি, প্রেম দেখিনি কখনো। সব দেখেছি শুধু পড়া বুঝিনি।
কখনো দ্বীপ দেখিনি, এখানে যা দেখেছি তা কৃত্রিম। খননকৃত সাগরের মাঝখানে; দ্বীপ দেখলে সত্যিই সেখানে যেতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার যেতে মোটেই ইচ্ছে করেনি। বরং নির্ভীক হয়েও ভয় পেয়েছি, আমি যে প্রেমী; লোকালয় ভালোবেসে ফেলেছি। তাই যাওয়া হয়নি, যেতে পারিনি যদি আর পথ না চিনে ফিরে আসতে পারি। আমি মহাযানপন্থী, তবু আমরা মায়াবতী মায়ের সন্তান থেকে যাই…

খোঁয়াড়ি ভাঙা

সন্ধ্যানদী ডিঙিয়ে যাওয়ার ফাঁকে মুহূর্তের মধ্যে গোধূলিমায়া কাটিয়ে জেগে ওঠে অপেক্ষাকাল; ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখা, পিছনে রেখে আসা পথের নস্টালজিয়া কিংবা কীর্তনিয়ার গান শুনতে শুনতে শ্মশানঘাটে চণ্ডালের কাছে সিদ্ধিটানার হাতেখড়ি; পর্বান্তে একছিলিম ধোঁয়ার গল্প মিলিয়ে যাওয়ার পায়তারা গেঁথে থাকে কোনো শ্মশানবন্ধুর মনে। আর হয়তো বনস্পতির ছায়ায় বসে শোনা সান্ধ্যকৃত্য, চোখের সামনে ভেসে ওঠে জলকাদায় আধপোড়া নাভিমূলবিদ্ধ বাঁশের উপরে বসে থাকা মাছরাঙা ঠোঁটের মতো পড়ে আছে বধ্যভূমির উঠান; এখানে কেউ কেউ বহুদিন থেকে বেড়াতে এসে কীর্তনখোলার কলতানের সাথে কাটিয়ে যায় নিজস্ব অপেক্ষার বিকেল। আর কোনো প্রতিবিপ্লবী বসে বসে ভাবে: চে চেয়ে আছে কিংবা আমরাই চেয়ে আছি টিশার্টের বুকে-পিঠের ঝোলানো ব্যাগ থেকে তাকানোর উদ্দেশ্যে। খুব বিক্রি হচ্ছে চে'র প্রতিচ্ছায়া, রোজনামচায় লেখা বিকেলের ভাবনাসমগ্র; নির্ঘুমরাত্রি জাগরণের স্বপ্নগ্রন্থি
সকালে ধোয়া হাসপাতালের বেডসিট সারাদিন উন্মুখ রোদগন্ধের সাথে মিথস্ক্রিয়ার জন্য গাছে বাঁধা সিনথেটিক পলিমার দড়িতে নিশ্চুপ ঝুলে থাকে প্রায় প্রতিদিন। প্রতিটি

বেডসিট অসুস্থের মতো পুষে রাখে জীবাণুর আয়ু। অথচ নদী থেকে উঠে আসা বাতাসের সাথে কী অকৃত্রিম ওড়াউড়ি করে কাটিয়ে দেয় সকালদুপুর...

মিথফুল ও মাইম

ফুটে আছে কাগজিফুলের ভিতর ফুল
কোনো ঘ্রাণ নেই, দেখতেই শুধু ভালোলাগে
প্রজাপতি-মৌমিতা ভুল করেও চায় না বসতে
ও ফুলের রেণুকায়, কেশরের ভাঁজে লুকানো নেই
কোনো বেদনা; ভুলকে ফুল আর ফুলকে ভুল
ভেবে ভুল করি, সত্যকে মিথ্যা মনে হতে থাকে
আর হয়ে যাই মুখোশের মুখ– একেকটি মাইম
অথচ মিথ্যা ক্রমশ লোকায়ত সত্য হয়ে ওঠে, যেন
ভুলের প্রতিশব্দ ময়ূরকুমারীর প্রতি মিথ্যা আখ্যান

অকালবোধন

জীবন ও মৃত্যু হেঁটে যায়, উড়তে থাকে অক্ষত সুতোয় গুণ টেনে,
গিঁটবাঁধা ঘুড়ির মতো তারা যেন অতীত আর ভবিষ্যতের কোলাজ
অস্থিরতায় জীবন; অথচ শরীরকে কেন্দ্র করে বেঁচে থাকার মকশো
জিইয়ে রাখি প্রতিদিন, মাথার উপর ছাদের কড়িকাঠ কিংবা খোলা
আকাশের স্বপ্ন নিয়ে নীল শামিয়ানার মুগ্ধতাও হারিয়ে যেতে থাকে,
স্বপের কল্পনা হারালেও কেউ কেউ কখনোই ঝরাপাতার কাছে হতে
চাই না পরাধীন; আমিও হতে চাই তাদের এক অকৃত্রিম ছাতিমবন্ধু
একদিন থাকবে না নাম মৎস্যগন্ধার মতো যোজন-বিয়োজনে
আবার হয়তো এমনিতেই মুছে যাবে মহাকালের খতিয়ান থেকে, তবু
যারপরনাই আরও কিছুদিন ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিঃশেষ হওয়ার ব্যাকুলতা
পুষে রেখে খাঁচার পাখির মতো অন্ধ অনুকরণের প্রতিযোগে সুখী হওয়া
পৃথিবীর আলো-হাওয়া আর অন্ধকারের বিমূর্ত ছায়ার যাপনে কিংবা
বাতাসের ডানায় ভর করে যেতে থাকি অভিমুখের দরজা ডিঙিয়ে
সীমানা পেরিয়ে অথবা বৃত্তের বাহিরে মরানদীর ঢেউয়ের একা হারানো...

বিবিধ ক্যারিকেচার শীত

মাতালের নেশা কেটে যায় তবু সে উড়ে বেড়াতে পারে মনের টানে
চোখ বন্ধ করে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ভেসে যাওয়া যায় কি কোথাও
ব্যাঙের রক্তপানের তিয়াসে কিংবা শীতের উষ্ণতা খুঁজতে খুঁজতে
ছুটে যায় সাপেরা। একটি ব্যাঙ খেয়ে খুব আয়েসের সাথে তারা শীতের

দিনগুলো কী সুন্দর নিদ্রালু প্রতিটি বছর পার করে দ্যায়। ব্যাঙের মাংস ও
মদপান করে কেউ কেউ কম্বলের ওমের ঘোরে কাটাতে থাকে
মতো একজীবনের বিগত এবং আসন্ন সবগুলো শীতসকালের বেডরুম

এবং গল্প

ইচ্ছাপূরণ গল্পের মতো আটপৌরে যাপন থেকে ছুটি নিয়ে ঘুমনগরীতে গিয়ে স্বেচ্ছায় কিছু দিনের অন্তরীণ অবকাশ কাটিয়ে আসা যায়। যেহেতু দুপুরের খানিকটা পর থেকে রোদ নরম হতে শুরু করে, আলো অলস হয়ে পড়তে থাকে, আরও কত সহজে নিভে যেতে থাকে প্রাণের আলো, সমাধিনগরের সেই পুরনো মন্দিরে; কী যেন হারিয়ে যায় সবার অজান্তেই, তারপরও নীরবে কাছে ঘেঁষে আসতে থাকে কুয়াশা ভেজা অন্ধকার। একমুখী পত্রবীজের খোলসে গোপন অধ্যায়ের আড়ালে পড়ে থাকে লেখাবিলের অজস্র রাতের কোলবালিশ প্রায় রাত্রিসঙ্গী খুব বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার উৎসমুখ খোঁজে, ভিতর থেকে আমার আমিদের অস্তিত্ব নতুন করে সামনে জবুথবু হয়ে দাঁড়ায়। সবাই প্রতিটি খুঁটিনাটি, প্রবণতার ঘেরাটোপ টিকিয়ে ম্লান করে দ্যায় উন্মুখ মৃত্যু, বাসা বাঁধে শরীরে তারও থাকে অসীম শক্তি, বিনির্মাণের সেতুগাঁথুনিতে– স্বপ্নকোরক মোহর। প্রতিস্থাপনে কারো কারো সামনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন জীবন ও মৃত্যু থেকে একটিকে বেছে নিতে হয় দেহদান অথবা দেহরাখার জন্য...

প্রেম অথবা অপ্রেম

শরীর ছাপিয়ে মনের লাবণ্য ছুঁয়ে যায় প্রেম, হঠাৎ বৃষ্টিতে ধোয়া বাতাসের অঘ্রানে এত সুন্দর হয়ে ওঠে। তখন শুধু মেয়ে নয় তার ক্যারিকেচার প্রেমের সুর ও আকর্ষণ ধরে রাখে, রেখা আল্পনার মতো গায়ের পুরনো জামার ভিতর লুকানো থাকে

যে আগুনের অশেষ ভালোবাসা– কী চাও তুমি পুলক না প্রেম, না-কি হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো মনের ভূগোল, উত্তর-দক্ষিণমেরুর বিমুখী মুহূর্তকেন্দ্রিক আলোড়নের মেরুনসুখ

মনপিপি

মন শুধু ছুঁতে পারেনি মন, একলা বসে সবুজ মেয়ের মতো কাঁদে,
প্রেমের মড়া ডুবে গেছে মীনকুমারীর ঋতুকালের সাথে, এখন ফাগুন
দেহের ভিতর সমুদ্রের জলসূত্রই কাছে ডাকে নদী ও নারীকে; জল আর
মনে আদিরসে জেগে ওঠে কোমল ছোঁয়ায় কিংবা কম্পানুভূতির মায়াকোষে
মিথ্যার হাত

(ধন্যবাদ ম্যাক্স ব্রড, জয়তু ফ্রানৎস কাফকা স্মরণে)

অস্তিত্বের চারপাশে জুড়ে থাকে নিজস্ব খননকৃত কল্পিত পরিখার খাদ
সুড়ঙ্গের জানালা আছে, আপাত কোনো সরলপথ নেই পেরিয়ে
যাওয়ার, জানি না আত্মকেন্দ্রিক আপেক্ষিকতার শেষ কোথায়?
কুহকের কোটরে দিগভ্রান্ত হওয়ার মহড়া দিতে দিতে বিবর্ণ হতে
থাকি আমি এবং আমরা। অতীন্দ্রিয় স্বপ্নচারিতার কবলে পড়ে থাকা
সংযমের মুখোশই অসংযমী করে দ্যায় ব্রাত্যপ্রলাপ, মনের ভিতর
ঝড় ওঠে, ওলোটপালোটের হাত ধরে লোপাট হতে থাকে মত ও পথ;
মিথ্যার মরীচিকা মুখোমুখি অঙ্কুরিত অন্বিষ্টের জিজ্ঞাসা নিয়ে, ড্রয়িং
রুমের গ্রন্থিক ভাঁড়ামো বিপথগামী 'কুকুরীয় সভ্যতার' আবর্জনা ঘেঁটে
মরুর বুকে স্বর্গ ও ঈশ্বর বিষয়ক বিমূর্ত ধারণা আয়ুর সারমেয় চিত্রকল্প
নিয়ে ঠিকে থাকে দুর্গের বাহিরে ফ্রানৎস কাফকার সম্ভার। বিস্ময়বোধের
মোমে পোড়া আলোই জন্মকাহনের সাথে শেখে স্ব-বিরোধ– ঈশ্বর খুঁজে
বেড়ানোর বিড়ালের মাতলামি কিংবা সম্পর্কের মমির মধ্যে কীটেরা ডানা
মেলে ওড়ে; তীর্থযাত্রার মতো লোকাতীত নিনাদ নীরবে নীলিমায় মিলিয়ে
যায়, শুধু নীলরস গোপন আবরণ খুলে দ্যায় মৃত দৃঢ়তার কাছে, নৈঃশব্দ্য ও
নির্জনতা নিয়ে আসে ব্যক্তিক অহমের একাঙ্কিক রিহার্সেল এবং গ্রিনরুম...

খেয়ালের গজল

প্রতিদিন আর কাটতে চায় না প্রতিদিনের গড়ের মাঠে, অপেক্ষার ঘুড়ি ওড়াই আকাশময়। স্রোতের অনুঘটক হয়েও অগুনতি মুহূর্তের খোলনলচে হারিয়ে যায় হেমন্তের শিশিরের কাছে, হৈমন্তিক পোড়ো মাটির বুক থেকে শাবকের আধার খোঁজে ইষ্টিকুটুম। উর্বর ধানের নাড়া প্রতীকের মতো পড়ে থাকে কিছুদিন কৃষকের মনে অথচ মেঠো ইঁদুর চিনে রাখে ধানী রঙ। একাকিত্ব মনে করিয়ে দ্যায় উড়ালপাখি গল্পের সবাই একা। বেলাশেষে সবাই সমবাহুর মন হতে চেয়ে বিষম আর বস্তুত একমুখী, অমিল জয়রথের একালীন সারথি হয়ে যায়।

নির্বাসন আর একাকিত্ব বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের সম্পর্ক থেকে উঠে আসা প্রতিকৃতি, যার রঙের ভাঁজে পরিত্যক্ত ঘরের ধুলোর আদর মেখে থাকে রোবেনস্টাইনের গানের লিরিক ও স্মিফনির মতো একাল থেকে সেকালের ভোর। কার উজ্জ্বল মুখ, একজোড়া চকচকে চোখ; তিতিরের মতো প্রতীক্ষা ও অপেক্ষার গজল রপ্ত করে নেয় ভালোলাগা ও বাসার মূর্ছনায়। মেঘলা জলজ হাওয়ার গাড়ি দেখে কখনোই ভীত হয় না তিতির-ময়ূরের মন। একের জলপতন জন্য উন্মুখতা, আর অন্যভূমিতে মেঘডম্বুরের সাথে মেলে দ্যায় ডানার ভিতরের কারুকাজ। বিষণ্ন খেয়ালের গজল ভুলে কার্তিক গেয়ে ওঠে আনন্দনগরীর কীর্তন...

প্রতিবন্ধু

যে স্বপ্নকথা দিনে ভেবে রাখি, রাতে সেই স্বপ্ন না দেখে অন্য কিছু দেখতে থাকি প্রতিদিন।

সকালের ঘুম ভাঙার সাথে উবে যাওয়া স্বপ্নগ্রন্থি থেকে কিছুটা ভাঙরি পকেটে পুড়ে রাখি রোজ,

মুছে যাওয়া সেই স্বপ্ন যদি হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়ায় তাকে কি রঙ হারানো ফানুস মনে হতে

পারে ? গাঢ় রঙের প্রলেপে মিশে থাকা আঁকিবুকি – প্রতিদিন এসে শিখিয়ে যেতে চায় অশরীর

কৌসুলি কায়দায় স্বপ্ন দেখার নতুন কৌশল। তবু যে আলো অন্ধকার দূর না করে হারিয়ে গেল,

মুখ লুকিয়ে অন্ধকারের পেটে; সে কি সত্যি শুধু আলো, না কি আলেয়ার আচমকা ঝলকানি?

অথচ যে আলো পথের কৌণিকতা না জেনে-বুঝে ম্লান হতে থাকে আজন্মকাল; সে-ও তো কিছুটা

পথ, পথের সঙ্গে কাটিয়ে জেনে রাখে – আলো আর অন্ধকার কেউ কারো বন্ধু হতে আসে না কখনও।

পরম্পরা

ঠিকে থাকে যা কিছু অবয়বহীন – স্মৃতি হয়ে নিজের কাছে
সোনালি কিংবা পাণ্ডুর হারানো প্রচ্ছায়া, মায়াবী মদিরার ঘ্রাণ।
আর আমার মতো যা কিছু ক্ষয়ে যেতে যেতে ঠিকে থাকতে চাই
অশেষ– বিশেষ ভালোবাসার গল্প হয়ে আরও কিছু কাল; সেইসব
বিগত দিনগুলোর পরম্পরার সুর ধরে রাখো দেহাতির কথাগানে
মুখে মুখে ঘুরে ফিরে কালের মন্দিরায় – বিগ্রহ প্রতিম মন্ত্রগন্ধে
তবুও জেনে রাখা ভালো, আততায়ীর আঙুল ও চোখের ইশারায়
ভেসে ওঠে অপাঙ্‌ক্তেয় মৃত্যুবাণ – অন্ধকারের গোপন কবচপত্র।

গ ল্প

ফিঙ্গারপ্রিন্ট

....

দি প ং ক র গৌ ত ম

চোখ বুজে সাদা বোর্ডে কালো কালি দিয়ে উল্টো করে ১০০ থেকে ১ পর্যন্ত লিখেছে বহুবার। কাজ হয়নি। এই মধ্যরাতে সে যাবেই-বা কোথায়? জোছনারাত হলে না হয় কপিলাকেও ডেকে তুলতে পারত। এখনো যে ডাকতে পারবে না তা নয়, কিন্তু একটা উদ্দেশ্য তো চাই। মাত্র ঘণ্টাচারেক আগেও তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়ে গেছে শিলাবৃষ্টির মতো। তারপরও তাদের ঝগড়ার ভেতরেও একটা বন্ধন আছে। কেউ কাউকে ছাড়া পূর্ণ নয়। সংকট একটাই, বিয়ের পর কতগুলো বছর পার হল। বহু চেষ্টা করার পরেও তাদের সন্তান আনেনি।

অনিন্দ্য কপিলাকে সন্তান নিতে বারণ করেছে। অনিন্দ্যর দু'টা ভয়। প্রথমটা হচ্ছে, বাচ্চা হলে দু'জনের দূরত্ব বাড়বে, আবার টানাটানিও বাড়তে পারে। সন্তানটি যদি রোগা টিংটিঙে হয় তাহলে তো কথাই নেই। এই সংকটে না যাওয়াই ভালো।

আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, কপিলার বান্ধবী মিথিলার মৃত্যুর ঘটনা। মিথিলার স্বামী চেয়েছিল অল্প টাকায় বাবা হতে। তাই মিথিলাকে গ্রামেই রেখেছিল। মিথিলাকে যে গ্রামে রাখা হয়েছিল তার দশ ক্রোশের মধ্যেও কোনো ডাক্তারখানা ছিল না। তুষের আগুন তাওয়ায় জ্বেলে নাড়ার ঘরে বানানো আঁতুড়ঘরে রাখা হয়েছিল তাকে। পাকা ধাত্রীও রাখা হয়েছিল। কিন্তু সন্তান আলো দেখলেও মিথিলাকে বাঁচানো যায়নি। অনিন্দ্য মিথিলার সেই ফ্যাকাসে বেদনার্ত মুখখানা যতবার ভেবেছে ততবারই তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছে। কপিলার যদি এমন হয়– অনিন্দ্য'র অবস্থাটা কী হবে? কিন্তু এই গভীর রাতে অনিন্দ্য'র কেন যেন মনে হল– আবেগই সবকিছু নয়। জীবনে জীবন বেঁধে পথ চলতে গেলে আরো কিছুর দরকার আছে। আর ওই প্রয়োজনীয় দরকারগুলো আবেগের প্রবল প্রতাপে নিগৃহীত হতে হতে একদিন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। তখন করার কিছুই থাকে না। কপিলা ও তার মাঝখানে একদিন সে কোনো অস্তিত্বকে মানতে চাইত না। এমনকি ভাবতেও পারত না কোনো শিশুর কান্না তাদের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটাবে। অথচ বহুপথ পার করে আজ অনিন্দ্য কপিলার দিকে তাকিয়ে দেখছে কী নিশ্চিন্ত-নিরুপদ্রবে কপিলা ঘুমাচ্ছে। কাত হয়ে ঘুমোচ্ছে কপিলা। তার বুকের উপরে কাপড় ছড়িয়ে আছে। অনিন্দ্য দেখছে কপিলার মায়াবী অবয়ব, পেলব শরীর। নিশ্বাসের সাথে দুলছে তার বুক, বুক উঠছে বুক নামছে। আজ কপিলার পাশে একটা সন্তান খুব মানাত। এমনও হত ওই শিশুটি খুব ভোরে অনিন্দ্য'র ঘুম ভাঙিয়ে দিত। কিংবা ঘুমন্ত অনিন্দ্য না উঠতে চাইলে চোখের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিতে চাইত। আচমকা মুখে পানির ছিটা দিত!

আজ যখন অনিন্দ্য'র ভেতরে এসব ইচ্ছেরা সাইবেরিয়ান পাখিদের মতো বর্ণিল ডানা মেলে উড়ে আসছে তখন অনিন্দ্য'র আর করার কিছু নেই। এত রাতে অনিন্দ্য কী করবে? অন্ধকারের ভেতরেই সে সিগারেট ধরায়। দু'আঙুলের ফাঁকে উঁকি দেয়া সিগারেট টানতে টানতে অনিন্দ্য'র ভেতরে এক অদ্ভুত ঘটনা জন্ম নেয়। সে বুঝতে পারে তার মস্তিষ্কের ভেতরে একটা ভিডিও বাক্সের মতো কিছুর জন্ম হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র চারটা মেয়ের ছবি। ফিল্মের মতো একের পর এক তার চোখে ছায়া ফেলতে থাকে। মহুয়া, সুহি, ডিনা, সুখী। এরা সবাই একদিন তার সবকিছু ছিল। কাউকেই সে বিয়ে করেনি। অথচ তাদের শরীর জুড়ে অনিন্দ্য'র ছিল অবাধ বিচরণ। আজ কেন যেন সব ঘটনা পোস্টমর্টেম হয়ে ঢুকে যাচ্ছে তার মগজের কোষে। এর থেকে পালাবার পথ নেই। পালাবেই-বা কোথায়?

পুরুষ ও মেয়েরা কি সবাই এমনভাবে প্রভাবিত হয় এবং প্রতারণা করে? সে নিজেকে ভালো করেই জানে। তাহলে কপিলাকে কি সে অবিশ্বাস করবে? ভাবতেই সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা লাগে তার হাতে। সে হতচকিত হয়ে যায়। না, কপিলাকে এমন ভাবা যায় না। কিন্তু নিজেকে? এসব কথা কি সে কপিলাকে খুলে বলবে? তাতে যতটা ফ্রেশ হবার কথা সে ভাবছে ততটা হতে যদি সে না পারে? কিংবা ওই সাথে কপিলাও যদি কোনো কাহিনী শোনায় সেটা সে সহ্য করতে পারবে না। সে পুরুষ– সে

আধিপত্যবাদী। কোথাও অংশীদারিত্ব তার ভালো লাগে না। তার চাই পুরো মালিকানা।

আসলে মানুষ কেমন? এ প্রশ্নের মুখোমুখি হতেই তার মনে পড়ে বহু আগের একটি ঘটনা। তখন সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তাদের বাড়ির পাশেই পালপাড়া। পালপাড়ার মেয়ে গীতা মরে গেছে গলায় দড়ি দিয়ে– এ কথা চারদিকে রটে গেল সকালেই। পাশের গ্রামেই বিয়ে হয়েছিল গীতার। গীতার স্বামী বারবার শুধু যৌতুকের টাকা চাইত। বছর বছর গীতার বাবাকে এই যৌতুকের টাকা গুণতে হত। কিন্তু গীতার বাবার মৃত্যুর পর তার ভাইয়েরা যৌতুক দিতে রাজি হয়নি। এ নিয়েই বহুদিন অশান্তি চলছিল গীতার সংসারে। গীতার স্বামী হরি সরা, সাজ ছাড়া অন্যকিছু বানাতে পারত না। আর এসব তো পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন মাস গেলে আর কেউ কিনতে চায় না। শীতকালে হরি নৌকাভাড়া করে দক্ষিণ দেশে গাওয়ালে যেত। তারপর ফিরে নৌকাভাড়া পরিশোধ করে বাকি টাকা দিয়ে বছর চালাতে চাইত। কিন্তু তাতে যখন চলত না তখন সাহাপাড়া থেকে সুদে টাকা আনত। সেই সুদ বাড়ত চক্রবৃদ্ধি হারে। আর এসব নিয়ে শ্যাম সাহার গালি শুনতে হত প্রায়ই। যখনি শ্যাম সাহার টাকার তাগিদ বাড়ত তখনি গীতার ওপর বাড়ত নির্যাতন। কারণ গীতা কানে কম শোনে। হরি গীতাকে বিয়ে করে যে পুণ্য করিয়েছে গীতার বাবা-মাকে, তার ঋণ দিতে যখনি তারা অপারগ হল গীতার মৃত্যু হল তখনি। গীতাকে পাওয়া গিয়েছিল গাবগাছের ডালে ফাঁস দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায়। সবাই ভেবেছিল গীতা গলায় দড়ি দিয়েছে। কিন্তু জেলা সদরে নিয়ে যখন লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হল তখন জানা গেল গীতার স্বামী গীতাকে গলা টিপে হত্যা করে ওভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে। তার আঙুলের ছাপ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আবিষ্কার করা যায় এমন মেশিন নাকি মেডিকেলে রয়েছে।

অনিন্দ্য'র চোখে আজ বহু ছবি একে একে ভেসে উঠছে। মহুয়া, সুহি, ডিনা কিংবা সুখী– কে তার হতে পারত না? অথচ কেউ হয়নি। এ দোষ অনিন্দ্য'রই। দশ বছর আগেও অনিন্দ্য নিজের কাছে নিজেও ধরা দিত না কখনো। মানতেই চাইত না যে, তার ফেলে আসা দিনগুলোর সব ঘটনার জন্যে সে দায়ী। কিন্তু আজ সেসব সত্যকে অকপটে স্বীকার করছে স্বেচ্ছায়। অনিন্দ্য'র ভাবনাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে আর সেই ঘুরপাকের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে অজস্র ঘটনা, অজস্র সত্য।

কলেজজীবনে তার প্রথম পরিচয় ঘটে মহুয়ার সাথে। দু'জনেই তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে। ছাত্র হিসেবে অনিন্দ্য ভালো ছিল কিন্তু ভালো ছাত্রের পার্থক্যটা অনিন্দ্য'র বেলায় পুরোপুরি প্রযোজ্য। সবাই যখন পরীক্ষার নোট নিয়ে ব্যস্ত তখন অনিন্দ্য লাইব্রেরিতে বসে উপন্যাস আর কবিতার বই পড়ে বেড়াত। ক্লাস বাদ দিয়ে খেলত ক্রিকেট কিংবা মিছিলে যেত। হাতে থাকত একগাদা বই। কিন্তু পরীক্ষার আগে পার্সেন্টেজের জন্যে দু'এক স্যারের কাছে প্রাইভেট পড়ার নামে যেত। ইংরেজি পড়তে গিয়েই একদিন তার পরিচয় হয় মহুয়ার সাথে। মহুয়া অনিন্দ্য'র হাতের দামি দামি বই দেখে ওগুলো পড়তে আগ্রহী হয়ে একদিন একটা বই চেয়ে বসে। তারপর বইয়ের

ভেতরে মন ঢুকে যায়। একদিন মহুয়া বইয়ের ভেতরে এক চিরকুটে লিখে দেয় 'তুমি যে আমার'। তারপর উপন্যাস পড়া কতটুকু হয়েছিল জানা যায়নি, তবে বই হয়ে উঠছিল ডাকবাক্স। তারপর একদিন শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। এর কয়েকদিন পরেই মহুয়া নিরুদ্দেশ হল। অনিন্দ্য পরে শুনেছে মহুয়ারা দেশ ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু তার জীবনে প্রথম যে কয়লার দাগ মহুয়া এঁকে দিয়ে গিয়েছিল তা ক্রমশই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকল। মহুয়ার স্নানঘরে একদিন পুরো দু'ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল অনিন্দ্য'র। অনিন্দ্য প্রথম ভয় পেলেও সুযোগ ছাড়তে চায়নি, আর মহুয়া ছিল নির্বাক। মহুয়ার বুক, নাক, মুখ কোথায় অনিন্দ্য'র হাতের চিহ্ন নেই ভাবতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তারপর থেকে মহুয়া স্নান করেছে বহুবার বহুদিন, কিন্তু আঙুলের চিহ্নগুলো কি এতদিনে মুছে গেছে? আজ তার জানতে ইচ্ছে করে। এমন সময়ই একদিন গানের জলসায় পরিচিত হয় সুহি। অনিন্দ্য কলেজের সাংস্কৃতিক সপ্তাহে চ্যাম্পিয়ন হবার পরে তার সাংস্কৃতিক মান কতটা বদলেছিল তা বোধকরি কেউ বলতে পারবে না। তবে একদিন কলেজ ক্যাম্পাসের নির্জন কক্ষে ডেকে সুহি অনিন্দ্যকে বলেছিল– তালাতের ওই গানটা আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন? ওই যে কলেজে যেটা আপনি গাইলেন। অনিন্দ্য শিখিয়েছিল। তার এই গান শেখাতে শেখাতে তারা পরস্পরকে ছুড়ে দিয়েছিল এক নতুন রাজ্যে যেখানে মানুষ সব প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য থাকে, বিনিময়ে শুধু একমুহূর্ত উত্তাপ সম্ভোগের কাঙালিপনা করে। অনিন্দ্য তাই করেছিল। কিন্তু যেদিন ওই জেলাশহর ছাড়তে হবে মনস্থির করল তারপর থেকে ছিটকে গেল সুহি। শুধু সুহির ওষ্ঠের স্বাদ, হাতে হাত, মুখের, শরীরের মানচিত্র জুড়ে তার আঙুলের অবাধ বিচরণই স্মৃতি হয়ে রইল। ঢাকায় আসার পরে সুহিকে সে এক পত্রের মাধ্যমে অস্বীকার করেছিল। অস্বীকারের ভাষাজনিত ঘেন্নায় ও মানবিকতার এই বিপর্যয়ে যে সুহি আর বিয়ে করেনি সে খবর অনিন্দ্য জেনেছে। কিন্তু সেটা আজ শুধুই স্মৃতি।

ঢাকা এসে অনিন্দ্য দেখল নতুন এক জগৎ। এখানে রাস্তার এপারে বসে গান গাইলে ওপারের মানুষ শোনে না। যন্ত্রদানবের উৎকট চিৎকারে সব ভাবনা ভুল হয়ে আসে। জেলার অনিন্দ্য রাজধানীতে অযুত। এখানে সে ভীষণ একাকিত্বে ভুগল। আর বারবার মনে হত তার জেলা শহরে তার আধিপত্যের কথা। মানুষের একাকিত্ব কতটা সেটা স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। ক্রমশ দৈন্যদশা তাকে আঁকড়ে ধরল। এখানে কেউ কারো নয়– এ সত্য বুঝতে তার একটু দেরি হলেও ধীরে সে তার জীবিকার সংস্থান করে ফেলল। এখানে একটি দশম শ্রেণির মেয়েকে সে পড়ানোর সুযোগ পায় হলের এক বড়ভাইয়ের প্রক্সি দিতে এসে। স্কুলগামী ওই ছাত্রীর যে বোনটি কলেজে পড়ে তার সাথে ইতোমধ্যেই পরিচয় হয়ে যায় অনিন্দ্য'র। আর এক বৃষ্টির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরেই এক যাত্রীছাউনিতে দু'জনের কথাবার্তা জমে ওঠে। এভাবে ছাত্রীর বোন ডিনা অনিন্দ্য'র ঢাকার প্রথম পাত্রী। ডিনার বাবা-মা চাকরিজীবী। তারা অফিসে গেলে ডিনার সাথে অনিন্দ্যর ভালোবাসা চলত। রিকশায় বসে ডিনার চুল একদিন বাতাসে উড়ে মুখ ঢেকে গেলে অনিন্দ্য চুল সরিয়ে দিতে বিব্রত বোধ করছিল।

কিন্তু পরে চুল, মুখ হয়ে যেন তার হাত উঠে আসত জলের অধিকার নিয়ে। কিছুকাল পার হবার পরে অনিন্দ্য'র আর প্রক্সি দিতে হল না। সে-ই হয়ে গেল হাউজ টিউটর এবং পরিবারের বিশ্বস্ত লোক। এই সুযোগ নিল অনিন্দ্য। ডিনাকে সে বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু ডিনার বিয়ের প্রস্তাব এলে অনিন্দ্য একটি চিরকুট পাঠিয়ে কিছুকাল নিজ গ্রামের বাড়িতে চলে আসে। ডিনার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু একটি চিরকুট তাকে যেভাবে দংশন করেছিল তার বিষে নীল হয়ে যাওয়া ডিনাকে শেষ পর্যন্ত নাকি মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। খবর পেলেও অনিন্দ্য আর পিছু ফেরেনি। এরমধ্যে অনিন্দ্য'র চাকরি হয়ে গেল একটা বিদেশি কোম্পানিতে। চাকরিটা পেয়ে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। জীবনের বহু স্মৃতি এবং স্মৃতিদংশন থেকে নিষ্কৃতি পেতে এই চাকরিটা তার খুব জরুরি ছিল। চাকরি তার জীবনের পুরনো মানচিত্র বদলে দিলেও মহুয়া তার ভেতরে জীবনের শুরুতে যে রোদ্দুরের দহন প্রোথিত করেছিল সে দহন কমেনি কখনোই, বরং বেড়েছিল দিন দিন। গভীর রাতে ঘুমের ভেতরে নিরাপদ দূরত্বে এগিয়ে যেতে যেতে অনিন্দ্য উঠে বসত। ইলেকট্রিক পাখা তাকে শান্তি দিতে পারছে না। সে সারা শরীরে জল মেখে এসে ইলেকট্রিক পাখার সামনে দাঁড়ালেও সুখ মিলত না। রেডিও, টিভিতে তার রেকর্ডিং হয়। সে গান গায়, অফিস করে, অফিসে তাকে সমীহ করে সবাই কিন্তু মাংসের ভেতরের দহন সে কীভাবে থামাবে? রাতে তার ঘুম হয় না। আর এভাবেই একদিন তার পাশের টেবিলের সুখী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রাতে তার বাসায় গান শোনানোর। গান শুনিয়ে রাত গভীর হবার পরে অনিন্দ্য সে-রাতে আর ফেরেনি। সুখীর বাসায়ই ছিল। গভীর রাত অবধি তার ঘুম আসছিল না। সেদিন পূর্ণিমা ছিল। আকাশে তারাদের ছিল হাটবার। জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অনিন্দ্য। কিন্তু পাশে তাকাতেই দেখল নৈশকালীন পোশাকে আবৃত সুখী তার পাশেই দাঁড়ানো। সুখীর ছেলে-মেয়ে সবাই ঘুমোচ্ছে। অনিন্দ্য'র সাথে সুখীর পরিচয় চাকরিতে ঢোকার পরেই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে অনিন্দ্য'র একটা হিল্লে হয়ে যাবে তা সে বুঝতে পারেনি। প্রথমে অনিন্দ্য হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। সুখীর সাথে সে একই কোম্পানিতে চাকরি করে। দুই ছেলেমেয়ের মা। স্বামী বহুদিন প্রবাসে। মাসে মাসে টাকা পাঠায়। কিন্তু সুখী অনিন্দ্যকে আজ এই গভীর রাতে শুধু প্রশ্ন করে, অনিন্দ্য, টাকাই কি সব? অনিন্দ্য তাকায় সুখীর দিকে। চাঁদের ছায়া গিয়ে পড়েছে সুখীর ঘাড়ে, গ্রীবায়, চোখে-মুখে। ঘাড়ের পাশে সতেজ পশমগুলো যেন শুশুকের মতো বারবার চিল্কাচ্ছে। চুলের সুশোভিত বিন্যাস বেয়ে নেমে আসছে চমৎকার গন্ধ। হালকা গোলাপি রঙের ড্রেসের ভেতরে সুখীর শরীরটা কাঁচা শশার মতো মনে হচ্ছিল। বিস্মিত হয়ে ওঠে অনিন্দ্য, ওই ধারালো রূপ বিঁধে যায় অনিন্দ্য'র চোখের ভেতর। অনিন্দ্য এইবার মনে করে তার শৈশববেলা। খেজুরতলায় তারা দল বেঁধে গিয়েছিল অনন্ত ময়রাকে পোড়ানো দেখতে। সেদিন অনিন্দ্য দেখেছিল উপরের চামড়া পুড়ে যাবার পরে ডোমরা সূঁচালো দণ্ডের বাঁশ দিয়ে বারবার খোঁচাচ্ছিল অনন্ত ময়রার শরীরটাকে, যাতে সে দ্রুত আগুনে পুড়ে যায়।

অনিন্দ্য বহুদিন পর এই দৃশ্য ভাবতে থাকলেও সুখী তাকে এই ভর রাতদুপুরে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডা লাগাতে দিতে রাজি নয়। অনিন্দ্য একসময় সুখীর জ্বলজ্বলে মুখটা দু'হাত দিয়ে ধরে পূর্ণিমা চাঁদটার দিকে ফিরিয়ে ধরে। অনিন্দ্য'র স্পর্শে সুখীর শরীরে কোনো হাড় আছে বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে শরীরটা একটি মাংসপিণ্ড যার ভেতরে জ্বলছে লেলিহান আগুন। তারপর সেই পূর্ণিমার আদিম আগুনে সূর্যটা পুড়ে গিয়েছিল। এইভাবে সুখীর সাথে অনিন্দ্য'র জীবন শুরু হয়। কিন্তু সংকট বাঁধল তখনি যখন সুখীর স্বামী দেশে ফিরে আসে। সুখী স্বামীর সাথে ঘর করতে রাজি নয়। অনিন্দ্য'র অফিসেও তখন বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেছে। অতঃপর অনিন্দ্য দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। প্রথমে সেখানে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চেষ্টার ফলে সে খুশি হতে পারেনি। অনিন্দ্য'র এই পলায়ন সুখীকে ঘরভাঙনের হাত থেকে রক্ষা করলেও অবিশ্বাসের আগুন রোপিত হয় তার স্বামীর ভেতরে। এভাবে প্রবাহিত হতে থাকে তাদের জীবনের ভেলা।

কপিলাকে সে বিয়ে করেছিল ভারতে বসে। ভালোবেসে সেখান থেকেও অনিন্দ্য পালাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কপিলা কালিঘাটে নিয়ে অনিন্দ্যকে পরাজিত করেছে। কপিলা অনিন্দ্য'র এসব ইতিহাস জানে না। কিন্তু কপিলাকে ভালো না বাসা ছাড়া তার আর গতি নেই– এ বোধ ঢোকার পর থেকে সে উজাড় হয়ে গেছে। অনিন্দ্য'র ভালোবাসার তীব্রতা কপিলাকে দ্বিতীয় কোনো ভাবনার দিকে ধাবিত করেনি। কপিলার চুলের ভেতরে অনিন্দ্য আঙুলগুলো যখন চিরুনির দাঁতের মতো করে আলতোভাবে বুলিয়ে আনে তখন কোনো নারী ভাবতেই চায় না যে এ আঙুল এমন কায়দায় চুল বোলাতে অভ্যস্ত হয়েছে অনেক আগে থেকেই। অনিন্দ্য চাকরি করে, তার অভাব নেই অথবা অভাব আসে মিটে যায়। কিন্তু সেইসব মুখ আজ সবাই কেমন আছে? মহুয়া, সুহি, ডিনা, সুখী সবার বয়স বেড়েছে। তাদের চিন্তার পরিধিতে অনিন্দ্য'র অবস্থানটা কোথায়? অনিন্দ্য'র আজ তা ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

গীতার সুরতহাল রিপোর্ট তৈরির সময় যে মেশিনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নির্ণয় করেছিল, সে মেশিনের যদি প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এতকালে ঘটে থাকে তাহলে হয়তো প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে ওই মেশিন লাগালে পাওয়া যাবে অজস্র রকমের আলামত যাতে মনে হবে প্রত্যেকটি শরীরেই রয়েছে অজস্র রকমের চিহ্ন। এর মধ্যে কতটা স্নেহের, কতটা প্রতারণার, কতটা মনোদৈহিক বিপর্যয়ের সেটার ভাগ নয় নাই-বা করা গেল। কিন্তু এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, প্রতিটি মানুষের শরীরে অজস্র দাগ রয়ে গেছে এবং প্রতিনিয়ত জন্ম নিচ্ছে নিত্যনতুন দাগ। কতকাল পর্যন্ত এ দাগ জন্ম নেয়– নেবে? ক্রমশ এসব প্রশ্ন জিউসের ঈগলের মতো ছোবল হানতে থাকে অনিন্দ্য'র হৃৎপিণ্ডে।

অনিন্দ্য'র বয়স কম হয়নি। এখন আর ছলে-ছুতোয় যে-কোনো নারীর সাথে কথা বলতে তার ইচ্ছে করে না। সে বরং এড়িয়ে যায়। ছোট্ট বাচ্চা কিংবা কোনো কিশোরী বই নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে মায়ের হাতে হাত রেখে এমন দেখলে তার ভেতরে কাঁপন লাগে, তার চোখে তখন অযুত স্বপ্নভরা এক ভেলা নিরন্তর বয়ে চলে কষ্টের

পথ। কী এক দহন তার ভেতরে জ্বলে ওঠে, সে তা টের পায় কিন্তু শব্দহীন পথের সাথে মিলে-মিশে হারিয়ে যায়।

এবার অনিন্দ্য তার নিজের দিকে পুনরায় তাকায় এবং ভাবে– একটা সময় পর্যন্ত মানুষের প্রতারণা কিংবা আদিম দহনের বয়স থাকে। এ পর্যন্ত তার শরীরের ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকে। আর সেই বয়স পর্যন্তই তার বাঁচার অধিকার থাকে। এ সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয় তাহলে কি তার বাঁচা উচিত? জীবনে অজস্র ভুল, অজস্র দহন, অজস্র পরাজয় তার মগজে এসে তখন ভিড় করতে থাকে। মহুয়া, সুহি, ডিনা, সুখীরা তাকে দেখে পালাতে থাকে এমন দৃশ্য তার চোখে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। অনিন্দ্য আত্মহননের কথা ভাবতে থাকে। কী হবে মরে গেলে? সহজে মৃত্যুবরণ করার উপায় কী? এজন্য সবচেয়ে ভালো পথ হল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করা। অনিন্দ্য একটা স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজতে থাকে।

আকাশে তখনো নক্ষত্রের হাট মিলেছে। ক্যাসিওপিয়া তারাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে বিছানার ওপরে একচিলতে জোছনা এসে পড়েছে। সে জোছনায় কপিলার আবক্ষ দেখা যাচ্ছে। তার বুকে কাপড় নেই, চুলগুলোতে মুখ ঢেকে আছে, তার মধ্যেও চোখের নিচে তিলটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ঘুমের আগে অনিন্দ্য'র সাথে ঝগড়া করে কপিলা কেঁদেছিল খুব। অবোধ শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়েছিল এভাবেই। চোখে শুকনো জলের ধারা দেখা যাচ্ছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী কপিলার উন্নত বক্ষ তখনো শঙ্কাহীন নিশ্বাসের সাথে সাথে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে। অনিন্দ্য তখনো একটি স্ক্রু-ড্রাইভার খুঁজছে।

গল্পের পাঠ-প্রতিক্রিয়া

....

শাহদত হোসেন

[এ সংখ্যায় প্রকাশিত গল্পেরও গল্পকারের নাম মুছে দিয়ে এর ওপর পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক শাহদত হোসেনকে (এটি তার ছদ্মনাম)। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে তিনি গল্পটি পড়ে এর ওপর পাঠ-প্রতিক্রিয়া লিখে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। তাঁর কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞ। গল্পের সঙ্গে গল্পকারের নাম না-থাকায় গল্পকারের নাম উল্লেখ

না-করে শুধু গল্পের ওপর ভিত্তি করে পাঠ-প্রতিক্রিয়াটি লেখা হয়েছে। এতে প্রতিক্রিয়াটি গল্পকার-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। বিষয়টি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। গল্প কেমন হয়েছে এবং এর ওপর মন্তব্য/আলোচনা কেমন হয়েছে– সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপরই বর্তায়। **–সম্পাদক দ্বয়**]

ভালো গল্প। ভাষায় অভিনবত্ব না-থাকলেও। প্রচল ভাষায় চমৎকার উপস্থাপন। বহু-জীবনের অভিজ্ঞতা বয়ানে– ছোটগল্পের চেয়েও বেশি কিছু দিতে চায় যেন। উপন্যাসের আভা আছে বিষয়ের মধুতে। পাঠাভিজ্ঞতা সুখকর। মধ্যবিত্তের শিক্ষিত আধাজটিল দ্বান্দ্বিক জীবন– সবারই মনে হবে এ-তো আমারই গল্প এটি! অশ্লীলতা নেই– নিগূঢ় বাস্তবতা বয়ানে সতর্ক শরীর জাগায় এ গল্প। সেটা আবার অলীক-অসাড়ত্ব দিয়ে ঠাসাও নয়। বাস্তবতা যেমন শরীরকে এড়িয়ে হয় না– এই গল্পেও মনের চলমানতা, দ্বন্দ্ব স্বাচ্ছ্যন্দে পথ চলে জাগানিয়া গানে-গানে। ফুল ফোটে, ঝরেও যায়। কিন্তু মাঝখানের সময়টুকু কষ্ট দেয় না গাছকে, পাখিকে এমনকি দর্শককেও না। পাঠে আরাম আনে। তবে প্রেম ও সত্যিকার অর্থে কাজের গল্প হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হত যদি ভাষা আটপৌরে না-হত।

জীবন তো আর থেমে থাকে না! অনিন্দ্যেরও থেমে ছিল না। গল্পের প্রধান চরিত্র গল্পকার-ই নিজেই কি তাহলে অনিন্দ্য? বহুগামিতাকে নিরপরাধ দিয়ে এভাবে উপস্থাপন গল্পকে করেছে মৌলিক। স্বাভাবিকতায় ভাস্বর! এর সঙ্গে জুড়ে দেয়া যেত যদি রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক কিছু আধার! অনিন্দ্য যে ভারতে পালিয়ে গেল সেটি কি সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে? এমনটি হলেই ভালো হত। মাত্রা পেত।

সবমিলিয়ে পাঠ করার মতো গল্প। ভেতরে সম্পর্কের বহু-বাস্তবতা আস্বাদন করার মতো। মন যে একগামী নয়– শরীরকে ধরে-বেঁধে একগামী করা গেলেও মনকে কখনো নয়– এই গল্পটি তারই স্মারকশিল্প। আমি বলব বৈ কিছু নয়। বহুগামি বলেই ভাল নয় বরং মানুষের জীবন এমনই– ভালো গল্প, ভালো।

আলালের ঘরের দুলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩)

শা র মি ন খা ন

১

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য দেব-দেবী নির্ভর গাঁথাকাব্যের সীমায় আবদ্ধ ছিল। সাহিত্য চর্চার এ ধারা ভেঙে বাংলা সাহিত্য আধুনিকতার ছোঁয়ায় জেগে উঠে উনিশ শতকের প্রথমভাগে। এ সময় পাশ্চাত্যের রেনেসাঁ-উত্তর প্রভাব বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উনিশ শতকের প্রথমভাগ তাই বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সূচনাকাল। মধ্যযুগের দেব-দেবী, ধর্ম বিশ্বাস, ঈশ্বরবন্দনা ইত্যাদির বদলে মানুষের চিরচেনা মনোজগতের উপলব্ধি বাংলা সাহিত্যের বিষয় হয়ে ওঠে। বিষয় হয় মানুষ নিজেই। বাংলা সাহিত্যের প্রাণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠে জীবনবোধের নতুন নতুন ধারায়। মধ্যযুগের সেই গাথাকাব্য ধারায় আধুনিকতার এ নতুন ধারা প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়ায় বাংলা সাহিত্যের শিল্পরূপ বাঁক নেয় নতুন পথে। সৃষ্টি হতে থাকে বাংলা সাহিত্যের নতুন নতুন শিল্পশাখা। পদ্যভাষায় সেসব হল– মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, গীতিকবিতা, গীতিনাট্য ইত্যাদি। আর গদ্যভাষার স্বরূপতা অভিহিত হয় ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি নামে।

২

আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাংলা সাহিত্য অভিষিক্ত হয় উনিশ শতকের ঊষালগ্নে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা তার কিছু আগেই ঘটেছিল তবে তা মৌলিক সাহিত্য নয়। দলিল-দস্তাবেজ চিঠিপত্রে সীমাবদ্ধ ছিল সে বাংলা গদ্য। এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটে উইলিয়াম কেরি, রামলাল বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের মাধ্যমে। এদের হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও বাংলা গদ্য সত্যিকারের সুগঠিত রূপ পায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে। বাংলা গদ্যকে একটি শৃঙ্খলার সূত্রে বাঁধতে সক্ষম হন তিনি। বিরামচিহ্নের ব্যবহার ঘটিয়ে বাংলা গদ্যকে অমিত সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন তিনি। বাংলা গদ্য হয়ে উঠে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্য। সে জন্যেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিদ্যাসাগর 'বাংলা গদ্যের জনক'। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে অভিষিক্ত হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। এই প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যরচনা *আলালের ঘরের দুলাল* বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হিসাবে অভিহিত হয়ে থাকে।

বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি থেকে প্যারীচাঁদের গদ্যরীতিতে কিছু ভিন্ন গুণাবলি রয়েছে যা কথাসাহিত্যিকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ববহ বিষয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রধানত সংস্কৃতানুসারী ছিল বলে সাধুভঙ্গীর। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে প্যারাচাঁদ ভাষারীতিতে প্রধানত কলকাতা অঞ্চলের মানুষের ভাষার কথ্যরূপকে স্থান দিয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের সময়ে বঙ্গদেশে ইংরেজদের শাসন শুরু হলেও তখনও প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ প্রচলিত ছিল। এইসব শব্দ তিনি ব্যবহার করলেন *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসে। সেইসঙ্গে ব্যবহার করলেন সংস্কৃত শব্দ ভাঙা নতুন নতুন শব্দাবলি। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হল সাধু ও কথ্যের মিশ্রিত রূপ। এই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ভাষারীতি সেকালের অনেক পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রামগতি ন্যায়রত্ন প্যারীচাঁদ প্রবর্তিত ভাষারীতিকে 'আলালী ভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন। সম্ভবত

প্যারীচাঁদের লক্ষ্য ছিল কথ্যভঙ্গীর বাংলা গদ্যরীতির প্রবর্তন করা। কিন্তু তাতে পুরোপুরি সফল হতে পারেননি তিনি। তবে তাঁর প্রচেষ্টার ফলে বিদ্যাসাগরি রীতি থেকে যে ব্যত্যয় ঘটেছিল তাতে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগরি বাংলা গদ্যের গুরুগাম্ভীর্যের সঙ্গে যুক্ত হল লঘুতা। বলা যায় যে *আলালের ঘরের দুলাল*-এর রচনারীতি বিদ্যাসাগরি বাংলার সঙ্গে বঙ্কিমি বাংলার সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। এই যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন– এটাই প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব। এখানে এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য : 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রতি বিমুখ নবশিক্ষিতদেরকে আকর্ষণ করেছিলেন সে ভাষায় প্রাণশক্তি সঞ্চার করে আর প্যারীচাঁদ এর নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে বঙ্কিমকে উৎসাহিত করলেন এই ভাষার বিপুল সম্পদ আবিষ্কারে।'

প্যারীচাঁদ এতে পুরোপুরি সফল না হলেও তাঁর রচনা উত্তর প্রজন্মের কথাসাহিত্যিকদের সামনে যে দিক নির্দেশনা হয়ে দেখা দিয়েছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৩

প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্ম ২২ জুলাই ১৮১৪। জন্মস্থান : কলকাতা। তিনি ছিলেন 'হিন্দু কলেজ'-এর ছাত্র। সেই সূত্রে তিনি ছিলেন ইয়ংবেঙ্গলদের একজন, অর্থাৎ 'স্বাধীন চিত্ত ও মুক্ত মনের অধিকারী' মানুষ। অবশ্য সেকালে ইয়ংবেঙ্গলদের একাংশ উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল বলে ডিরোজিও'র শিষ্যদের ভালো চোখে দেখা হত না। প্যারীচাঁদ সেই গোত্রের ছিলেন না; বরং তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল এর ঠিক উল্টো ধরনের। 'হিন্দু কলেজ'-এ তিনি ভর্তি হয়েছিলেন ৭ জুলাই ১৮২৭-এ আর অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন ১৮৩৬-এ। ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন কৃতী। ১৮৩৬-এ ক্যালকাটা লাইব্রেরির সাব লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়ে যায় তাঁর কর্মজীবন। ১৯৪৮ সালে লাইব্রেরিয়ান পদে উন্নীত হন। বেশীদিন এ চাকরি করেননি। এর পরে নিয়োজিত হয়েছেন বিচিত্র ধরনের পেশায়। তাঁর একনিষ্ঠতা ও শ্রমের ক্ষমতা ছিল অনুসরণীয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সব সাফল্যের উৎসই ছিল এই একনিষ্ঠতা আর শ্রমক্ষমতা। নানা ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও প্যারীচাঁদ নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে রাখতেন। লাইব্রেরিয়ান থাকাকালেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন প্যারীচাঁদ। এক পর্যায়ে ব্যবসার জন্য পদত্যাগ করেন। তবে কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য আজীবন কিউরেটর ও কাউন্সিলরের মর্যাদা দেন। প্রথমে তিনি ১৮৩৯ সালে 'কালাচাঁদ শেঠ এন্ড কোম্পানি'তে আমদানি-রফতানির কাজ করেন, পরে তাঁর দুই পুত্রকে নিয়ে 'প্যারীচাঁদ মিত্র এন্ড সন্স' প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীন ব্যবসায়ে নামেন। 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল কোং লি.', 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কোং', 'হাওড়া ডকিং কোং লি.' ইত্যাদি বিদেশি কোম্পানির ডিরেক্টরও ছিলেন প্যারীচাঁদ। এছাড়া ছিলেন 'বেঙ্গল টি কোং' এবং 'ডারা টি কোং'-এর ডিরেক্টর।

যে সব সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তিনি নিয়োজিত ছিলেন তার মধ্যে 'দি সোসাইটি ফর দি একুইজিশন অব জেনারেল নলেজ'-এর যুগ্ম সম্পাদক, 'দি বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এসোসিয়েশন'-এর অবৈতনিক সম্পাদক (১৮৫১), 'বিটন সোসাইটি' (১৮৫১), 'দি ক্যালকাটা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি

টু এনিম্যালস' (১৮৫১)-এর যুগ্ম সম্পাদক, 'এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সোসাইটি অব ইন্ডিয়া'র সদস্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব সংগঠনের তিনি নামমাত্র সদস্য ছিলেন না। সংগঠনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য প্রচুর শ্রম দিতেন। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর সাহিত্যকর্মের জন্য, আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থটির জন্য। প্যারীচাঁদের অন্যান্য রচনাগুলো হচ্ছে সমকালীন জীবনকে উপজীব্য করে রচিত সামাজিক নক্সাজাতীয় রচনা 'মদ খাওয়ার বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়?', 'আধ্যাত্মিকা', 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা', 'ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত্র', 'গীতাঙ্কুর', 'কৃষিপাঠ', 'বামাতোষিণী' ইত্যাদি। প্যারীচাঁদ রচিত গ্রন্থ সংখ্যা উনিশটি। এর মধ্যে বাংলায় লেখা হয়েছে এগারটি। তবে এসব রচনাগুলোর মধ্যে আর কোনোটিই *আলালের ঘরের দুলাল*-এর মতো তাৎপর্যপূর্ণ রচনা হয়ে উঠতে পারেনি। আলালোত্তর রচনায় ক্রমশ তিনি আধ্যাত্মিকতার পথে চলেছেন এবং ভাষার ক্ষেত্রে কথ্যরীতি থেকে সরে গিয়ে ক্রমশ সাধুরীতির প্রতি সমর্পিত হয়েছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে।

৪

আলালের ঘরের দুলাল প্যারীচাঁদের প্রথম রচনা; বাংলা সাহিত্যেরও প্রথম উপন্যাস। এটি প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল রাধানাথ সিকদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায়। তবে পুরোটা প্রকাশিত হতে পারেনি। *আলালের ঘরের দুলাল* উপন্যাসের দিক থেকে সম্পূর্ণ নয়। যেমন– ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কলিকাতা কমলালয়* বা *নববাবু বিলাস*-এ কথাগুলো বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্র ফুটে উঠেছে মাত্র। হানা ক্যাথরিন *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* নামে যে রচনা লিখেছেন তাও উপন্যাসের গুণাবলির দিক থেকে অসম্পূর্ণ। বইটিতে বিশেষত দুজন খ্রিস্টান মহিলার জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে যা বাইবেলের উদ্ধৃতিকণ্টকিত বলে সীমাবদ্ধ। *আলালের ঘরের দুলালই* প্রথম পূর্ণাঙ্গ সংবদ্ধ একটি কাহিনী সম্বলিত রচনা যাতে অনেকগুলো উপন্যাসসুলভ গুণাবলি বর্তমান। ফলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের ধারক হিসাবে প্যারীচাঁদ পরিচিত হন।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসের পটভূমি উনিশ শতকের কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজ। এ সমাজের একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এর কাহিনী। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে সে সময়কার কলকাতার জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিকসমূহ; যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষাজগৎ, বিচার-আচার, ইত্যাদি। সেকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সামাজিক শোষণের প্রক্রিয়া ছিল বাংলার কৃষকদের দিয়ে নীল চাষ করানো। ওই সময়ের নীল বিদ্রোহের চিত্রও ফুটে উঠেছে এতে।

আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসে বিধৃত জীবনদর্শন হচ্ছে 'ধর্ম ও নীতিহীনতাই এই উচ্ছৃঙ্খলতার মুখ্য কারণ সুতরাং আদর্শ জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যেই রয়েছে এ থেকে মুক্তির পথ'। এই জীবনদর্শনে তিনি উপনীত হয়েছিলেন 'তাঁর কালের সমাজকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে'। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজশাসনের ভার ক্রমশ হিন্দু মধ্যবিত্তদের হাতে চলে এসেছিল তাদের অর্জিত বিদ্যা এবং অর্থের কারণে। উপলব্ধ জীবনদর্শনকে মূল প্রতিপাদ্য করেই প্যারীচাঁদ মিত্র সৃষ্টি করেন এর

আখ্যানভাগ। ধনী পিতার আদুরে পুত্র মতিলাল ধর্ম ও নীতির শিক্ষা পায়নি বলে অসৎসঙ্গে পড়ে অবনতির শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে মতিলালেরই অনুজ রামলাল আদর্শ ব্যক্তি বরদাবাবুর স্নেহছায়ায় বেড়ে উঠেছে বলে সকলের স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছে। রামলালের জীবনযাত্রাকে আঁকা হয়েছে আদর্শরূপে। অবনতির শেষ ধাপে নেমে যাওয়া মতিলালের চৈতন্যোদয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে উপন্যাসের কাহিনী।

আলালের ঘরের দুলাল যে প্রথম উপন্যাস হিসেবে সফলতা পেয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কয়েকটি চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। সমাজের সব ধরনের মানবচরিত্র সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি এবং বিশ্লেষণী বৈশিষ্ট্যের কারণে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তবে চরিত্রগুলোর মধ্যে 'মতিলাল', তার সমস্ত কর্মের সঙ্গী 'গদাধর', 'হলধর', 'ধড়িবাজ মুৎসুদ্দি বাঞ্ছারাম', শিক্ষক 'বক্রেশ্বরবাবু' এবং 'ঠকচাচা' উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে 'ঠকচাচা' চরিত্র হিসেবে অসাধারণ, একেবারে রক্তমাংসের মানুষ। চালবাজ 'ঠকচাচা' এমন একটি চরিত্র যে সেকালের বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের ধূর্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিনিধি। প্রাণধর্মিতা ও জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশের ক্ষমতায় এই চরিত্র অনন্য। প্যারীচাঁদ এই চরিত্র সৃষ্টিতে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা তাঁর শিল্পরস সৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতাকেই মূর্ত করে। ঠকচাচা তার পরিবারের সদস্যদের কল্যাণের জন্যই অন্যদের ঠকায়। পরিবারের সসদ্যদের প্রতি মায়ামমতার কারণেই তার চরিত্রটি হয়ে উঠেছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। 'ঠকচাচা' চরিত্রটিকে বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম অমর চরিত্র' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে যুক্তিসঙ্গত কারণেই।

ঠকচাচী, ঠকচাচার সহযোগী বাহাউল্লাহ, বাঞ্ছারামবাবু প্রভৃতি চরিত্র সৃজনেও লেখক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। মতিলালের মায়ের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন যে মতিলালের মা একজন সংযমী চিরন্তন বাঙালি মাতৃরূপিণী নারী। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে নীতিবান বরদাবাবু, সজ্জন বেণীবাবু, আদর্শ যুবক রামলাল প্রভৃতি চরিত্র একপেশে বলে দুর্বল, 'জীবনের স্পর্শস্বাদ' নেই তাতে।

ঘটনা সংগঠন, চরিত্র সৃষ্টি, জীবনের ইতিবাচকতার আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তববোধ *আলালের ঘরের দুলাল* কে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থটি 'আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি'।

সা ক্ষা ৎ কা র

....

ই ফ তে খা র মা হ মু দ

প্রশ্ন

দেশি পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলুন।

মাকসুদুল

এর আগে আমরা তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করেছিলাম। কারণ, বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চাষ হওয়া পাটের সিংহভাগই তোষা পাট।

প্রশ্ন

কত দিনের মধ্যে আপনারা কৃষকের হাতে পাটের নতুন জাত পৌঁছে দিতে পারবেন?

মাকসুদুল

এ ধরনের গবেষণার ফলাফল পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে সময়সীমা বেঁধে কাজ করা কঠিন। তবে এখন পর্যন্ত যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাতে আশা করা যায়, আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে আমরা নতুন ওই জাত পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করতে পারব। সবকিছু ঠিকঠাকমতো চললে কৃষকের হাতে নতুন জাত পৌঁছে দিতে সর্বোচ্চ চার-পাঁচ বছর লাগতে পারে।

প্রশ্ন

কিন্তু পাটের এখন দুর্দিন যাচ্ছে। কৃষক এখনই যা উৎপাদন করছেন, তার ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না। নতুন জাত চাষের ক্ষেত্রে তারা কি আগ্রহ পাবেন বলে মনে করেন?

মাকসুদুল

আমাদের কাজ কৃষকের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে নতুন জাত উদ্ভাবন করা। আমরা দেখেছি, ছত্রাক ও পোকার আক্রমণে কৃষকের ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পানির কারণে কৃষক পাট পঁচাতে পারেন না। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে অতিরিক্ত লবণাক্ততার কারণে পাটের চাষ করা যায় না। আমরা এই সমস্যাগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী জাত উদ্ভাবনের চেষ্টা করছি।

একই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য থাকবে পাটের জাতের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্যগুলো যুক্ত করা, যার চাহিদা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রয়েছে। যেমন: দেশের বস্ত্রশিল্পে কাপড় তৈরির উপযোগী সুতা পাট থেকে উৎপাদন করা যাচ্ছে না। আমরা চেষ্টা করছি, পাটের আঁশকে আরও সুক্ষ্ম ও শক্ত করা যায় কি না, যা থেকে উন্নতমানের সুতা উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন

কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে কি পাটের সেই চাহিদা আছে? চাহিদা তো দিন দিন কমছে।

মাকসুদুল

চাহিদা কমার বড় কারণ পাটের ব্যবহার শুধু বস্তা, রশি ও অন্যান্য শৌখিন দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু একটি পরিবেশসম্মত কৃষিপণ্য হিসেবে বিশ্বে পাটের বিশাল সম্ভাবনা আছে। বাংলাদেশ সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার নেতৃত্ব দিতে পারে। তবে এ জন্য আমাদের শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদেরও প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রশ্ন

কীভাবে সেই প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব? তা কি নেওয়া হচ্ছে?

মাকসুদুল

পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের পূর্বপ্রস্তুতি আমাদের ছিল না– এমন প্রশ্ন পাঁচ-ছয় বছর আগে কেউ যদি করত, তাহলে উত্তর নিশ্চয়ই হতো না। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই কয়েক বছরের মধ্যেই তোষা পাট ও ছত্রাকের জীবনরহস্য উন্মোচন করে দেখিয়ে দিয়েছেন, তা সম্ভব। আমরা এখন একের পর এক স্বত্ব (পেটেন্ট) পাওয়ার জন্য আবেদন করছি।

শুরুতে আমরা ভাবতাম যে আমাদের তো কৃতিস্বত্বের আবেদন করার মতো বিশেষজ্ঞ আইনজীবী নেই। আমরা তিনজন তরুণ আইনজীবীকে এ কাজের আইনি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ দিলাম। তাঁরা এখন উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা মোট পাঁচটি কৃতিস্বত্বের আবেদন করেছেন। আরও ১১টির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ফলে আমরা দেখছি, চেষ্টা ও দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করলে সব সম্ভব। জিনোম গবেষণার ফলাফলকে দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুতি আমাদের কৃষক, শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে সম্ভব। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারির ভিত্তিতে কাজ করলে দ্রুত সফলতা পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন

জৈবপ্রযুক্তি ও জিনোম গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে কত বড়? স্বত্ব পেলে আমাদের পক্ষে ওই বাজারে কতটুকু কীভাবে যুক্ত হওয়া সম্ভব।

মাকসুদুল

বৃহত্তর পরিসরে যদি বলি, তাহলে কমপক্ষে এক ট্রিলিয়ন (এক লাখ কোটি) ডলারের বাজারে এটি। জিনোম গবেষণার ফলাফলগুলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়ে যেতে পারলে সেটা আরও কয়েক গুণ বাড়বে। নতুন ধরনের এনজাইম তৈরি হচ্ছে।

আমরা যে এনজাইমটির জীবন প্রক্রিয়া জানতে পেরেছি, তা বিশ্বের এনজাইম বাজারের চাহিদার ২০ শতাংশ মেটায়। স্বত্ব পেলে কয়েক হাজার কোটি টাকার ওই বাজারে বাংলাদেশ অংশ নিতে পারবে। ছত্রাকের ওপরে যে কৃতিস্বত্বগুলোর জন্য আমরা আবেদন করেছি ও আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তা পেলে আমাদের অর্থনীতির চেহারাই বদলে যাবে। কেননা, ওই বিষয় নিয়ে বিশ্বের যেখানেই যাঁরা গবেষনা করবেন, তাঁদের বাংলাদেশকে স্বত্ব বাবদ অর্থ দিতে হবে। ফলে এই গবেষণাগুলোর বহুমুখী অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন

কিন্তু জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য নিয়ে বিশ্বজুড়ে তো অনেক বিতর্ক রয়েছে। এর পরিবেশগত ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা আছে। জিনোম গবেষণা এ থেকে কতটুকু মুক্ত?

মাকসুদুল

মনসান্টোসহ বিশ্বের অনেক বড় বড় কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বিশ্বের অনেক দেশেই আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে। জিনোম গবেষণার মাধ্যমে যে ফসল ও পণ্য তৈরি হবে, তাতে আমরা প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অর্থাৎ, আমরা জাত উদ্ভাবনের সময় প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় রাখি, যাতে ওই জাতটি বেড়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন

আপনারা একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ওই গবেষণাগুলো করছেন। তারও একটি মেয়াদ আছে। এই গবেষণা ও উদ্যোগগুলোকে টেকসই করতে কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল

আমি মনে করি, আমাদের এই জৈবপ্রযুক্তি গবেষণা কেন্দ্রটিকে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। লক্ষ্য পূরণের জন্য একে একটি জাতীয় জিনোম গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি নিজে যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের একটি গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছি। এই কেন্দ্রটি স্থাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, তা আমরা কয়েক বছরের মধ্যেই ফেরত দিয়েছি। আট বছর ধরে ওই কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। নিত্যনতুন গবেষণা করছে, গবেষক তৈরি করছে।

বাংলাদেশেও এটি সম্ভব। সরকার আমাদের প্রকল্প বাবদ যে অর্থ দিয়েছে, আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে নিজেরা উপার্জন করে ফেরত দিতে পারব। আমাদের এই কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল ও দক্ষতাকে কাজে লাগানোর জন্য অনেক ধরনের প্রস্তাব ইতিমধ্যে আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। ফলে আমরা আত্মবিশ্বাসী এই গবেষণা কেন্দ্রটি আগামী দিনের বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার নতুন পথের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। সে ধরনের বিজ্ঞানী আমরা ইতিমধ্যে এখানে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি।

প্রশ্ন

এর জন্য কী প্রয়োজন?

মাকসুদুল

আমাদের এই গবেষণা কেন্দ্রটি নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কোনো একটি ফলাফল পাওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্ত এলেই আমরা জাতির সামনে তা তুলে ধরছি। আমাদের এই গবেষণার ফলাফল দেশের সব মানুষের। দেশের সর্বস্তরের সব মানুষ আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়েছে, আমরা তা জাতিকে গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে ফেরত দিতে চাই।

উৎস: দৈনিক প্রথম আলো, ১৯/৮/২০১৩

বাউল তত্ত্ব

আ হ ম দ শ রী ফ

মৈথুনতত্ত্ব ও টোটেম-বিশ্বাস অতি প্রাচীন। দুনিয়ার তাবৎ জাতির আদিম বিশ্বাস ও জীবনচর্যার সঙ্গে এ দুটো জড়িত। টোটেম-বিশ্বাসের একটি পরিচায়ক হচ্ছে পশু-পাখির নামানুসারে গোত্র ও ব্যক্তির নাম গ্রহণ। এটি আমরা প্রাচীন ভারতে যেমন দেখি, তেমনি অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যেও পাই। ১ মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে প্রধানত কৃষিজীবী সমাজেই– বিদ্বানদের মত এই। তার কারণ মৈথুন ও প্রজনন প্রাচীনকালের চেতনা অনুসারে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছিল। ২এবং ধন-উৎপাদন ও সন্তান-উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতার ধারণা থেকেই মৈথুনতত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়। এই জন্যে মৈথুন-ক্রিয়া ও উৎসবের সঙ্গে ফসলের সম্পর্কটা ঘটিষ্ঠ। জাভা, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি আদিবাসী অঞ্চলে এবং ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মু া, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতির মধ্যে আজও মৈথুন-উৎসব বিদ্যমান। ৩এ হচ্ছে ফসল প্রাপ্তির বাঞ্ছায় সিদ্ধির আবহ সৃষ্টির প্রয়াস। আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আজও অনাবৃষ্টির সময়ে ছেলেমেয়েরা কুলো নিয়ে ঘরে ঘরে পানি মাগে। তখন যেসব ছড়া আওড়ায় তাতে আছে ‘কলাতলে এক গলা পানি, বৌ নাইয়রের নৌকা আনি’ ইত্যাদি। এতে বোঝা যায়, প্রবল বারিপাত জাত পরিবেশটা এরা কল্পনা করে, এবং তা-ই উচ্চারিত হয় বৃষ্টির আগমনী গানে। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুনের এমনি প্রতীকী আবহ সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। R. Briffault তাই বলেন :

> The assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing women is universal ... the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality. ৪

James Frazer-ও বলেন :

> In the opinion of those who performed them (ceremonies) the marriage of trees and plants could not be fertile without the real union of the human sexes ... ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still or were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of similar practice. ৫

G. Thomson-ও বলেন :

> The desired reality is described as though already present. ৬

এ বিশ্বাসের আরো একটি দিক রয়েছে। 'পৃথিবীর পিছিয়ে-পড়া মানুষদের মধ্যে আজও এ বিশ্বাস টিকে আছে যে, নারীদেহ থেকেই আদি শস্যের উদগম হয়েছে। ৭ আমাদের দেশেও এ বিশ্বাস চালু ছিল তার প্রমাণ রয়েছে মার্কে য় পুরাণে, আর আভাস আছে অনেক ক্ষেত্রে। মার্কেয়ে পুরাণে দেবী বলেছেন :

ততোহহম খিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভ বৈঃ।
ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টৈঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদাযাস্যাম্যহং ভূবি ॥৮

[অনন্তর আমি নিজদেহ উদ্ভূত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে যত দিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন জগৎ পালন করব। এইজন্য আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব]

এই শাকম্ভরীই দুর্গা। দুর্গোৎসব হয় শরৎকালে। এতে সেই শস্যদেবীর পূজা উৎসবের আভাস মেলে। 'দুর্গা পূজার ভিতরেই দেখিতে পাই ... একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিলম্ব, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে যে শস্যবধূ নির্মাণ করা হয়, ... এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়।' শাকম্ভরী বলেই দুর্গা অন্নদা-অন্নপূর্ণা রূপেও পরিচিতা। ৯ হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি সীলে দেখা যায় একটি নগ্ন নারীমূর্তির দুটো পা দুপাশে ছড়ানো আর তার যোনি থেকে একটি লতা বেরিয়ে এসেছে। এ নারী যে শস্যদেবী এবং ফসল যে এ দেবীর 'আত্মদেহসমদ্ভবৈঃ' তাতে সন্দেহ নেই। ১০ এ দেশের 'উমা'-ও প্রাচীন অনার্যদেবী; কেবল তা-ই নয়, এর বহির্ভারতিক অস্তিত্বও দেখা যায় :

> The babylonian word for mother is Ummu or Umma, the Accadian Ummi and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other and with Uma the mother goddess.১১

কৃষির শুরু নারীদের হাতেই। প্রসবিনী নারীরা হয়ত নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ফসল উৎপাদনী ভূমির প্রজননক্রিয়া কল্পনা করেছে। তা থেকেই মৈথুন-প্রজননে এবং প্রসব-উৎপাদনেও অভিন্ন পদ্ধতি কল্পিত হয়েছে। R. Briffault বলেন :

> The art of cultivation has developed exclusively in the hands of women.১২

G. Thomson-ও বলেন :

> Food-gathering led to the cultivation of seed in plots adjacent to the settlement and so garden tillage is women's work. ১৩

অন্যান্য বিদ্বানেরাও এ মত সমর্থন করেন। ১৪ পিতৃপ্রাধান্য অর্থে 'বীজ' প্রাধান্য, আর মাতৃপ্রাধান্যসূচক 'ক্ষেত্র' প্রাধান্য– শব্দদুটোর অভিধার মধ্যেও কৃষিপদ্ধতির আভাস রয়েছে। নারী-উদ্ভাবিত কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে নারীদেবীর যোগ থাকাই স্বাভাবিক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র 'বসুমাতা'র কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছিল। ১৫ পশুজীবী১৬আর্যেরা এ দেশে এসে কৃষিজীবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি সংক্রান্ত ও কৃষিজীবী সমাজের সংস্কারের প্রভাবে পড়েছিল বলে অনুমান করি। তাই বাজসনেয়ী, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে মৈথুন, প্রজনন, জীবন ও সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে। ১৭ ছান্দোগ্যে আছে :

> ক. 'হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হরো স্ফুলিঙ্গ (৫/৮/১)। অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয় (৫/৮/২)।
>
> খ. ছান্দোগ্যের বামদেব্য ব্রতকথায় আছে :
>
> 'যে এইভাবে বামদেব্য সামকে মৈথুন্যে প্রতিষ্ঠিত জানে, সে মৈথুনে মিলিত হয়।
>
> (তার) মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়, সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না– এই-ই ব্রত।' (২/১৩/২)১৮

এসব আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত আদিম আচার আজও নতুন তাৎপর্যে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ হয়ে আছে। আজও তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র প্রভৃতি সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। কেবল এখানেই শেষ নয়, দেবতার হাতের ডালিম হচ্ছে রক্ত তথা রজঃঋতুর প্রতীক। রজঃ আবার সিন্দূরেও প্রতীকীরূপ নিয়েছে। আর পদ্ম হচ্ছে নারীযোনির প্রতীক। ১৯

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে চেয়েছি যে, আর্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজারী ছিল। পশুজীবী২০ আর্যরা প্রকৃতি-প্রতীক দেবতা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা করেছে। আর অনার্যেরা গুণময় শক্তির পূজারী ছিল। প্রকৃতির প্রসাদ নির্ভর আদিকালের অজ্ঞ অসহায় মানুষ কল্পনাশ্রয়ী না হয়েই পারেনি। অসহায় অসমর্থের অপ্রাপ্তি-অসাফল্যের ভয় থেকেই বিশ্বাস উৎসারিত। আজও দুর্বলচিত্তে তুক-তাক ও শুভাশুভ প্রতীকের প্রভাব অপরিমেয়। নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পেলে যে-কোনো মানুষ তার প্রয়াসে ও বাঞ্ছায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে ওঠে। বাহ্য নিদর্শন ঘিরে এই যে সিদ্ধির বা অসিদ্ধির কল্পনার প্রশ্রয় তা আজও কম নয়। তুক-তাক, দারু-টোনা এবং শুভাশুভ প্রতীক, তিথি, নক্ষত্র ও দিনক্ষণের উপর কর্মের ফলাফল নির্ভরতায় বিশ্বাস আজও অধিকাংশ লোকের মনে দৃঢ়মূল। অক্ষম মানুষকে বাঞ্ছা সিদ্ধির কামনার তীব্রতাই যাদু বিশ্বাসে প্রবর্তনা দেয়। মনের এমনি অবস্থায় সিদ্ধির অনুকূল কাল্পনিক ও আচারিক আবহ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার মানুষের আদিম জীবন-জীবিকা সংস্থায় স্বাভাবিকভাবেই তাই এ মনোবল সঞ্চয়ের সহায় যাদুবিশ্বাস চালু ছিল। প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুসারে তা নানা বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয়ে আজকের দিনের সমাজে ও ধর্মে রূপ নিয়েছে।

কৃষিজীবী২১ অনার্যেরা দুনিয়ার আর আর আদিম কৃষিজীবীর মতো মৈথুন তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। নারী-উদ্ভাবিত কৃষি-পদ্ধতিতে ভূমির ফসল উৎপাদন নারীর সন্তান ধারণের অনুরূপ বলে কল্পিত হয়েছে। এ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকেই জগৎ-সৃষ্টিতেও তারা প্রকৃতি ও পুরুষের–নর ও নারী স্বরূপার মৈথুনতত্ত্বে আস্থা রেখেছে। মনোবল সঞ্চয় ও বাঞ্ছাসিদ্ধির সহায়ক আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে তারা 'মৈথুন'কে বীজবোনার শুভযোগ সৃষ্টির প্রারম্ভানুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে। পরে সমাজব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং আদিম সংস্কারও নানা তাত্ত্বিক চিন্তাযোগে কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। কালিক ব্যবধানে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন এবং জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। বসুমতী বা শস্যদেবীরূপে যেই মানস-প্রসূতার প্রথম আবির্ভাব, তিনিই আদ্যাশক্তি। তাঁর থেকেই পরম-পুরুষের উৎপত্তি। শক্তিস্বরূপা নারীর সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান তাত্ত্বিক কল্পনায় একসময় অদ্বয়, অভিন্ন বা অদ্বৈত সত্তারূপেও কল্পিত হয়, আবার দ্বৈতরূপেও তার প্রকাশ-সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয়নি। ফলে মায়া-ব্রহ্ম, শীব-শীবানী, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি আদ্যশক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। এখানেও সৃষ্টি-সম্ভব মৈথুনতত্ত্ব স্বীকৃত। মৈথুন মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এই নারী-পরুষ তত্ত্ব-ভাবনায় তথা মিলন-তত্ত্ব কল্পনায় প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কালে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং নতুন তাৎপর্য পেয়ে অধ্যাত্ম-মাধূর্যে মহৎ এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। এর বিচিত্র প্রকাশ আমরা সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্যে-লিঙ্গায়েতে দেখছি। তবু এর আদিরূপের রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, নিলগিরি, ছোটনাগপুর এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে। মৈথুন যেমন আদিতে ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তারও পরিচয় রয়েছে। ২২ J. Frazer বলেছেন :

> Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals; or he may imagine that the vigour that he refuses to extend in reproducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegetable or animal, will somehow benefit in propagating their species. Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profigacy or of asceticism,২৩

কাজেই বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন হতে বাধা নেই।

দুই

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য-মানস উদ্ভূত আদিম মত ও আচার–আজকাল একথা আর অস্বীকৃত হয় না। বাঙলা দেশ মূলত আর্য অধ্যুষিত দেশ নয়, এদেশে আর্য-অনুপ্রবেশ বেশি হয়নি। গুপ্ত ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয়, আর পাল শাসনে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়। কাজেই এদেশে অবিমিশ্র আর্য প্রভাব কোনোদিন

পড়েনি। বেলভেলকার ও রানাডে বলেন, 'যোগ আদিতে অবৈদিক সাধন পদ্ধতি ছিল।' এবং এর সঙ্গে আদি যাদুবিশ্বাসের সম্পর্কও তাঁরা অস্বীকার করেননি। বলেছেন, sympathetic magic-এর ধারণাও এর মূলে রয়েছে। ১ A. E. Gough-ও বলেন–স্থানীয় অনার্য আদিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগ সাধন-পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল। ২ H. H. Zimmer বলেন, 'সাংখ্যের তত্ত্বগুলি বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। দুইটি ধ্যান-ধারণা স্বতন্ত্র। সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সাংখ্য ও যোগের মূল ধারণাগুলি অত্যন্ত প্রাচীন ও বেদপূর্বযুগের।'৩ পাঁচকড়ি বানার্জী বলেন, 'তন্ত্র অতি প্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য।'৪ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'কৌটাল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন–সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরান, উহা মানুষের করা এবং পূর্বদেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মত নহে; বঙ্গ, বগধ ও চের জাতির কোনো আদি বিদ্বানের মত। বৌদ্ধমত সাংখ্য মত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন।'৫ বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম ও উদ্রক–দুজনই সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তও তন্ত্রকে আদিম অনার্য গুপ্তশাস্ত্র বলেছেন। ৬

এসব মতের ধারকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে লোকায়তিক বলে পরিচিত ছিল; যদিও বেদাদি সব শাস্ত্র গ্রন্থেই আমরা এসব মতের প্রভাব লক্ষ করি। তার কারণও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এও স্মর্তব্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের আচার-সংস্কারের প্রতি সামাজিক-রাজনৈতিক কারণেও উদাসীন বা শ্রদ্ধাহীন থাকা আর্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তন্ত্র সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

> Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin, it seems to be a religious under-current, originally independent of any obstruse metaphysical speculation flowing on from an obscure point of time in the religious history of India, with these practices and yogic processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological systems got closely associated in different times ... these esoteric practices (yogic) when associated with the theological speculations of the saivas and saktas, have given rise to Saiva and Sakta Tantrism, when associated with the Buddhistic speculations have given rise to the composite religious system of Buddhist tantrism, and again, when associated with the speculations of Bengal Vaisnavism the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite Cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.৭

তিনি আরো বলেন, 'বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমি ভাগ আছে। উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাংলাদেশ–হিমালয় পর্বত সংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধ হয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয় সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কি তন্ত্র বর্ণিত 'চীন' দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার 'চীনাচার' নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ট চীন বা মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার

লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীও আমাদের অনুমানের পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্গকামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনা স্থান–নেপাল-ভূটান-তিব্বত-অঞ্চলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ। ...তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষটচক্রের ...অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইলেন, ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী। ...এই ডাকিনী দেবী কোনো নিগূঢ় জ্ঞান সম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। ...ভূটানে লাকিনী ও হাকিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। '৮ দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'তন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে কৃষি কেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস এবং জাদু অনুষ্ঠান। ' তাঁর মতে 'তন্ত্র' শব্দটিও সন্তান উৎপাদন সম্পর্কীয়। ৯

সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহাত্মবাদী ও নাস্তিক মত। যোগে ও তন্ত্রে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে 'ঈশ্বর' স্বীকৃত হলেও, এসব সাধনায় ঈশ্বরোপাসনার স্থান অপ্রধান। দেহতত্ত্বই মুখ্য। এই দেহাত্মবাদী নাস্তিক মতকে ব্রাহ্মণবাদীরা গোড়ার দিকে অসুরমত বলে আখ্যাত করেছেন। ১০ গীতায় বলা হয়েছে অসুর মতে 'অপরস্পর সম্ভূত কিমন্যং কামহৈতুকম' (অর্থাৎ জগৎ নারী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত) ১৬/৮/। একে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা লোকায়ত বলে অবজ্ঞা করেছেন। সাধারণত মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, শঙ্করাচার্যের (?) সর্ব সিদ্ধান্ত সংগ্রহ, হরিভদ্রসূরীর ষড়দর্শন সমুচ্চয়, কৃষ্ণ মিত্রের প্রবোধচন্দ্রিকা নাটক, ভাগবত, বৃহদারণ্যক, গীতা, বিষ্ণু পুরাণ, মনুসংহিতা, এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির আলোকে লোকায়ত তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এসব গ্রন্থ থেকে মতবাদটির স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আসলে আদিম তান্ত্রিক, যোগী, এবং সাংখ্য মতবাদীরাই লোকায়তিক। তাই শীলাঙ্ক রচিত সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য ও লোকায়তিকে বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। ১১ তিন মতই মূলে এক এবং এমনকি গীতার আমলেও যোগ ও সাংখ্য অভিন্ন ছিল। সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব আর যোগ হচ্ছে সাধন শাস্ত্র। সাংখ্য এবং তন্ত্রের সম্পর্কও তাই। পরবর্তীকালে যোগ ও তন্ত্র দুটো ভিন্ন ধারায় যেমন চলেছে, তেমনি আবার যোগতান্ত্রিক মিশ্রধারাও সৃষ্টি করেছে। এতে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন তান্ত্রিক সম্প্রদায় যেমন পেয়েছি, তেমনি কামাচার বর্জিত বিশুদ্ধ যোগী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব দেখি। এসব মত কালে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শাখা বা উপমত রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতের অন্তর্গত হয়েও এগুলো মর্যাদা পেয়েছে। তারই জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া, সহজিয়া, নাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ঘেঁষা সম্প্রদায়ে; আর অবলুপ্ত রেশ রয়েছে সাঁওতাল, হো, পাঞ্জা, কোটার প্রভৃতির সমাজে।

তিন

আদিতে 'হিন্দু' 'সিন্ধুবাসী' অর্থে প্রযুক্ত হলেও কালে গোটা উপমহাদেশ হিন্দুস্তান এবং জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে দেশের সব অধিবাসী হিন্দু নামে পরিচিত হতে থাকে। এভাবে আর্য-অনার্য বহু উপধর্মে ও মতে আস্থাবান এক বিপুল মনুষ্য-সমাজ 'হিন্দু'–এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়। অতএব 'হিন্দু' বললে কোনো একটি ধর্মমতবাদীকে বুঝায় না। তারা জাতি অর্থে অভিন্ন হলেও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বহুধা বিভক্ত। অন্যান্য দেশে কোনো ধর্মমতে দীক্ষিত জনসমষ্টি ধর্মের বা ধর্মপ্রবর্তকের নামে পরিচিত হয়; যেমন মুসলিম, খ্রিস্টান, কনফুসিয়ান, জোরাস্ট্রীয়ান প্রভৃতি। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোনো

একজনের প্রবর্তিত ধর্ম নয় বলেই 'হিন্দু' নামের এমন ব্যাপক ও দ্ব্যর্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই এই ধর্মের উন্মেষ, বিকাশ ও বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার প্রশাখাগুলোকে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিকাশও বলা চলে। আধুনিক সমাজতত্ত্বে এই বিবর্তনের গুরুত্ব অনেকখানি। তাই W. W. Hunter বলেছেন :

> "India thus forms a great Muscum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture. The Specimens are not fossils or dry bones, but living communities."
> এখানে সত্যই fragments of a pre-historic world কিংবা remnants to our own day of the stone age মেলে। ১

হিন্দুর উপমতগুলোর বাহ্যত এক একজন প্রবর্তক থাকলেও আসলে বিভিন্ন মতের মিশ্রণে গড়ে-ওঠা প্রবল আঞ্চলিক মতবাদের তাঁরা প্রচারক মাত্র। কেননা, এগুলো মূলত ইষ্টদেবতার প্রাধান্য এবং লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যজাত উপমতই। এগুলোকে বলা যায়–বৈদিক মতের প্রশাখা। এখানে উল্লেখ্য যে ঋগ্বেদেও কোনো একক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই। বিস্তৃত কালিক পরিসরে বিভিন্ন কবি রচিত সূক্তসমষ্টিই ঋগ্বেদ বা ঋক্-সংহিতা। এ জন্যে কোনো কোনো মতাদর্শের প্রাধান্য থাকলেও ঋগ্বেদে পরবর্তী প্রায় সব মতেরই কিছু কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন তারাপদ চৌধুরী বলেন :

যে সকল ভক্তিমার্গে পরব্রহ্মেরই প্রকাশরূপে কোনো ইষ্ট দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদের সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রীতির তপশ্চর্যা, এমনকি তান্ত্রিক আচারগুলির পূর্বাভাস বেদে বর্তমান। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং মায়া সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্বন্ধে ইঙ্গিত, মীমাংসা মতানুযায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত্তা, সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা, যোগদর্শন সম্মত ইন্দ্রিয় সংযম এবং চিত্তের অভিনিবেশ এবং ন্যায়-বৈশেষিক মতানুসারে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যথার্থ বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা–এই সকলেরই পূর্বাভাস বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আত্মা, মন, পরব্রহ্ম, বিশ্বের অভিব্যক্তি, কর্ম, পুনর্জন্ম এবং মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনাও আছে। পরবর্তীকালে বেদগুলিকে যে যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই। '২

তেমনি পরবর্তী কালের মহাভারতে তথা গীতায়ও নানামতের অসমন্বিত মিশ্রণ ঘটেছে। ৩ অতএব সব কয়টি মত ও উপমতের উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং দুর্নিরীক্ষ্য ও দুর্নির্ণেয়। দেশী-বিদেশীর, শাসক-শাসিতের এবং আর্য-অনার্যের নানা ধারণা, সংস্কার, আচার, আদর্শ ও লক্ষ্যের বিচিত্র মিশ্রণে ও সমাবেশে–কখনো সমন্বয়ে, কখনো বা অজ্ঞতা প্রসূত বিকৃত প্রভাবে–সব শাখা ও উপশাখাগুলো গড়ে উঠেছে। তাই নিশ্চিত বিশ্বাসে কিংবা যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শেষ অবধি বিদ্বানে মতানৈক্য থেকেই যায়। অবশ্য যতই আলোচনা হচ্ছে, জটিলতাও ততই হ্রাস পেয়ে গবেষণার পথ খুলে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে বৈদিক বিধি-বিধান এবং ভাবকল্প একান্তভাবে আর্য নয়। পশুজীবী আর্যেরা মূলত প্রাকৃত শক্তির পূজারী এবং কর্ম ও কর্মফলে

আস্থাবান। কিন্তু কৃষিজীবী অনার্য গোষ্ঠীরা তাদের জীবিকার গরজেই ভাববাদী ও প্রতীকপ্রিয় না হয়ে পারেনি।

অনুমান করি, উর্বরা ভারতভূমির অনিঃশেষ চারণক্ষেত্র আর্যদের স্থায়ী বসবাসে প্রলুব্ধ করে আর অনায়াসলভ্য ফলমূল তাদেরকে জীবিকার ভাবনা-মুক্তির আশ্বাস দিয়ে কৃষিকার্যে প্রবর্তনা দেয়। এভাবে এ নতুন দেশে নতুন জীবিকার মাধ্যমে আর্যরা কৃষি সম্পর্কিত আচার-সংস্কারেও গোড়া থেকেই প্রভাবিত হতে থাকে। এই প্রভাবেরই স্বাক্ষর রয়েছে হয়ত বেদের বিভিন্ন মন্ত্রের নারী, অদ্বৈততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও ভাব প্রতীকী কল্পনার মধ্যে–যা সাধারণভাবে আর্য মননের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। বেদে-ব্রাহ্মণে-উপনিষদে যা আছে সবই আর্য মানস জাত, এ ধারণা তাই যৌক্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সি, কুহলান রাজা বলেছেন–সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা এবং দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবেই–'১. সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব, ২. মন্দিরে উপাসনা ও তার সঙ্গে অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অনুধ্যান, ৩. বিশ্বজগতের পরিকল্পনা ধারার মধ্যে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ, ৪. ঐশী-শক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান, ৫. ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব এবং ৬. জাতীয় মহাপুরুষ হিসেবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বে উন্নয়ন। ৪ তাঁর মতে সাংখ্য মত অবৈদিক। ৫ ভক্তির বিকাশও অবৈদিক প্রভাবজ। ৬ বেদান্ত ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জ্জীবনও ঘটে প্রধানত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় দিয়ে। 'কুমারিল ভট্ট অন্ধ্রদেশের লোক, শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কেরলা, রামানুজ তামিল দেশে আর মাধবাচার্য কর্নাট দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'৭ এবং বিষ্ণু আর শিবের শক্তিমহিমা ও ক্রিয়ার ধারণাও অবৈদিক। ৮ তাই আগম শাস্ত্রও অবৈদিক। ৯

তারাপদ চৌধুরীও বলেন, বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের 'পাশাপাশি মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ এবং ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এ বিষয়গুলির ইতস্তত উল্লেখ আছে বটে, তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ কৌশিক-সূত্র উহাদের বিষয়। সেই জন্যই এই গ্রন্থ দুইটিতে পরবর্তী তন্ত্রশাস্ত্রের সূচনা রহিয়াছে।'১০ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech ... the ideas of 'Karma' and transmigration, the practice of 'Yoga', the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa–all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, e.g. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and

the coconut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our Pre-Aryan ancestors.'১১

এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও দর্শনগুলো অবলম্বন করে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করব।

উপনিষদ

উপনিষদগুলোতে সমাজ-স্বীকৃত বৈদিক মূলতত্ত্ব, দেবতা, যজ্ঞ ও অন্যান্য আচার-বিরোধিতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য–প্রাচীন বলে স্বীকৃত এ দুটো উপনিষদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বৃহদারণ্যকে আছে–'যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দেবতার আরাধনা করে, সে দেবগণের গৃহপালিত পশুবিশেষ।'১২

পরবর্তীকালে শঙ্করও যজ্ঞাদি আচার ও দেবপূজায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ১৩ বস্তুত আরণ্যক রচনা কাল থেকেই ক্রিয়াকা বিশ্বাসী আর্যেরা ভাববাদী হয়ে উঠল। ১৪ তার ফলেই উপনিষদে যজ্ঞ ও দেবতাদির প্রতি বিরূপত দেখা দেয়। এমনকি পরবর্তী উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে যজ্ঞের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও১৫ তাতে যজ্ঞের উদ্দিষ্ট ঈশ্বর দেবতা নন। ১৬ এভাবে উপনিষদে একক ব্রহ্মবাদ বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই কঠোপনিষদ বলেন, 'পরব্রহ্মের ভয়েই দেবতারা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করে থাকে।'১৭ বৃহদারণ্যকে১৮ এবং ছান্দোগ্যেও১৯ তাই চরম কথা ঘোষিত হয়েছে–'আত্মাই ব্রহ্ম'।

মহাভারত

মহাভারতে বিষ্ণু ও বিষ্ণু অবতারের কথাই আছে। অন্য দেবতার অবতারের কথা নেই। ২০ কাজেই বিষ্ণুই প্রাধান্য পেয়েছেন এ কাব্যে। অবশ্য বৈদিক দেবমত 'উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ' এই মত গৃহীত হইল। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোগ ও সাংখ্য মহাভারতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।'২১ 'তাত্ত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাকাব্যে বিভিন্ন মতবাদ-সকলের এক অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ...মহাকাব্যে বর্ণিত তত্ত্ব-বিদ্যায় বিভিন্ন ভাবধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ...এই সকলেই প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগদর্শনের সাধারণ অঙ্গস্বরূপ ঈশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত। ...অপর দিকে আমরা পাশুপত, বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত সম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাদী ভক্তিবাদ দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উৎস হইতে তাহাদের ভাবধারা

সকল সংগ্রহ করিয়াছিল। '২২ মহাভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা 'ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত দ্বৈতবাণী। '২৩ 'সাধারণ আর্যদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইগুলি উপত্যকার অনার্য সাংস্কৃতিক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল (রুদ্র শিবের ধারণাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। ...ইহা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে-সংমিশ্রণ সম্ভবতঃ বৈদিক যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বেদোত্তর যুগেও ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। (এবং এইরূপে) বেদবিরোধী লোক-প্রচলিত ধর্মসম্মত দেব-দেবী ও আচার নূতন ব্যাখ্যা দিয়া বৈদিক ধর্মের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হইল। ... (এইভাবে) রুদ্রশিব, বিষ্ণু-নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লোকপ্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগ-প্রধান ভক্তিবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকা ও ব্রহ্মমূলক ধর্মমত নিশ্চয়ই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল। '২৪

পুরাণ

Pargitar বলেন, 'সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি (পুরাণগুলি) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী বিশ্বকোষ। '২৫ 'পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত, এমনকি সাংখ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা আছে। '২৬ পুরাণগুলোর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। সর্বপুরাণেরই সারকথা ও তাৎপর্য বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণে মেলে। ২৭ ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের ঐশ্বরিক লীলাবাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, শৈব সম্প্রদায়ের শক্তিবাদ, এবং মীমাংসা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ন করা হইয়াছে। '২৮

চার্বাক দর্শন

বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী, এ কারণে তাঁদেরকে বার্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়। এঁরা বস্তুবাদী–অধ্যাত্মবাদী নন। বেদের আমল থেকে এঁদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার আগেও যে লোকমনে এর 'জড়' ছিল, তা অনুমান করা যায় বেদে এইমতের উল্লেখ থেকে। রামায়ণের জবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেন, গৌতম বুদ্ধের সমকালীন অজিত কেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, আর ভাগুরি, পুরন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নাস্তিক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন। ২৯ এ ধারার চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মাবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো নিজ নিজ ভূতে মিশে যায়; কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। 'জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি'–এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের 'ইন্দ্রবিরোচন' উপাখ্যানে। ৩০

জৈন-বৌদ্ধমত

সর্বজীবের প্রাণের মূল্যবোধ ও জীব নির্বিশেষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই অহিংসার জন্ম। এটি মানব-সংস্কৃতির ও সংবেদনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশের পরিচায়ক, মনুষ্যত্বের এমনি বিকাশ কালের দিক দিয়ে বিস্ময়কর। আদি তীর্থঙ্কর পার্শ্ব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মহবীরের আড়াই শ বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের আগেও বহু বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছেন বলে মনে হয়। ৩১ বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল 'এক অধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ। (তখন) প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল। '৩২ হয়ত অনার্য যৌগিক ধ্যান, কৃচ্ছ্র সাধনা, জন্মান্তরবাদ, শিবপূজা প্রভৃতি অনার্য আচার-সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই বৌদ্ধমতে দেব, দ্বিজ ও বেদের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য চার্বাকরা আগে থেকেই এসবের প্রতি অবিশ্বাস ও বিরূপতা প্রচার করে চলেছিলেন। 'ব্রহ্মজাল সুত্ত' মতে বৈদিক কর্মকা বিরোধী সম্প্রদায় ছিল বহু এবং বিবিধ। এ সময়ে বিভিন্ন পন্থী তীর্থকগণ (নাস্তিক-আচার্য)—যথা, পুরাণ কস্‌সপ, মকখলি, গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, নিগন্থনাট পুত্ত, সঞ্জয়—বেলট্‌ঠ্‌পুত্ত এবং আরো অনেক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ব্রাক্ষণ্য মতবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাতেন। ৩৩ বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরাই পরবর্তীকালে সাধনপন্থ হিসেবে যোগাচার গ্রহণ করে।

সাংখ্য ও যোগ

বেদ এবং কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়নী উপনিষদে সাংখ্যসম্মত ধারণা লক্ষ করা যায়; কাজেই সাংখ্য মত নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকা খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী নয়। তবু সাংখ্য মত যে ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত দর্শন, তা নানা কারণে অস্বীকার করার উপায় নেই। আড়ার কলমের নিকট গৌতম বুদ্ধের সাংখ্য দর্শন শিক্ষা, ন্যায়সূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির সমালোচনা প্রভৃতি থেকেও এর প্রাচীনতা অনুমান করা সম্ভব। ৩৪ 'গীতায় সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। ...যোগ হচ্ছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ। যোগ ও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই। পতঞ্জলি তাঁর যোগসূত্রে ঈশ্বর রূপ যে অপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার জন্যই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য। '৩৫

আমরা ভারতিক অভিজাত শ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধারার কিছুটা পরিচয় পেলাম। এতে আমরা দেখেছি, দেশীয় গণ-মানস প্রসূত নানা মত উঁচু স্তরের মানুষের ধর্মে ও দর্শনে বারবার হানা দিয়ে নিজেদের ঠাঁই করে নিয়েছে। এবার সেই গণমানস উদ্ভূত ধর্মসংস্কার ও দেবতার পরিচয় নেওয়া যাক।

ভয় থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ভয় কিসের? ভয় অপ্রাপ্তির, ক্ষতির এবং অ-সুখের। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার ও আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা আবশ্যক তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার নাম বাঞ্ছা। বাঞ্ছামাত্রই চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধ হয় না। নিজের অসামর্থ্য আছে, আছে আরো অজানা অকারণ বাধা। এই বাধা স্বরূপ অজ্ঞাত শক্তিই অমূর্ত অরি-শক্তি; আর সিদ্ধির সহায়ক শক্তি হচ্ছে ইষ্ট-শক্তি। এই অরি-শক্তির দমন ও ইষ্ট-শক্তির আবাহন প্রয়াসই যাদু-বিশ্বাস উৎসারিত। আদি-অমূর্ত যাদু-বিশ্বাস পরে প্রমূর্ত ইষ্ট ও অরি দেবতার রূপ নিয়েছে।

এ দেশের এক দেবতা গণপতি গণেশ। ইনি ছিলেন আদিতে অরি দেবতা—বিঘ্নরাজ। ৩৬ ইনি অনার্য দেবতা। ৩৭ ভিলেরা চাষাবাদের প্রারম্ভে শিলাখে

সিন্দূর মেখে 'গণেশ' রূপে পূজা করে। ৩৮ ঋগ্বেদে৩৯ গণপতির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে গণপতি ও বৃহস্পতি অভিন্ন। লোকায়ত মতের প্রবর্তক বলে পরিচিত বৃহস্পতি ও বৈদিক বৃহস্পতি অবশ্য অভিন্ন কিনা, বলা যাবে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নগ্ননারীর সঙ্গে মৈথুনরত গনেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। ৪০ আনন্দ গিরির 'শঙ্কর বিজয়'-এর সতেরো সংখ্যক প্রকরণে আছে যে গাণপত্য মতে গণেশ বামাচারের সঙ্গে সংযুক্ত। এতেই বোঝা যায়, আদি 'মৈথুনতত্ত্ব' থেকেই গণপতি গণেশ দেবতার পৌরাণিক রূপান্তর ঘটেছে।

চার
তন্ত্র

ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের ধর্ম বা সংস্কার হিসেবে তন্ত্রের ব্যাপকতা দেখেই এক বিদ্বান বলেছেন :

> In the popular knowladge and belief they have practically superseded the Vedas over a large part of India. In all writings (Tantric writings) these female principle is personified and made prominent to the almost total exclusion of the male.১

তান্ত্রিক সাধনায় নারীর গুরুত্ব যে অত্যধিক তার সাক্ষ্য আচারভেদ তন্ত্রেও আছে :

> পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলযোষিতম্।
> বামাচারো ভবত্তত্র বামাভূত্বা যজেৎ পরাম॥

শাক্তদের সাধনাও এরূপ। R. G. Bhandarkar বলেন :

> The ambition of every pious follower of the system (sakta) is to become identical with Tripura-Sundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a women.২

সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বও এরূপ। মনীন্দ্রমোহন বসু বলেন :

> 'The sahajias also believe that at a certain stage of spiritual culture the man should transform himself into a women and remember that he cannot have the experience of true love so long as he connot realise the nature of women in him.৩

এখানে বৈষ্ণবের রাধাভাব ও গোপীভাব স্মর্তব্য।

তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি। ৪ সাংখ্যেও তা-ই। 'বাচ্যবস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে, যেমন নারী পুরুষকে বশ করে; প্রকৃতির ক্রিয়া ও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং ভাবও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে। '৫ চীনেও বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল। সৃষ্টি হচ্ছে yang (পুরুষ) yin (নারী)-এর যৌন মিলনের ফল। 'He (man) is described as a Microcosm−a world in miniature'৬। এসব দেখে শুনে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হয় যে ভারতের অনার্য সমাজে মিথুনতত্ত্ব, যাদু বিশ্বাস এবং মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্য ছিল। ময়েনজোদাড়োর আবিষ্ক্রিয়া এবং দ্রাবিড় সমাজের নারীদেবতা প্রভৃতি এ বিশ্বাসের অনুকূল। ৭ দেবীপ্রসাদ বলেন, 'আমাদের যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের মতোই ওই সহজিয়া প্রভৃতি

সম্প্রদায়গুলিও আদিম কৃষিকেন্দ্রিক যাদু বিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে। ’৮ পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন– ‘তন্ত্রের যে কোনো পুথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি ধর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নতুন ধর্মের প্রাসাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরে নব্য হিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। ৯ তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন, ‘যাহা আছে ভা , তাহাই আছে ব্রহ্মা –ব্রহ্মা যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। ’ ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। ... তন্ত্র বলিতেছেন যে যখন ব্রহ্মা ও দেহভা একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যেন একই পদ্ধতির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মা র শক্তি তোমার অনুকূল হইবে। ... এদেশের সিদ্ধগণ বলেন যে মুনষ্যদেহের মত পূর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই। ... অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। ১০ এই উক্তির সমর্থন পাই ছান্দোগ্যে। বিরোচন বলেছেন, ‘এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক–এই উভয়লোকই লাভ করা যায়। ’ (৮/৮/৪)

শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, বাঙলাদেশে এবং তৎসংলগ্ন পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রিস্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। ...বাংলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা মোটামুটিভাবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। ... ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধন মূলতঃ একটি সাধনা। ... এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোঁহা কোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। এবং সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ১১ এ জন্যেই পাঁচকড়ি বানার্জি বলেছেন ‘সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরী-ভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া-সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত। ’১২

‘এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন। ’১৩ তাই তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া, বাউল সবাই দেহচর্যাকেই মূলব্রত করেছে। আবার তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা রতিপ্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে এ সাধনা করে। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এ সাধনা চলে; যোগ তাই বামাচারী ও বামবর্জিত –এই দুই প্রকার। কামনিরোধক যোগাচার সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলছেন :

The most important of the secret practices, is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same-time conducive to health both of the body and the mind.১৪

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, 'যোগাচারমতে যেমন কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে, সহজমতে তেমনি কিছুই থাকে না, আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন, সে-সুখ স্ত্রীপুরুষ সংযোগজনিত সুখ। '১৫ তন্ত্রের মতো এখানেও নারীশক্তিই মুখ্য। তাই শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :

Another thing deserves special attention in connection with the yogic practice of the sahajia Buddhists is the conception of the female force. In the charya songs we find frequent reference to this female force variously called as the chandi, Dombi, Savari, Yogini, Nairamani, Sahajia-Sundari etc. and we find frequent mention of the union of the yogin with this personified female deity... ...this conception of Sakti of the Buddhist-Sahajia is an adoption of the general Tantric conception of the sakti.'১৬

আদি মৈথুনতত্ত্ব থেকে এসব বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভবের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবু পরোক্ষ ও বিচ্ছিন্ন প্রমাণে এটুকু বোঝা যায়, আদি কৃষি-জীবীর মৈথুনতত্ত্বের বিকাশ লোকায়তে এবং তার পরিণতি শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, রাধা-কৃষ্ণ, প্রজ্ঞা-উপায় প্রভৃতি রস-রতি তত্ত্বে বা বিজ্ঞানবাদে।

মহাভারতের উদ্দালক ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান (আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়) থেকে জানা যায় তখনও গাভীগণের মত স্ত্রীগণ শত সহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই নিত্যধর্ম। কাজেই তখনও নারীর একনিষ্ঠতাজাত সতীত্ব ধারণা গড়ে উঠেনি।

বার্হস্পত্য সূত্রমে আছে : সর্বথা লোকায়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে কাপালিকমের কামসাধনে।

গুণরত্ন বলেছেন–কাপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। এবং বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তারা সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয়। মাধ্বাচার্য বলেছেন, লোকায়তিকেরা কামাচারী–অর্থ ও কামসাধনাই তাদের লক্ষ্য।

গুণরত্নকথিত মৈথুন-উৎসব আজও হয়। সাঁওতাল, হো, পাগুা কোটার প্রভৃতি দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং চিলি, নিউমেক্সিকো, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো প্রভৃতির বিদেশী আদিবাসীদের মধ্যে তা চালু আছে। গুণরত্ন বলেছেন, "চার্বাকরা (লোকায়তিকরা)–

They drank wine and ate meat and were given to unrestricted sex-indul-gence. Each year they gathered

togather on a particular day and had unrestricted intercourse with women. They behaved like common people and for this reason they were called Lokayata.১৭

সাঁওতালেরা এমনি উৎসব আজও করে।

Five days are spent in dancing, drinking and debau-ching. It is significant that the commencement the village headman gives a talk to the village-people in which he says that they may act as they like sexually, only being careful not to touch certain women, otherwise they may amuse themselves. The village people reply that they are putting twelve balls of cotton in their ears and will not pay any heed to, nor hear or see anything.১৮

এরই বিকশিত তাত্ত্বিকরূপ পাই পরবর্তী ধর্মমতগুলোতে। হরপ্রসাদ সে-মতগুলোর কথা এভাবে বলেছেন :

The influence of the Lokayatas and Kapalikas is still strong in India. There is a sect and numerous ones too, the followers of which believe that 'Deha' or the material human body is all that should be cared for and their religious practices are concerned with the Union of men and women and their success (siddhi) varies according to the duration of the union. They call themselves Vaisnavas, but they do not believe in Vishnu or Krishna or their incarnations. They believe in 'Deha'. They have another name Sahajia, which is the name of a sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last four Centuries of their existence in India.১৯

দোল, হোলী বা মদনোৎসবে আজও সেই মৈথুন উৎসবের রেশ রয়ে গেছে। W. Crooke এই হোলী বা মদনোৎসবের মূলে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বাড়ানোর কামনা ছিল বলে অনুমান করেছেন। ২০

অতএব, আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই : সৃষ্টিসম্ভব মৈথুনতত্ত্ব থেকে সাংখ্যতত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বের প্রকৃতির উপর আত্যন্তিক গুরুত্বদানের ফলে তন্ত্র-মত এবং পুরুষের উপর গুরুত্বদানের কারণে লিঙ্গায়েত মত ও যোগ-পদ্ধতির বিকাশ। নিজের মধ্যে অলৌকিক শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ সাধনার লক্ষ্য। তাই মূলত এটি শক্তিবাদ। যোগপদ্ধতি, তান্ত্রিক আচার অথবা যোগ-তান্ত্রিক মিশ্র আচার মাধ্যমে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস চলেছে। যেখানে শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি প্রাধান্য লাভ করেছেন, সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব; যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু গুরুত্ব পেয়েছেন, সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতবাদের উদ্ভব। যোগ ও তন্ত্র প্রায় সব মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। যারা অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়, সে-সব সাধকের সাধনার আবশ্যিক অঙ্গ হয়েছে তন্ত্র অথবা যোগ। বাঙলাদেশে পাল আমলে আদি অনার্য-সংস্কার ব্রাহ্মণ্যমত এবং মহাযান বৌদ্ধ মতের সমন্বয়ে

তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান ও শেষে সহজযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, ম ল, লতা, ভগ, যোগ ও নানা গূহ্যপ্রক্রিয়াই এসব মতের ভিত্তি। এবং সাধারণভাবে আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক বর্ণরেখাত্মক-যন্ত্র, যোগ-ক্রিয়া, দীক্ষাগ্রহণ এমনকি সম্প্রদায় বিশেষে মূর্তিপূজার মাধ্যমেই উপাসনা চলে। বাঙলাদেশে 'অষ্টাদশ শৈব আগম নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগে রচিত হয় এবং খুব সম্ভব গুপ্তযুগের শেষের দিকে ও পালযুগে তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রচলন হয়।'২১ বর্তমান হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতেও তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রভাব লক্ষণীয়। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং উচ্চশ্রেণীর অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ এবং নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান ও নাথপন্থের উদ্ভব। এর জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতে। 'এই তত্ত্বসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোঁহাকোষ ও চর্যাগীতির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়াসাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।'২২ এবং 'সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সূফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।'২৩ ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্রমত–যার নাম নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ-সাধনা চলে। একসময় এই নাথপন্থ ও সহজিয়ামতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্ম সাধনা করে চলে; তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল-মতের উদ্ভব। 'সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য সাধনা মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।'২৪ ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদই বাউলমতের প্রবর্তক এবং মাধব বিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই (বা বীর চন্দ্র) বাউলমত জনপ্রিয় করেন।২৫ এ মতের সমর্থন মিলেছে 'বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা' নামের এক অজ্ঞাতপ্রায় পুথিতে। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরভদ্রকে বলছেন :

শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা শহরে ...
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধববিবির সনে
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধববিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।

ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, 'মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। ... বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদ্গাত হয়েছিল। ... বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পর

থেকে বাংলাদেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিকভাবের দুটি ধর্মমত চলিত ছিল–শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজিয়ামত। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। 'নাথ সন্ন্যাসীরা' নিজেদের 'যোগী বা কাপালিক' বলত; এরা কানে নরাস্থি-কু ল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণা করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাহিরে ছিল এদের কুঁড়ে ঘর। ২৬ যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত 'নাথ'। বর্তমান সময়ে যুগী জাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধন-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্কেত নিহিত আছে চর্যাপদে। '২৭ ছকে ফেলে দেখলে বাঙলার তান্ত্রিক ধর্মের বিবর্তন এরূপ দাঁড়ায় :

মিথুন ও প্রজনন
সাংখ্য+তন্ত্র+যোগ

শৈব-শাক্ত তন্ত্র বৌদ্ধতন্ত্র

যোগতান্ত্রিক বৌদ্ধ মহাযান মত

বজ্রযান কালচক্রযান সহজযান

বজ্রী = বাউলমত হিন্দু তান্ত্রিক ধর্ম

মিথুনাত্মক যোগচর্যা = বৌদ্ধ সহজিয়া-প্রকৃতিবর্জিত যোগসাধনা = বৌদ্ধনাথ পন্থ

বৈষ্ণব সহজিয়া যোগী শৈবধর্ম

আধুনিক বাউল মত

তান্ত্রিক শৈব-শাক্ত ধর্ম

তন্ত্র হচ্ছে ভোগ-মোক্ষবাদ–ভোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভই আদর্শ। নারীই জগৎকারণ আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া, কালী, তারা, শিবানী। নারীশক্তিতেই পুরুষ হয় শক্তিমান। শিব হচ্ছেন শক্তিমান। শিবশক্তি অদ্বয়ও বটে, ভিন্নও বটে। শক্তি-সাধনায় শক্তিমান হওয়া তথা শিবত্ব উপলব্ধি করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। এর সঙ্গে বৌদ্ধ 'বোধিচিত্ত' বা মহাসুখ তুলনীয়। এ সাধনায় প্রকৃতিসঙ্গ প্রয়োজন। মৈথুনে বীর্যধারণের দরকার হয় না। রেতক্রিয়া অবিধেয় নয়। এ সাধনা করতে হয় নারীভাবে-'বামা ভুত্বা যজেৎ পরাম। ' লতা, ভগযান-যন্ত্র, পদ্ম তথা নারীর যোনি-প্রতিম পূজার উপাদান। আসন, ন্যাস, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, যোগক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এরা গুরুবাদী। সাধনাও গুহ্য। পঞ্চ 'ম'কারে তথা মাংস, মৎস্য, মদ্য,

মুদ্রা ও মৈথুনে এরা বিশেষ আসক্ত। এরাও পরকীয়া বামা মৈথুনই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মানে। এদের গুরু চার প্রকার–গুরু, পরমকগুরু, পরমেষ্ঠি গুরু ও পরাৎপর গুরু। তাঁরা সবাই শিবের অংশ। হিন্দু তন্ত্রে মেরুদ কে আশ্রয় করে পর পর ছয়টি চক্র [ষট্‌চক্র–মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র (দ্বিদল চক্র)] ও তাদের সন্নিহিত পদ্ম, এবং ইড়া (গঙ্গা), পিঙ্গলা (যমুনা), সুষুম্না (সরস্বতী) প্রভৃতি বহু নারীর কল্পনা করা হয়েছে। সর্বনিম্নের চক্রের নাম মূলাধারচক্র। এতেই সৃষ্টিরূপা কু লিনী সুষুপ্ত রয়েছে। ষট্‌চক্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে সহস্রার (সহস্রদলপদ্ম), তাতে থাকেন পরম শিব। যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই কু লিনীকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বে নিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ত্রিগুণাতীত শিবত্ব উপলব্ধি হয়। এটি এক পরমানন্দময় অদ্বয়সত্তা–শিবশক্তির অদ্বয়সত্তা–এই মিলনজাত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। শিব পুরুষ শক্তির প্রতীক–উমা নারীশক্তির প্রতীক–উভয়ের মিলন জনিত যে সামরস্য তাই কেবলানন্দ, বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মহাসুখ ও বৈষ্ণব সহজিয়ার মহাভাবরূপ সহজাবস্থা। মূল পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই হিন্দুর শিবশক্তি, বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায় এবং বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব সহজিয়ার রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে রূপ নিয়েছে।

শাক্ততন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাচার নামে দুই সাধনপদ্ধতি আছে। বামাচার পঞ্চ 'ম'-কার ভিত্তিক। আর দক্ষিণাচার 'ম'-কার বর্জিত যোগনির্ভর।

ছকে হিন্দুতন্ত্র

	চক্র	দেহস্থান	পদ্মদল	অধিষ্ঠাত্র দেবতা
১	মূলধার	গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ	৪	ব্রহ্ম+ডাকিনী
২	স্বাধিষ্ঠান	জননেন্দ্রিয়ের মূলে সুষুম্নার মধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়িস্থ	৬	মহাবিষ্ণু +রাকিনী
৩	মণিপুর	নাভিমূলে	১০	রুদ্র+লাকিনী
৪	অনাহত	বক্ষ	১২	ঈশ+কাকিনী
৫	বিশুদ্ধ	কণ্ঠ	১৬	অর্ধনারীশ্বর (শিবশক্তি) +শাকিনী
৬	আজ্ঞা	ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থ	২	পরশিব+হাকিনী

এর উপর রয়েছে সহস্রদলপদ্ম, নাম সহস্রার। এটি পরমশিব ও কু লিনীর মিলন স্থল। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়ীই বায়ুপ্রবাহ পথ। ইচ্ছামত বায়ু সঞ্চালনই যোগক্রিয়ার মূলভিত্তি। তাই নাড়ীর সঙ্গে যোগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপার বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু অনৈক্যও রয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতির তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিব্যাচার, সমায়াচার, দক্ষিণাচার ও পশ্বাচার প্রভৃতি নামমাত্র তান্ত্রিক আচার। যথার্থ তান্ত্রিক আচার হচ্ছে : বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলাচার। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই স্বীকৃত, নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। বেশ্যা, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী প্রকৃতিই যোগ্য সাধন সঙ্গিনী।

বৌদ্ধতন্ত্র

প্রকৃতি ও পুরুষকে বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায় নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুতন্ত্রের ঘটচক্র বা পদ্ম বৌদ্ধতন্ত্রে চারচক্র বা পদ্ম। এবং তা 'কায়' রূপে পরিকল্পিত। প্রথম চক্রটি নাভির নিচে অবস্থিত; এর নাম নির্মাণকায়। দ্বিতীয় চক্র হৃদয়দেশে অবস্থিত; এর নাম ধর্মকায়। তৃতীয় চক্র কণ্ঠদেশে; এর নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থটি বক্ষতালুতে অবস্থিত; এর নাম সহজকায়। এই সহজকায় বা উষ্ণীষ কমলকে মহাসুখচক্র বা মহাসুখকমলও বলা হয়। 'হে বজ্রতন্ত্র' অনুসারে 'জননেন্দ্রিয়ের স্থান হইতে চেতন-অচেতন সমস্ত প্রাণী উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রদেশে নির্মাণকায় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মচক্র সমস্ত ধর্মের তত্ত্বরূপ বলিয়া হৃৎপ্রদেশে স্থাপিত; সম্ভোগ অর্থে ষড়রস সম্ভোগ, সম্ভোগকায় আনন্দ-রস সম্ভোগস্বরূপ, ইহা কণ্ঠদেশে স্থাপিত। মহাসুখচক্র তথা মহাসুখকায় মস্তকে স্থাপিত।'২৯

দেহস্থান	চক্র বা কায়	পদ্ম	মুদ্রা	অনন্দ	দেবী	ক্ষণ
নাভি	নির্মাণচক্র কায়	নাভিপদ্ম	কর্মমুদ্রা	আনন্দকায়	লোচন	বিচিত্র
হৃদয়	ধর্মচক্র ”	চৌষট্টিদল	ধর্মমুদ্রা	পরমানন্দ	মামকী	বিপাক
	হৃৎপদ্ম					
	বত্রিশ দল					
কণ্ঠ	সম্ভোগচক্র ”	কণ্ঠ পদ্ম	মহামুদ্রা	বিরমানন্দ	পা রা	বিমর্দ
	ষোড়শ দল					
মস্তক	সহজচক্র ”	উষ্ণীষপদ্ম	সময়মুদ্রা	সহজানন্দ	তারা	বিলক্ষণ
	চতুর্দল					

এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ : সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা।
চার আর্য সত্য : দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায়।
চার তত্ত্ব : আত্মতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব।

এর সঙ্গে চার নিকায়, ষোড়শ সংক্রান্তি, চৌষট্টি দ ও চার প্রহরাদির সম্পর্ক রয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে (যেমন সেকোদ্দেশ টীকা) কায়-বাক-চিত্ত-জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের চার প্রকার ভেদ ধরে মোট ষোল প্রকার আনন্দ নির্দেশ করা হয়েছে। ৩০ বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া নাড়ীর নাম ললনা, আলি, ধমন, চন্দ্র প্রভৃতি। পিঙ্গলার নাম রসনা, কালি, চমন, সূর্য প্রভৃতি। সুষুম্না নাড়ী অবধূতী, দেবী, প্রজ্ঞা (চন্দ্র) এবং রসনাকে উপায় (সূর্য) বলা হয়েছে। এই দুটো নাড়ীর মিলন হয় অবধূতীতে। এ মিলন প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। ললনা বিন্দু বহন করে, রসনা রজঃ বহন করে, অবধূতী বহন করে প্রজ্ঞা-উপায় মিলন জনিত বোধিচিত্তকে। এই অবধূতীই সহজানন্দ স্বরূপিনী। ৩১

বৌদ্ধতন্ত্র সাধনায় হঠযোগের গুরুত্ব অত্যাধিক। কেননা বিন্দুধারণ এবং তা ঊর্ধ্বে সঞ্চালনই এর লক্ষ্য। খড়গ, অঞ্জনা, পাদলেপা, অন্তর্ধান, রস রসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল—বৌদ্ধতন্ত্রের এই অষ্টসিদ্ধি (সাধনমালা, ২য় খ , পৃষ্ঠা ৩৫০)। নটী, রজকী, ডোমনী, চালী ও ব্রাহ্মণীই সাধন সঙ্গিনীরূপে বিশেষ উপযোগী। যোগিনী-ডাকিনীরা সিদ্ধিপ্রভাবে অলৌকিক শক্তি-ধর হয়।

মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত উপমতসমূহ

বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে হয়, তা সঠিক বলা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে 'বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে; বুদ্ধদেবই সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য মুদ্রা, মন্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করেন। ৩২ মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসই তান্ত্রিকতার ভিত্তি। বৌদ্ধ গ্রন্থে মন্ত্রকে বলত ধারণী (যাহা দ্বারা কিছু ধারণ করা যায়)। ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত বলেন, খ্রিস্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলো রচিত হতে থাকে। এ সময় বৌদ্ধ ক্ষান্তি-পারমিতা দান-পরমিতা প্রভৃতি তত্ত্ব দেবী রূপে কল্পিত হয়ে প্রমূর্তরূপে পূজা পেতে থাকেন। ধারণী বা বীজ মন্ত্রও এ সময় থেকে রচিত হয়। ৩৩ অষ্ট সাহস্রিক প্রজ্ঞা পারমিতা > প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র > প্রজ্ঞা পারমিতা ধারণী > প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্র রূপ সংক্ষেপকরণ পরম্পরায় অবশেষে 'প্রং' এই বীজমন্ত্রে (তুলনীয় ওঁ') রূপ নিয়েছে। এই মন্ত্রনির্ভর পূজা-ধ্যান পদ্ধতির নাম মন্ত্রযান। সম্ভবত এই মন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের যোগাচার পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এর দার্শনিক ভিত্তি হয়। তার থেকেই ক্রমে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়ে পাল আমলে তিনটি বিশিষ্ট উপমত হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ তিনটি হচ্ছে : বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান।

নাগার্জুনের মতো শূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। এ মত পরে বসুবন্ধুরও সমর্থন পায়। তিনি বলেন গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা, আর এই শূন্যতাই নির্বাণ। অর্থাৎ বাহ্যত সব কিছু থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব মায়ামাত্র–ভ্রমস্বরূপ–এটি অবিদ্যাজাত।

বজ্রযান

বজ্রযানে এই শূন্যতার নাম বজ্র। এটি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী বজ্র। এই তত্ত্বই বজ্রসত্ত্ব–তার প্রমূর্তরূপ আদিবুদ্ধ। তিনিই পরমদেবতা। এই পরমদেবতা আত্মাও বটে, আবার সর্বজনীন পরমসত্তারূপে পরমাত্মাও বটে। এ বোধ মূলত ঔপনিষদিক এবং আস্তিক্যসূচক। এই বজ্রসত্ত্ব পরমব্রহ্মের মত নির্গুণ, আবার সগুণও বটে; এই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা শূন্যতা ও করুণা জ্ঞানরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা।

বৌদ্ধ ধর্মচক্র বা ধর্মকায় বজ্রযানে বজ্রকায়রূপে অভিহিত হয়। এই বজ্রকায় বজ্রসত্ত্বস্বরূপ এবং জ্ঞান ও করুণারূপ বুদ্ধ। এই আদি বুদ্ধের পঞ্চগুণ–রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের নাম পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক দেবতা হচ্ছেন বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। উক্ত সব স্কন্ধের ধ্যানের প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে দেবতারা ধ্যানী বুদ্ধ বলে অভিহিত হন। এঁদের প্রকৃতি ও শক্তি হচ্ছেন যথাক্রমে তারা (বজ্রধাত্বেশ্বরী), মামকী, পা রা, আর্যতারা বা তারা ও লোচনা। এঁদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন চক্রপাণি, পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর), বিশ্বপাণি ও বজ্রপাণি। এরা ভূতপিশাচদেরও নাকি পূজা করত। যোনি প্রতীক যন্ত্রপূজাও করত।

দেবীদের মধ্যে আর্যতারা–শ্যামতারা, শ্বেততারা, উগ্রতারা প্রভৃতি নানা নামে বিশেষ জনপ্রিয় হন। তা ছাড়া হারিতা, মারীচি প্রভৃতি নামের প্রকৃতিও পরিকল্পিত হয়েছে। এই 'তারা' পরে হিন্দু কালিকাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন হেরুক বা হে বজ্র এবং তাঁর প্রকৃতির নাম হচ্ছে বজসত্ত্বাত্মিকা, বজ্রবরাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা পারমিতা প্রভৃতি; আর তাঁর আবাহনের বীজমন্ত্র হল 'হুং'। শূন্যতা ও করুণাকে কমল (প্রজ্ঞা), বজ্র (পুরুষ), প্রজ্ঞা (নারী), উপায় (পুরুষ), চন্দ্র (নারী),

সূর্য (পুরুষ), এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। এ দুটোর মিলনজনিত এক তুরীয় আনন্দময় অবস্থা বা চেতনার নাম বোধিচিত্ত। এইটিই তান্ত্রিকতত্ত্ব। শৈব-শাক্ত তন্ত্রের সঙ্গে এখানেই বৌদ্ধতন্ত্রের মৌলিক ঐক্য। বোধিচিত্তেই মহাসুখ, কমলকে (প্রজ্ঞা তথা নারী) বৌদ্ধতন্ত্রে (যোনির) এবং বজ্রকে (উপায় তথা পুরুষ) পুংলিঙ্গের প্রতীকরূপে ধরা হয়েছে। তাই 'বজ্রকমল সংযোগ' অর্থ মৈথুনক্রিয়া। এই মৈথুনে যে সামরস্য তা-ই 'যুগনদ্ধ' বা অদ্বয় এবং এই সামরস্যজাত আনন্দাবস্থাই বোধিচিত্ত। (এতদ অদ্বয়ং ইতি উক্তং বোধিচিত্তং ইদম পরম–সাধনমালা, ২য় খ, পৃষ্ঠা ১৭)। অতএব প্রজ্ঞা-উপায় মৈথুনজাত সহাসুখরূপ বোধিচিত্ত লাভ করাই এ সাধনার লক্ষ্য। হে বজ্রতন্ত্রে হে বজ্র (বজ্রসত্ত্ব) নারী যোনিতে শুক্ররূপে বাস করেন বলে এবং শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। বজ্রযানীরা চর্যাগীতির মতো বজ্রগীতিতে তাদের সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করত। উল্লেখ যে আদিকাল থেকেই গানের মাধ্যমে সাধন-ভজন রীতি চালু রয়েছে। সব ধর্মেই গান (ক্বচিৎ নাচ) সাধনা ও উপাসনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অঙ্গ।

কালচক্রযান

বজ্রযানের সঙ্গে কালচক্রযানের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। কালচক্রযানে কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। অর্থাৎ এখানে 'কাল'-এর উপরই অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা 'কাল ঘসতি ভূতানি'। কালচক্র হচ্ছে–শূন্যতা ও করুণার তথা প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়সত্তা। কালকে জয় বা অতিক্রম করে চিরন্তন বোধিচিত্ত লাভ তথা জন্ম ও মৃত্যু। (উৎপত্তি ও ক্ষয়) নিরোধক শক্তিলাভই এ সাধনার লক্ষ্য। তাই কালচক্র বুদ্ধের জনজস্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায়ের ধারক (বিমলপ্রভা–বাঙলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৩৪–৩৫)। 'সাধন সম্বন্ধে কালচক্রযানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়। অভয়াকর গুপ্ত 'কালচক্রাবতার' গ্রন্থে 'বার-তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, কালচক্রপন্থী সাধকেরা গ্রহ নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাঁহাদের সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন। '৩৪ বৌদ্ধতন্ত্রে–বজ্র ও কালচক্রযানে–তুকতাক্-উচ্চাটন-বশীকরণ-মারণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারাদি ছিল।

সহজযান

সহজযান দেব-দেবী, পূজা, মন্ত্র, প্রভৃতি সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ও আচারিক ধর্মের বিরোধী। কিন্তু বজ্রযানের সাধনপদ্ধতি ও সহজযানের সাধন পদ্ধতি অভিন্ন। এমনকি বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্বকে তারা মানে। সহজযানের প্রসারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। এ মার্গের শাস্ত্র-গ্রন্থগুলোও তাই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত। আমাদের দোহাকোষ ও চর্যাপদগুলো সহজযানী সিদ্ধান্তের রচিত। চর্যাপদে বামাচার ও প্রকৃতি-বর্জিত সাধনার মিশ্রণ আছে। সহজযান মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন জনিত সামরস্য থেকেই মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব। এটিই বোধিচিত্ত। বৌদ্ধ চৌরাশী সিদ্ধার সবাই সহজিয়া ছিলেন না। তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী–এঁরা প্রকৃতিবর্জিত পরম যোগী। কেউ কেউ সহজিয়া ছিলেন, তা চর্যাগীতিতে লক্ষণীয়।

সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজকীয় প্রয়াস চলে। এ সময়েই 'কালবিবেক', 'দায়ভাগ' প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থোল্লিখিত ব্রাহ্মণ্য আচার সমাজে বহুল

প্রচলিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণের শুরু হয় এভাবেই। চর্যাপদ থেকে এমনও অনুমান করা যায় যে, এ সময় সহজযানীদের মধ্যে দ্বিবিধ সাধন পদ্ধতি চালু ছিল; একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিকপদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত– বিশুদ্ধ যোগ-প্রণালী, হঠযোগের (চন্দ্র+সূর্য) মাধ্যমে দেহ বা কায়াসাধনই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চালন করে সহস্রার মধ্যে নিয়ে সচ্চিদানন্দ রূপ 'মহাসুখ' ও 'সহজানন্দ'-এর অবস্থা সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। এটিই নির্বাণানন্দ তথা 'শূন্যতা'।

নাথধর্ম

বলেছি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজধর্মরূপে গৃহীত হয়। ফলে বিভিন্ন ও বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে পড়ে। বিশেষ করে, স্মৃতির বিধান-অনুগ সমাজ ও শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় লোকজীবনে সে-প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। সেনদের রক্ষণশীলতা আর অনুদারতাও বৌদ্ধ বিলুপ্তির জন্যে অংশত দায়ী। এ বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিছু হিন্দু-দেবতা ও আচার গ্রহণ করে হিন্দুয়ানীর আবরণে পৈত্রিক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসি হয়। এরূপে এক যোগী-তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিব-উমা' নাম দিয়ে নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার চালু রাখে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-হাড়িপা-কানুপা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মীননাথ গোরক্ষনাথের নাম অনুসারেই এ সম্প্রদায় 'নাথপন্থী' রূপে আমাদের কাছে পরিচিত। বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের কালে দুটো ভিন্ন পথে রূপান্তর লাভ করে : বামাচার বর্জিত যোগীরা শৈবনাথরূপে এবং কামাচারীরা বৈষ্ণব সহজিয়া রূপে হিন্দু সমাজের উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দ্রাবিড় দেবতা শিব ও উমাকে৩৫ অনেক আগেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পুরুষ-প্রকৃতির বিহগরূপে গ্রহণ করেছিল, পরে শৈব-শাক্ততন্ত্রের শিব-উমাই (বা গৌরী) অবলম্বন হয়। তেমনি বৌদ্ধরাও পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রজ্ঞা উপায় রূপে কল্পনা করে। আবার বৌদ্ধ বিলুপ্তিকালে প্রজ্ঞা-উপায়ে প্রতীকী পরিবর্তনে 'রাধাকৃষ্ণ' তথা বিষ্ণু-লক্ষী আরাধ্য হয়ে উঠেন। এ কারণে এ সম্প্রদায় 'বৈষ্ণব-সহজিয়া' নামে এক উপসম্প্রদায় হিসেবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণু ও তাঁর অবতার কৃষ্ণ মহাভারতীয় যুগ থেকেই উত্তর ভারতিক ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছেন। নাথপন্থ যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ থেকে উদ্ভূত তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুশীলকুমার দে প্রমুখ স্বীকার করেছেন। ৩৬ অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও কল্যাণী মল্লিকের মতে নাথপন্থ একটি প্রাচীন শৈবমত। কিন্তু ডক্টর মল্লিক বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও স্বীকার করেছেন–'নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সার্ধম্য আছে। ... নাথ ধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধ যোগ-তত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে।'৩৭ আসলে প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে 'শিবশক্তি'র প্রতীকীরূপে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েই ডক্টর মল্লিক–হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়ামত ও নাথপন্থে নানা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেও–নাথমার্গকে শৈবমত বলেছেন। নাথেরা যে ব্রাহ্মণ্য শৈব নয়, তার একটি প্রমাণ নাথেরা শূন্যবাদী এবং কায়াসাধনব্রতী। আর ব্রাহ্মণ্য 'আদিনাথ' শিব 'আদিবুদ্ধে'রই প্রতিশব্দের মতো। নাথদের এক পীঠস্থান কামাখ্যা। কদলিনগরও নাকি কামরূপে।

নাথযোগী সম্প্রদায় (তাঁতিরা) তাদের সমাজ, আচার, পূজাপদ্ধতি ও সৎকারাদি আজও স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা ও পালন করে। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অবশ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে এরা হিন্দু-শৈবযোগীদের প্রভাবে পড়েছে। 'ভৈরব' নামে শিবপূজা তার অন্যতম। নাথপন্থী সাধকরাও নানা মতগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তারা যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখন এসব উপসম্প্রদায়ের কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বা (বৌদ্ধ) যোগী। তাই এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দূর্গাপূজা, চক্রপূজা, যোনি ও লিঙ্গপূজা, শ্রীযন্ত্রপূজা প্রভৃতি চালু রয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে বলেই শক্তিকে এরা 'মাতৃকা' জ্ঞান করে না। বৌদ্ধতন্ত্রের অষ্টসিদ্ধির অন্তর্ধান খেচর প্রভৃতি সিদ্ধি আমরা মীননাথ-গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কাহিনীর মধ্যে পাই। মারণ-বশীকরণ-উচ্চাটন-জ্যোতিষী প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচার সিদ্ধিও নাথপন্থের লক্ষ্য ছিল। নাথমার্গেও শূন্যবাদ আছে। শৈব ব্যোমবাদ—আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ বৌদ্ধ সহজযানীদের শূন্য, অতিশূন্য ও সর্বশূন্যের তুল্য। শূন্য ও বোধিচিত্ত এবং নির্গুণ তুরীয় অবস্থা একই। এ-ই নির্বাণ।

বৈষ্ণব সহজিয়া

বলেছি, বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পর বাঙালী বৌদ্ধসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে মিশে গিয়ে হিন্দুয়ানীর আবরণে তাদের মতাবলী প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া, ধর্মপূজারী, নাথযোগী, হিন্দুতান্ত্রিক প্রভৃতির উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়ার পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। কেবল শূন্যতত্ত্ব বা নির্বাণ বা বোধিচিত্তের স্থলে 'মহাভাব' রূপ সহজ তথা পরমানন্দ এবং প্রজ্ঞা উপায়ের পরিবর্তে 'রাধা-কৃষ্ণ' নামই পার্থক্য সূচিত করেছে। একারণে পরকীয়া নারী-মৈথুন, বিন্দুধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন এবং রাগানুগা সাধনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নামান্তর ঘটেছে। বৌদ্ধদের মতো এরাও বেদ বিরোধী। বৌদ্ধদের মতো এরাও একান্তভাবে গুরুবাদী। সৎগুরুর কাছে দীক্ষিত না হয়ে কেউ মহাভাব বা 'সহজ'-এর অধিকারী হতে পারে না। এভাবে হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মও গড়ে উঠেছে বৌদ্ধতন্ত্রের কোনো কোনো পরিভাষা ও পদ্ধতির রূপান্তরে ও তত্ত্বের কলেবর বৃদ্ধিতে। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি-শিল্পে তার সাক্ষ্য রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। তারাই অন্য লোকের চোখে 'নেড়ানেড়ী'। নেড়ানেড়ী কথাটিও বৌদ্ধ ঐহিত্যের ইঙ্গিতবাহী (মুতি মুখ ও মস্তক)। কেবল রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্যে (তথা পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে) যারা সাধন ভজন আবদ্ধ রেখেছে, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। আর যারা নির্বিচারে নানা রূপক ও প্রভাব গ্রহণ করেছে, তারাই বাউল। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এ-ই।

বাউল

বাউলদের জনশ্রুতিজাত ধারণা, স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গূহ্য সাধন প্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক। রূপ, সনাতন, নিত্যানন্দ, জীব প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকগণের পরকীয়া সঙ্গিনী ছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং মুসলমান আউলচাঁদ রূপে পুনরার্বিভূত হয়ে এই সাধনপ্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আউলচাঁদের পুত্র রাম শরণ, তাঁর পুত্র দুলালচাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে। সম্ভবত আউলচাঁদের শিষ্যা মাধববিবি এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বা

বীরচন্দ্র এই সাধন তত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। আউলচাঁদ 'ফকির ঠাকুর' নামে খ্যাত এবং কর্তাভজা মতের আদি গুরু বলে পরিচিত। বাউলেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। বাউলদের লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। তাই তারা কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। এজন্যেই পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনেকটা অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।

না বললেও চলে যে 'রাধাকৃষ্ণ' নামের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের-যুগলাবতার চৈতন্যদেবকে বাউল মতের উদ্ভাবক রূপে প্রচার করে তারা এই সাধন তত্ত্বকে শ্রদ্ধেয় করার এবং আভিজাত্য দানের প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া বা রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব-যুগেই হয়ত শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্য-উত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আউলচাঁদ। আর অপর শাখার প্রবর্তক ছিলেন মাধব বিবি। এই শাখার বিস্তৃতি ঘটে সম্ভবত বীরভদ্রের চেষ্টায়। এটিরই লোক-প্রচলিত নাম 'বাউল' সম্প্রদায়। যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিল আর যে-সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দুসমাজ ভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।

হিন্দু প্রভাবে বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে, মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজম্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গনি, রসুল, রুহ, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধ নাথ এবং নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরণিক উপমা ও কুরআন হাদীসের বাণীর নানা ইঙ্গিত (যেমন বর্জখ)। অবশ্য বাউল রচনায় এসব শব্দ ও পরিভাষা তাদের মতানুগ অর্থান্তর তথা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও সুফী সাধনার সঙ্গে বাউল মতের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার করে যে-মিলন-ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক স্থায়ী করার জন্যে পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেরও এক সর্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় 'পরম তত্ত্ব' পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছে মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাঁই (অলক্ষ্য স্বামী), 'অচিন পাখি', মনুরা (মনোরায়, মনোরাজা) প্রভৃতি পরমাত্মা–আত্মারই পূর্ণাঙ্গরূপ। দেহস্থিত আত্মাকে কিংবা আত্মা সম্বলিত নরদেহকে যখন 'মানুষ' বলে অভিহিত করি, তখন পূর্ণাঙ্গ বা অখ আত্মা বা পরমাত্মাকে মানুষ বলতে বাধা কি?

বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদও ভোগমোক্ষ বাদ। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ ও পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সুফীমত ও নানা লৌকিক-তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে বাউল মতে অসঙ্গতিও কম নেই। তবু বাউলদের উপর বৈষ্ণব মতের (চৈতন্য চরিতামৃতের মাধ্যমে) এবং সুফীমতের (কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে) প্রভাবই অত্যধিক। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাউল মতের উদ্ভব। গুরু, মৈথুন ও যোগ তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউল মতে। তাই গুরু, বিন্দুধারণ ও

দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বাউল গানে অত্যধিক। সৎগুরুর কাছে দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউলমতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা হয়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ অলখ সাঁই। বাউলের 'রসস্বরূপ' হচ্ছে সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এটিই অটলমানুষ তথা আত্মতত্ত্ব। এ হচ্ছে অরূপের কামনায় রূপ সাগরে ডুব দেওয়া, স্বভাব থেকে ভাবে উত্তরণ। সহজিয়াদের 'সহজ'ই সহজ মানুষ। মৈথুন মাধ্যমে বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চারণের সময়ে গঙ্গা (ইড়া) ও যমুনা (পিঙ্গলা) বেয়ে সরস্বতীতে (সুষুম্নায়) ত্রিবেণী (মিলন) ঘটাতে হয়। তারপর সেখান থেকে সহস্রায় (মস্তকস্থিত-সহস্রদল পদ্মে) যখন বিন্দু গিয়ে পড়ে, তখনই সৃষ্টি হয় মহাভাব বা সহজ অবস্থা। মূলাধারের রজঃকে ফুল, শুক্রকে ক্ষীর এবং নিঃস্বত রজঃকে নীর বলে। এই রজো-বীজে বা নীর-ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজ মানুষ। বৌদ্ধ মতে হেবজ্র (বজ্রসত্ত্ব) শুক্ররূপে নারী যোনিতে বাস করেন। সহজিয়াদের মতেও 'ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষ্ণশক্তি' [বিতর্ত বিলাস–অকিঞ্চন দাস]। এজন্যে পুরুষ নারীরজঃ এবং নারী পুরুষের শুক্র পান করে। সাধনার দ্বারা সহজ মানুষের বা মহাচৈতন্যের তথা আত্মার অবিমিশ্র সত্তাবোধ জাগাতে হয়। মৈথুন পদ্ধতিই রাগানুগ পদ্ধতি। চারিচন্দ্র হচ্ছে–মল, মূত্র, রজঃ ও শুক্র। এসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। রস বলতেও উক্ত চারি পদার্থকে বোঝায়, আবার সাধারণভাবে প্রেম বা শৃঙ্গার রসও নির্দেশ করে। 'বাণ' পুরুষশক্তি এবং 'গুণ' প্রকৃতি-শক্তি।

বাউলদের মনের মানুষ, মনুরা, সহজমানুষ, অধরমানুষ, ভাবের মানুষ বা অলখ সাঁই-এর সঙ্গে আদিবুদ্ধ, আদিনাথ, বোধিচিত্ত ও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের মৌলিক ঐক্য রয়েছে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে হিন্দু-বাউলের অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন গুরুর মত বা নামানুসারে এরা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত; যথা কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বলরামী, শম্ভুচাঁদী প্রভৃতি। মুসলমান বাউলরা নেড়ার ফকির, বাউল, সাঁই, সাহেব ধনী, হজরতী, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরুপন্থী সমাজে বিভক্ত। 'দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। ' এই ধারণা দেহতত্ত্বে আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে দেহের চর্যা ও দেহ-সম্বন্ধীয় তথ্য উদঘাটন আবশ্যিক হয়েছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের আমল থেকে দেহ ও সাধনা সম্বন্ধীয় যে-সব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছি। এতে দেহের বাম ও দক্ষিণের একটি স্থুল পরিচয় মিলবে :

দেহের দক্ষিণাংশে : রসনা, পিঙ্গলা, সূর্য, রবি, অগ্নি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু উপায়, যমুনা, রক্ত, পলিতা, সুক্ষ, রেতঃ, ধর্ম, স্থির, পর, দ্যৌ, ভেদ, চিত্ত, বিদ্যা, রজঃ, ভাব, পুরুষ, শিব, জিনপুর, নির্মাণকায়, গ্রাহ্য ও গগন।

দেহের বামাংশে : ললনা, ইড়া, চন্দ্র, শশী, সোম, অপান, ধমন, আলি, নাদ, প্রজ্ঞা, গঙ্গা, শুক্র, বলি, স্থুল, রজঃ অধম, অস্থির, অপর, পৃথিবী, অভেদ, অচিত্ত, অবিদ্যা, তামস, অভাব, প্রকৃতি, শক্তি, সম্ভোগকায় ও গ্রাহক।

অবশ্য এসব পরিভাষার সবগুলো বাউল সাধনায় ও বাউল রচনায় মিলবে না। কারণ কালে অনেকগুলোর গূঢ়ার্থের স্মৃতি লোকমানস থেকে মুছে গেছে। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের ও সাধন-প্রণালীর প্রভাবে পড়েছে বলে বাউল সাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট

পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এজন্যে মুসলমান বাউলদের মধ্যে পরকীয়া ও মৈথুনাত্মক সাধনা দুর্লক্ষ্য; তারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দেয়।

বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়। তাই পরমত সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।

নানাবরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।

মানুষ নির্বিশেষকে এমন উদারদৃষ্টিতে দেখা যে-জীবন বোধের দ্বারা সম্ভব, তার উৎস যে-ধর্মমত বা মরমিয়াবাদ তা কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। মুসলমান বাউলের হিন্দুগুরু, হিন্দু বাউলের মুসলমানগুরু এমন প্রায়ই দেখা যায়।

সাধারণ দৃষ্টিতে মুসলমান বাউলেরা আধা-মুসলমান। এরাই বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্য বাড়িয়েছে। সুফী-দরবেশেরা তাদের এমনি আধা-মুসলমান করে না রাখলে, সরাসরি শরীয়তী ইসলাম প্রচারে এত লোককে দীক্ষিত করা যেত না হয়ত। আগে নামত মুসলমান সমাজভুক্ত ছিল বলেই উনিশ-বিশ শতকে তাদের অধিকাংশকে সহজেই পুরো মুসলমান করা সম্ভব হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফরায়েজী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ-বিশ শতকে শরীয়তী ইসলামে ফিরে এসেছে; তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল-সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে। নইলে বাঙলার–বিশেষ করে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের–এককথায় পদ্মার ওপারের নিম্ন শ্রেণীর বাঙালীর মধ্যে বাউলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।

বাউল ধর্মে বৈরাগ্য নেই। বাউলেরা মুখ্যত তাত্ত্বিক, গৌণত প্রেমিক। এই তাত্ত্বিকতা অনেককেই বিষয়ে অনাসক্ত রাখে। তাই বাউল দুই প্রকার : গৃহী (বিষয়ী গৃহী) ও বৈরাগী (অনাসক্ত গৃহী)। বাউল বৈরাগীরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালীর ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালীর মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালীর জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্যে বাঙালীকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলত।

'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। নামটি বাউলদের স্বপ্রদত্ত নয়। পনেরো শতকের শেষপাদের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এবং ষোল শতকের শেষপাদের চৈতন্যচরিতামৃতে 'ক্ষেপা' ও 'বাহ্যজ্ঞানহীন' অর্থে 'বাউল' শব্দের আদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের কাছে প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের একটি হেঁয়ালিতেও 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখেছি। রাঢ় অঞ্চলে এখনো বাউলকে 'ক্ষেপা' বলে। কেউ বলেন 'বাউর' (এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল) থেকেই 'বাউল' নামটির উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য উত্তর ভারতের 'বাউরা'র সঙ্গে আমাদের 'বাউল'-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবু 'আকুল' থেকে 'আউল' এবং 'ব্যাকুল' থেকে 'বাউল' শব্দের উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেন–এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা

বাজিয়েদেরকে লোকে 'বাতুল' বলে উপহাস করত। এ 'বাতুল' শব্দ থেকে 'বাউল' নামের উদ্ভব। কারোর কারোর মতে 'বায়ু' শব্দের সঙ্গে 'স্বার্থেল' যুক্ত হয়ে, বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা সাধনাকারী অর্থে বাউল শব্দ তৈরি হয়েছে। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'বাউল' শব্দটি 'আউল' শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'আউল' আরবি 'আউলিয়া' (ওলির বহুবচর) সম্ভূত। ডক্টর সৈয়দ আবদুল হালিমের মতে 'আউল' শব্দটি 'আউয়াল' শব্দজ। আগমের আরবি পরিভাষা হিসেবে 'আউয়াল' শব্দটি গ্রহণ করে মুসলমান আগমতাত্ত্বিকেরা আউয়াল বা 'আউল' নামে পরিচিত হয়। অবশ্য 'আগম'-এর আরবি পরিভাষা 'আউয়াল'-এর 'আউল' রূপে বহুল প্রয়োগ বাউল গানে দেখা যায়। উপর্যুক্ত এ কয়টি ব্যাখ্যার কোনোটাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে 'ব্যাকুল' বা 'বাতুল' থেকেই 'বাউল' নামের উদ্ভব বলে অনুমান করি। আমাদের এ অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উঁচুস্তরে বাউলেরা কোনো কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পায়নি। তাই মনে হয়, ব্যাকুল (ভাবোন্মত্ত) কিংবা 'বাতুল' (অপদার্থ) অর্থে উপহাসস্থলে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। আর 'আউয়াল' থেকে আউল শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না। আবার বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির-নামটিও আউলচাঁদ। হয়ত আউয়ালবাদী (আগম-বাদী) বলেই তাঁর নাম আউল চাঁদ। কিংবা গোড়ার দিকে আউল চাঁদের অনুসারীরাই ছিল 'আউল' বলে পরিচিত।

সম্প্রতি অধ্যাপক এস.এম. লুৎফর রহমান তাঁর 'বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা' নামের প্রবন্ধে৩৮ 'বাউল' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেছেন। তিনি অবহট্ট রচনায় ও চর্যাগীতিতে৩৯ ব্যবহৃত বাজিল, বাজুল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলোকে বাউল শব্দের পূর্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বজ্রী>বজ্জির>বাজির/বজ্জিল>বাজিল>বাজুল>বাউল। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ যদি 'বজ্রকূল' নামে অভিহিত হত বলে অনুমান করা সম্ভব হয়, তা হলে 'বজ্রকূল' থেকে 'বাউল' হওয়া আরো সহজ। যেমন বজ্রকূল>বজ্জউল>বাজুল>বাউল। যা হোক, বাউল যে বজ্রযানী নির্দেশক, সে-সম্পর্কে আমাদেরকে নিঃসংশয় করার গৌরব অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রাপ্য।

বাউল গান তাত্ত্বিক রচনা–তত্ত্বসাহিত্য। স্বল্পশিক্ষিত লোকের রচনা বলে এগুলো লোক-সাহিত্যের উপরে উঠতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন আঙ্গিক সৌষ্ঠবে, ভাবের সুষম অভিব্যক্তিতে, কাব্যরসে, শিল্পসৌন্দর্যে, ছন্দলালিত্যে ও সূচিত শব্দ উৎকৃষ্ট কবিতার লবণ্য লাভ করেছে, বাউল গান তেমন নয়। আঙ্গিকে, ছন্দে এবং অভিব্যক্তির অসঙ্গতিতে ও শিল্পরুচির অভাবে এসব রচনা কবিতার পর্যায়ে উন্নতি হতে পারেনি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিশেষ করে লালন, পাঞ্জু, হাউরে, মদন, যাদুবিন্দু প্রভৃতি কয়েকজনের রচনায় কাব্য-মাধুর্য দুর্লভ নয়। সাহিত্যে হিসেবে বিচার করলে বাউল গান লালিত্য-বিরল লোকগীতিমাত্র, আর কিছু নয়। সুরের একঘেয়েমিও তত্ত্ববিমুখ শ্রোতার পক্ষে পীড়াদায়ক। বাউল গানের কদর আছে ভাবুক ও তত্ত্বপ্রিয় লোকের কাছে এবং তা গান হিসেবে নয়–তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবে। বাউলেরা গানকে তত্ত্বপ্রচারের, ভজনের ও আত্মবোধনের কাজে লাগায়। গানের প্রথম চরণেই সাধারণত মূল বক্তব্যের আভাস মেলে এবং তার সৌন্দর্যও অবশ্য স্বীকার্য।

সব গুহ্য সাধনাই যোগ নির্ভর। তাই এখানে যৌগিক সাধন প্রণালীর স্থুল পরিচয় দেওয়া হল : দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ী। তার মধ্যে তিনটে প্রধান–ইড়া, পিঙ্গলা

ও সুষুম্না বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এ তিনটেকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতাস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র, রজঃ, নীর-ক্ষীর-রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ু চালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।

আবার শুক্র, রজঃ ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত–জীবনীশক্তি ও বিনাশ-বীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস, কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রিত করলে গোটা দেহের উপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়ীতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতাই সাধনের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম।

ললাটদেশে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কু লিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কু লিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি রজঃবিষ বা কামবিষের প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দলাভ করাই সাধ্য।

এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। তখন যে-শুক্রের স্খলনে নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়ীমাধ্যমে উর্ধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি সংরক্ষিত হয়। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।

যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক সর্পস্বরূপ মনে করা হয়েছে। কু লীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই কু লিনী নাম পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাম বিষ। কামবিষ রূপ সৃষ্টিশীল শুক্র স্খলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনী শক্তি। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করার দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের বিনাশ নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ীর মাধ্যমে উর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট-দেশে সঞ্চিত করে রাখলেই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব। এটিই সামরস্য, সহজাবস্থা, চিররমণানন্দাবস্থা বা সচ্চিদান্দাবস্থা–শিব-শক্তি, প্রজ্ঞা-উপায় বা রাধাকৃষ্ণের অদ্বয় সংস্থিতি। এটিই সিদ্ধি। আজকের যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে একপ্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, আর তাতেই তারা হয়ত মনে করে যে তারা অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।

সাধনার তিনটে স্তর : ১. প্রবর্ত ২. সাধক ৩. সিদ্ধি।

প্রবর্তাবস্থায় যোগী সুষুম্নামুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইড়ামার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃতধারায় স্নাত হয়।

শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে তথা বিন্দু ধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নামুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃত ধারায় স্নান।

এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ীপথে শুক্র ইচ্ছামত চালু রেখে অজরামরবৎ বোধগত সামরস্যজাত পরমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যমৃত পারাবারে স্নান। এতে স্থুল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাব স্বরূপ শৃঙ্গারানন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি

যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধ ভা শৃঙ্গার রূপ মথনদ সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা যায়। এর ফলে জরা-গ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজমান থাকে।

তথ্যপঞ্জী

১.
ক Golden Bough : James Frazer.
খ Ancient Society : H. L. Morgan.
গ লোকায়তদর্শন–দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৩২-৩৪, ২৮২-৮৩।
ঘ জাতিভেদ–ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৯৮-১০৭।
২. Ancient Symbol Worship : H. M. Westropp. pp 23-29.
৩. লোকায়ত দর্শন, পৃষ্ঠা ১০১, ১১৩-১৪, ১১৭-৩৪।
৪. The Mothers : R. Briffault Vol. III PP 54, 57.
৫. Goden Bough (as Quoted in Lokayata Darshan p 119.)
৬. Studies in Ancient Greek Society. p 151.
৭. লোকায়তদর্শন, পৃষ্ঠা ৩৫৭-৭৯।
৮. মার্কে য়পুরাণ ৭২ : ৪৩-৪৪ (রমাপ্রসাদচন্দ্রের Indo-Aryan Races)
৯. ক শাক্ত সাহিত্য–ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ২৫।
খ Indo-Aryan Races : R. P. Chanda. p 131.
১০. Mohenjodaro and the Indus Civilization : J. Marshall Vol. I, p 52
১১. ক শাক্ত সাহিত্য : পৃষ্ঠা ৪০।
খ Mother Goddess : S. K. Diksit
১২. The Mothers : Vol. III, p 2.
১৩. Studies in Ancient Greek Society : pp 41-42.
১৪ . ক লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩০৮-৩৩।
খ Encyclopedia of Religion and Ethics; Vol. I, p 227.
১৫. লোকায়ত দর্শন; পৃষ্ঠা ৩৭৬-৮০।
১৬. The Aryans; Gordon Childe.
১৭. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ১০২-১১, ৬৪৬, পাদটীকা নং ২৫।
১৮. লোকায়তদর্শন-ধৃত অনুবাদ।
১৯. ক Iconography of Hindu India : T. Gopinath Rao.
খ বৃহৎতন্ত্রসার
গ লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩৩৪-৪০, ৩৭৯-৪১৫।
২০. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩২২-২৪।
২১. লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৩২২-২৪।
২২. ক Golden Bough; পৃষ্ঠা ১৩৮।
খ লোকায়তদর্শন; পৃষ্ঠা ৪৭৯।
২৩. Golden Bough; পৃষ্ঠা ১৩৮।

দুই
১.	History of Indian Philosophy; pp 81, 451-52.
২.	Philosophy of the Upanisads and Ancient Indian Metaphysics, p 8.
৩.	Philosophy of India (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত; পৃষ্ঠা ৫১৩-১৪)
৪.	ক রচনাবলী, ২য় খ , পৃষ্ঠা ২৭৪-৮৩।
খ বাংলার বাউল ও বাউলগান, পৃষ্ঠা ১৮৬।
৫.	বৌদ্ধধর্ম : পৃষ্ঠা ৩৭।
৬.	The Obscure Religious cults as background for Bengali Literature : Dr. S. B. Dasgupta. p 27.
৭.	ঐ, পৃষ্ঠা ২৭।
৮.	শাক্ত সাহিত্য–পৃষ্ঠা ১২-১৩।
৯.	লোকায়তদর্শন–পৃষ্ঠা ৫৩৯, ৪৫০।
১০.	বিষ্ণুপুরাণ, ছান্দোগ্য ও মৈত্রেয়ী উপনিষদ।
১১.	History of Indian Philosophy–Dr. S. N. Dasgupta, Vol. III, p 527.

তিন
১.	Imperial Gazetteer of India. Vol. IV, pp 174, 176, 183.
২.	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; ১ম খ পৃষ্ঠা ৩২-৩৩।
৩.	ঐ	পৃষ্ঠা ৭৭-৭৮, ৯০-৯১।
৪.	ঐ	পৃষ্ঠা ১৩।
৫.	ঐ	পৃষ্ঠা ৭।
৬.	ঐ	পৃষ্ঠা ৯।
৭.	ঐ	পৃষ্ঠা ১০।
৮.	ঐ	পৃষ্ঠা ১০।
৯.	ঐ	পৃষ্ঠা ৯।
১০.	ঐ	পৃষ্ঠা ১৭।
১১.	Indo-Aryan and Hindi pp. 31-32.
১২.	বৃহদারণ্যক, ১/৪/১০।
১৩.	ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা–ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭।
১৪.	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খ , পৃষ্ঠা ৩৮।
১৫.	শ্বেতাশ্বতর ২/৬/৭।
১৬.	শ্বেতাশ্বতর ২/১৫।
১৭.	কঠোপনিষদ ৬/৩।
১৮.	বৃহদারণ্যক : স বা ইয়মাত্মা ব্রহ্ম, ৪/৪/৫ : ৩/৭/১৫।
১৯.	ছান্দোগ্য; ৬/৮/৭।
২০.	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; প্রথম খ পাদটীকা, সং ২০, পৃষ্ঠা ১০৭।
২১.	ঐ,	পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।
২২.	ঐ,	পৃষ্ঠা ৮২।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৬।
২৪. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯।
২৫. Encyclopedia of Religion and Ethics−Puranas.
২৬. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২৭।
২৭. History of Indian Literature : Winternitz, p 545.
২৮. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস; ১৩২
২৯. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৫-৪৬।
৩০. ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৮।
৩১. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৩।
৩২. ঐ, পৃষ্ঠা ১৭০।
৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা ১৭১-৭২।
৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা ২৯৪।
৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৩১১।
৩৬. কমানবগৃহ্য সূত্র।
খ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা,
গ অথর্ব-শিরঃ উপনিষদ
ঘ Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems−R. G. Bhandarkar.
ঙ শিক্ষা ও সভ্যতা : অতুলচন্দ্র গুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৪৪।
৩৭. জাতিভেদ; ক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী, পৃষ্ঠা ৬৪।
৩৮. Religion and Folk-lore of Northern India, p 250.
৩৯. ঋগ্বেদ : ২/২৩/১
৪০. ক Elements of Hindu Iconography vol. I, pt I, T. Gopinath Rao.
খ Vaisnavism Saivism etc R. G. Bhandarkar. p 213.

চার

১. Encyclopedia of Religion and Ethics Vol XII, P 193.
২. Vaisnavism etc. : P 146.
৩. Post Chaitanya Sahajia Cult of Bengal, M. M. Bose, P 42
৪. ক রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় খ , পৃষ্ঠা ২৯৪।
খ গৌড়পাদসাংখ্যকারিকা ভাষ্য, পৃষ্ঠা ২১।
৫. ভারত দর্শনসার−উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১৪৯।
৬. Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol IV, p 149
(লোকায়ত দর্শনে উদ্ধৃত)
৭. a. Mohenjoda and the Civilization : J. Marshall Vol. I, P 50
b. The Mother Goddess, S. K. Diksit.
c. ভারতের সংস্কৃতি : ক্ষিতিমোহন সেন, পৃষ্ঠা ১১।
৮. লোকায়তদর্শন, পৃষ্ঠা ৪৬৭।
৯. রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ২য় খ , পৃষ্ঠা ২৯৪।

১০. ঐ পৃষ্ঠা ২৮৪।
১১. শাক্ত সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১১-১২।
১২. রচনাবলী : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : পৃষ্ঠা ৩২৫।
১৩. ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৬।
১৪. Obscure Religious cult etc., P 134.
১৫. বৌদ্ধধর্ম, পৃষ্ঠা ৬৯।
১৬. Obscure Religious cult etc., PP 115-16, 120.
১৭. History of Indian Philosophy : Dr. S. N. Dasgupta, Vol. III, P 533.
১৮. Journal of Asiatic Society of Bengal (Science), Vol XIX 1953.– (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১১৭-১৮)
১৯. Lokayata, P 6.
২০. The Holi : A Vernel Festival of the Hindus (in Folklore XXV)– (লোকায়তদর্শনে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৯)
২১. Studies in the Tantras : Dr. P. C. Bagchi, p 102.
২২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬২ সন, পৃষ্ঠা ১০২।
২৩. ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার নবজাগরণ : সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃষ্ঠা ৬।
২৪. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫-২৬।
২৫. বাংলার বাউল ও বাউলগান–ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৮।
২৬. শূদ্র সম্বন্ধে মনুসংহিতার পাঁতি হচ্ছে–

উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ
পুলকাশ্চৈব ধ্যান্যানাং জীর্ণাশ্চৈর পরিচ্ছদা।

ঋষি গৌতমও বলেছেন : জীর্ণানুপানচ্ছত্র বাসা ঃ
–কূর্চান্যূচ্ছিষ্টাশনং।

২৭. প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী।
২৮. বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃষ্ঠা ৪৪৯-৫০।
২৯. ক সেকোদ্দেশ টীকা, পৃষ্ঠা ২৭। (বাংলার বাউল ও বাউলগানে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৪৫)
খ Tantric Buddhism, PP 165-66.
৩০. ক ibid PP 169-74.
খ Studies in Tantras, P 69.
৩১. An Introduction to Buddhist Esoterism, P 48.
৩২. ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ১৬১।
৩৩. ক বিমল প্রভা (বরোদা সংস্করণ)
খ বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য : প্রবোধচন্দ্র বাগচী : পৃষ্ঠা ৪৬ (বাংলার বাউল ও বাউল গানে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫)
৩৪. Indo Aryan and Hindi, P 44.
৩৫. ক বৌদ্ধগান ও দোহা : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১৬।
খ Religion–P. C. Bagchi. History of Bengal, Vol I, D. U. P 423,
গ শূন্যপূরাণ : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রবেশক : ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩-৭।

ঘ Sanskrit Literature : Dr. S. K. De. History of Bengal Vol l, D. U. P 338-39.

৩৬. নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস–দর্শন ও সাধন প্রণালী : পৃষ্ঠা ১৮৮-৯১, ১৫৬।

৩৭. বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্যা–এস, এম, লুৎফর রহমান, সাহিত্য পত্রিকা, শীতসংখ্যা, ১৩৭৬ সন, পৃ. ৯৩-১৩৭।

৩৮. ক বাজুলে দিল মো লক্‌খ ভণিআ–ভাদেপাদ।

খ নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী–বীণাপাদ।

গ সো বাজির নাহুরে ময়ি বুত্ত পবমখো–কানুপার দোহাকোষ।

ঘ জোইনি গাঢ়লিঙ্গণ হি বজ্জিল লহু উপসন্ন।

–সরহের দোহাকোষ।

[অধ্যাপক লৎফর রহমানের প্রবন্ধে উদ্ধৃত]

বিভিন্ন তান্ত্রিকতত্ত্ব ও পদ্ধতির পরিচয়দানের জন্যে আমরা কোনো একটি গ্রন্থের উপর নির্ভর করিনি। হাড়মালা, সাধনমালা, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৃহৎ তন্ত্রসার (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পাদিত) Studies in the Tantras by P. C. Bagchi, Introduction to Tantric Buddhism by Dr. S. B. Dasgu pta. বাংলার বাউল ও বাউল গান : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাঙালীর ইতিহাস : ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়, নাথধর্ম ও সাহিত্য : প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী, নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী : ডক্টর কল্যাণী মল্লিক, সহজসাধনা : রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর, বিবর্তবিলাস : অকিঞ্চন দাস প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার সহায়ক হয়েছে।]

কাজী নজরুল ইসলাম

পূর্ণ-অভিনন্দন [গান]

এস অষ্টমী–পূর্ণচন্দ্রঃ এস পূর্ণিমা– পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি পুনঃ বন্ধ কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ!
এস অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম!
এস অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ছয়বার জয় করি কারা-ব্যূহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ!
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত-বাঁধ ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি ফণী-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী!
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী!
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার! স্বাগত হে দেব-সেনাপতি!
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমরা ধ্বংস-মার!
এস অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার!
এস অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি!
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিপ, এস প্রতাপের হারা-তরবারী!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ!
জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি মাটিতে কোল,
শ্যামল শস্যে হরিৎ ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম আঁচল ।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, "কই রে আমার দুলাল কই?"
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

মোছ আঁখি-জল, এস বীর! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায়!
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

এস বীর! এস যুগ-সেনাপতি! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্‌গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আঁখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারিপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর!

ডানার স্বপ্নটা আর নেই

পত্রল ব্যবধানে আমি যে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
সেখানে পাখির মতো গুলি পড়ে
বুলেটবিদ্ধ ছায়ার নিচে
ছেঁড়া পালকের স্তূপ ছাড়া কিছুই দেখাবার নেই আমার
বুলেট আর পাখিদের সাথে এভাবে আমার
স্বপ্নের সংযোগ
যেন পাতা
পাখি হতে চেয়েছিল
পাখি মৃত্যু দিয়ে লিখেছে সেই শোক
তাই ভাবছি
উড়বো না
আকশ মাতিয়ে এলে মনে হবে

ডানার স্বপ্নটা আর নেই।

লবণ প্রার্থনার দিনলিপি

বাগান সংগুপ্ত রেখে
তুমি কেন পাথর ভালোবাসো?
দেয়ালে শ্যাওলা জমে
কাঠামো গুঁড়িয়ে দিলে ধুলো জমে
প্রত্ন- প্রবেশিকায়
অতীত মোহিত করে তুমি কেন
পিছনে হাঁটো?

তালগাছ নীরবে বাড়ে। ঝড়েও লুটিয়ে পড়ে না।
তোমাকে পাহাড় দিলাম। মৌনতায় উঠে আসো।

পুলক ছড়িয়ে দিলে
সঙ্গে কিছু বিষাদের দায় থেকে যায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে জীবন মিলিয়ে দেখো
সমুদ্র কখনো লিখবে না লবণ প্রার্থনার দিনলিপি।
বিষাদ তাড়িত হলে তুমি কেন আকাঙ্খা মাড়াও?
অপূরণের দাবানলে
মানুষ কেবলি ছাই হতে চায়, সোনা নয়।
হৃদয়ে আকাশ গুঁজে রাখো
মেঘে মেঘে স্বপ্ন খুঁজে পাবে।

মৃত্যুকে প্রেমের জন্য উপাত্ত ভেবো না
তোমাকে শোনবো লুপ্ত পাথরের গান।

(লখিন্দরের গান কাব্যগ্রন্থ থেকে)

A Method of Colonization

Zafrullah Chowdhury

Bangladesh, we say, has suffered from wars, poverty, overpopulation, and natural calamities. Now we are coming to see that it has suffered as much if not more deeply, from 'invested aid', or, aid given to primarily benefit the wealthy country. Let us look specifically at what has been developing in the area of medical research.

In 1905, Frederick T. Gates, main administrator of the Rockefeller assets, and a former Baptist minister, informed Rockefeller that "Quite apart from the question of persons converted, the more commercial results of missionary effort to our land is worth a thousand fold every year of what is spent on missions ....our export trade is growing by leaps and bounds. Such growth would have been utterly impossible but for the commercial conquest of foreign lands under the lead of missionary endeavour. What a boon to home industry and manufacture."[1]

Medicine : Force for Colonization

But it did not take long for these concerned imperialists to see that medicine could accomplish even more for them than the missionary. Throughout the underdeveloped areas of the world, the great philanthropic foundations became aware that "medicine was an almost irresistible force in the colonization of non-industrialized countries."[2] But this medical care must remain in

their control if it was to continue primarily for their benefit. In the Rockefeller international health programs, it was assured that "the entire control of all the money would be held by our people and not the natives."[3] In pre-Mao China, the Peking Union Medical College which had been removed from the control of missionaries and placed under the direction of the Rockefeller Foundation "was conducted entirely by their own staff from New York and a local office in Peking."[4]

The endeavour met with marked success. It was William R. Welch, the first dean of the Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, who lauded American medical scientists for their part in their country's "efforts to colonize and to reclaim for civilization, vast tropical regions."[5]

A New Imperialism

Now a new age has set out to 'reclaim' a new republic, Bangladesh. In the past, as now, the glutted American market cried out for colonies to consume its goods. The medical research situation in the United States today, contains the same urgency to find regions for expansion.

First, the US professional in the area of medical research, finds himself in a highly competitive system. Experience, not easily obtained at home, is required to gain positions, promotions, etc., and often just to "stay afloat" in his professional field.

Second, universities in the States are presently in dire need of funds, and increased prestige. Research works offers the opportunity for both.

And third, the large drug companies seeking to increase their profits are out to expand the market.

Bangladesh, because of the difficulties that it has faced in health and population, offers unlimited opportunities to each of the three groups described above.

The Third World As Laboratory

The procedure is somewhat standardized. The large university offers job opportunities and attractive side benefits to young professionals, and approaches the underdeveloped, overpopulated country with a plan related to health, nutrition, and family planning, financed in large part, if not entirely, by the United States. Government officials from the host country, while

maintaining their government offices, are employed by the US university project, in limited number. This gives the project, the necessary 'in' with the local government, while at the same time not being required to sacrifice any real control. No national is trained to the point where he could assume responsibility for the project, independent of the foreign power.

The project gains in stature and fame. Studies are made and published reports are given, statistics are compiled, with the local population all the while furnishing an excellent laboratory for ambitious young foreigners and the prestige and fund-conscious university.

Avoiding Solutions

What are the benefits accruing to the underdeveloped host nations? In the line of scientists trained to carry on the work, it is nil. Further, the preponderance of foreign research stultifies any growth of local efforts, making a monopoly of health science. The population is used, while effective solutions to the problems of health and family planning are subtly avoided. This avoiding the real solution is an art that American medical researchers are often forced to practice in the US. Incredible sums of money are spent seeking cures for such killers as hypertension and cancer, cures which the scientist knows must be avoided, for, in the US as here, discovering the real solution would lead to a radical change of the life style and economic system, and place in a rather uncomfortable position, the men who control research.

Johns Hopkins Again

This past year, the deanship of the John Hopkins School of Hygiene and Public Health was offered to a medical man with a missionary background who refused it, opting instead for the office in Dhaka, (something that could eventually lead to more than a deanship. From here he will help to engineer a new plan for the old imperialism.)

Recently, he and some former members of the Cholera Research Laboratory (CRL) staff, presented the Government of Bangladesh with a proposal for what the authors call an International Institute for Health, Population, and Nutrition Research. The Government has been asked to consider the proposal in light of the fact that funds for the Cholera Research

Laboratory will no longer be forthcoming. A subtle but nonetheless insidious pressure. And it might be noted that one expatriate will receive over the next 6 months, 1.5 million Taka from the Ford Foundation for the work of arranging with the government the drawing up and finalizing of the proposal's official and legal aspects, without delay.

It was Ford Foundation which also, in 1974, sponsored a 'trip abroad' for a former minister of health and family planning, who did not agree with the 'advice of the experts' to split the ministry. The Foundation still continues this same procedure.

The proposal for the Institute is a clear example of national interests in the areas of health, population, and social services being absorbed into the control of a foreign state. Let us look more closely at the proposal itself, which step by step illustrates how the institute, primarily planned for the benefit of US researchers, will cripple any attempt on the national level for an effective, independent health and family planning programme. Bangladesh will serve as a laboratory whose population may or may not benefit from the experiments. And all will be done in collaboration with, under the management of, through funds and personnel in the control of the US.

In The Interests of USA

The proposal contains the following quote : "Establishment of a training program for young investigators from developed countries such as the US will require development of direct institutional ties with US or other university and training institutions. These ties should be encouraged in order that young scientists from the developed countries can gain the skills and the expertise necessary to address health, population, and nutrition problems in the developing world."[6]

It is not experienced scientists who are being sent to offer expertise. It is young men, needing experience, and who, if they follow the pattern of the Cholera Research Laboratory scientists, will only be speaking English when they address the health problems of the developing world.

The proposal goes on to say that, "The key to the development of the proposed research program will be the recruiting of expatriate scientific manpower to conduct the research program."[7] and that "This research program does not envision the

requirement for expanding the local technical and supporting staff."[8] It then notes that "There are very few other Bangladeshi professionals that can be recruited in the requisite careers."[9] It fails to further elaborate that there are three Bengali scientists at the lab who were trained elsewhere before the inception of CRL. However, the quotes do indicate quite clearly what has happened in regard to the CRL training of Bangladesh scientists, and what will happen with the new proposal. In both instances Ñ nothing. If during the 1960's alone over 100 US scientists were trained at the CRL, why, after the 16 years of its existence are there no Bengalis trained for the required positions. Certainly not because capable people can't be found. The intent of the lab had never been to train Bengali scientists. And neither it is the intent of the new proposal. The new proposal intends to maintain the hospital and field work as these are areas where the Bengali staff can be absorbed and they need not infringe on the scientific end.[10]

However, there is one special post for a senior Bengali administrative official, who will be "fully responsible for all of the administrative activities associated with local operations in Bangladesh." This can be seen from a few perspectives, but mainly it will serve to keep government officials at arms length. Having such an official on the payrole who will not have to answer to other Bengali official in regard to the laboratory, will create the desired situation for unfettered, unchecked research. But why a senior official? In the youth-worshipping US it is not the senior man who holds the responsible position, or is given the real work. More often he is given the door. Why will Bangladesh get the senior? Such a position is designed as bait for the government official or his friends who are on the verge of retirement, and will spot in the proposal, if not the opportunity for an effective post, at least for a flattering one. Of course the seniorty will offer some weight with the government.

But weight with government will come from other areas too. The proposal tells us "Unrestricted funds must be available, so that the scientific staff can be recruited from any nation where they may be available."[11] The program is envisioned as operating with "multiple sources of funding from a variety of international agencies and governments."[12] With over 50% of the funds, all of which will be controlled by the 'international' board, coming from the US. This is real power and weight with any government.

Further, the proposal reads that "Crucial to the successful operation of the lab is adequate administrative back up support in the US for management, procurement, shipping of supplies, and equipment, as well as of management activities related to the expatriate staff."[13] Procurement, shipping, supplies, equipment, the new market for American products and inappropriate technologies, is opened up. And the US will manage all, even the activities of the expatriate staff.

Why Bangladesh?

".... in conjunction with studies of immunological responses to naturally acquired infection", the proposal tells us, "there will be a program of studies of the human response to artificial immunization by a variety of routes." The study has begun with animals in the U.S. The next step will be the human population of Bangladesh.[14]

Why is it that Americans, so fond of the "sacred rights of individuals" see only masses when they are looking east? Bangladesh, too, is a country whose people have individual longings and fears, and even individual rights.

Once the individual is lost sight of medical research becomes pointless. There is no one to serve, only the ego addressing the statistics. Further, once the individual is lost sight of, scientific truth cannot be maintained. Perhaps we should have know it all along, but now the 'proposal' spells it out for us. The purpose of the Cholera Hospital was not primarily to serve individuals, but rather for the support it gave to the job.[15] As for the field surveillance operation in Matlab, "it is absolutely fundamental to the entire epidemiological reseach programme as well as to all population related studies."[16] Does it matter that it might have possibly been an opportunity to help people?

And then one comes across such a statement as the following, in the proposed program. "Improving the nutritional status of lactating women will lead to shortening of the period of amenorrhea resulting in birth at shorter intervals. This would not only be detrinental to the welfare of the infant, but would also lead to rising birth rates and more rapid population growth.[17] Chronic malnutrition may be effective in suppressing fertility by prolonging the duration of lactational amenorrhea ...."[18] What is the author trying to convince us of? That was should strive to maintain a malnourished Bangladesh? It is hardly sick people, or

hungry people, or people, that is the concern here. It is such things as "an understanding of the biological and social changes affecting human reproduction performance during times of famine."[19] Research and study, nothing beyond. The plans and the experts who deluged the country after the war of liberation did nothing to prevent the famine in 1974, but then, perhaps the aim was only to understand the biological change talking place in the inhabitants.

Unapplied Research

The older cholera vaccine has proven virtually ineffective in preventing the disease. A later experiment with a cholera toxoid vaccine has proved equally ineffective. Now a study is being conducted that will further observe the two ineffective vaccines! 50% of all deaths in the nation are due to diahoreal disease. Over 60% in the case of children. The major achievement of CRL is simplified oral therapy, but this remains unavailable, throughout most of Bangladesh, to patients in serious condition. Intravenous fluids for cholera were introduced in the 1830's but remain unavailable to rural Bangladesh even today. An editorial in the November 27, 1976 issue of LANCET, an international medical journal, points out how the record of cholera research has been marred by this failure to apply the same. It has also been noted that villages whose water is contaminated by material from Matlab Cholera hospital have attack rates for cholera and diahoreal disease that is 20 times higher than the average. It illustrates the efficiency of research, that can create and perpetuate endemic area in which to observe the ineffective vaccines.

And all of this accomplished on an annual budget of 1.7 million dollars. One million going toward financing the home leaves, vacations, education, recreation, elaborate homes and furnishings, etc., of seven expatriate staff while the treatment of diahoreal patients and a Bengail staff of 770, share the remainder. The new proposal calling for 25 million in the next few years, with an additional 12 expatriate staff, and no more Bengalis, Ñ but for the senior official, is a budget obviously designed to alter the life style, but only in the direction of added luxury.

Because of the framework of the proposal and existing institutional links with Ford Foundation, World Bank, and USAID,

all research in areas covered by the Institute have to pass through the program. Monopoly is the result. A monopoly of science stifling any growth of the Bangladesh scientific institutions. And the institute is not primarily, nor secondarily concerned with training Bengali scientists.

The large amount of foreign funds remaining in the full control of foreign groups will serve, consciously or unconsciously, as a pressure on government and state institutions. The result is freedom in Bangladesh for American research universities. And freedom in Bangladesh for American exporters of medicine and medical equipment, who may be researching new products for undesirable side-effects.

The following is an example of what can happen, except that it will be more difficult to challenge abuses of the Institute as it will have been granted prior controls.

The Johns Hopkins Fertility Research Project in Bangladesh found in one of their own studies done in Matlab on the use of the injectable contraceptive, Depoprovera, that is disturbed menstruation radically, and lessened lactation. In another area of Bangladesh, the only other study done in the country on Depoprovera, this one on a much larger scale, came up with the same indications in regard to menstruation and lactation. However, the Johns Hopkins Project, after changing the authorship of this larger study, deleted facts pertinent to the point of decreased lactation among Bengali women, and vaguely sited studies from “other countries” to tell us that they do not report a decrease in lactation, but rather “an increase.”[20] In this instance we risk making a failure of a very promising method of contraception, the Depoprovera injection, by a too hurried approach, without the proper back-up services and follow-up.

Another instance of researchers and advisors acting with apparent disregard for the people and the environment is the (World Bank) idea of putting a laproscope, a highly sensitive, sophisticated instrument requiring both electricity and gas in order to function, into every Rural Health Center (RHC) in Bangladesh. Even every hospital in Britain does not have a laproscope.

We must become aware of the fact that medical researchers are ‘experts’ operating primarily for their own interests.

The Experts

Recently in Dhaka airport, I met an acquaintance who said to me in the course of our brief discussion that he had counted 72 experts in Dhaka on that one day alone. And yourself, I asked '73', he admitted. It will be an uphill road, overcoming this favourable bias toward the wisdom of the west. For a long time to come we will continue to credit foreign expertise unquestioningly with any knowledge it may lay claim to.

Who are these experts that come from thousands of miles away with the perfect plan for a village they have never seen, and a culture they have never lived. One such expert on smallpox eradication qualified as a motor mechanic. But then, he was a foreigner.

Our "western trained medical profession sanitary inspectors originating in the British Empire, the malaria program established by WHO. ... the Rural Health Centres devised by western public health experts, and most recently, the family planning programs",[21] all are forms of expatriate expertise that have left the health and family planning system of Bangladesh crippled, confused and utterly dependent.

The present split of the health and family planning ministries is the result of 'expert advice' from World Bank and USAID planners who felt the population problem would be effectively met in this manner. Now we have the doctors being hired for family planning work and paid 30% higher than the health ministry doctor who is working in the same rural area within another narrow field. One can foresee the difficulties that will arise here without too much imagination. We will have family planning offices in each union, and a sub-center in each union, and offices for the health ministry. There are 92 maternity centres with twelve rooms each, and 205 Rural Health Centres (RHC). In another five years there is to be another 150 RHC's, but these, with their 30 rooms each cannot be used for the family planning work. Nor can the Lady Health Visitors (LHV), who are working in the Maternity Centres and are designated as family planning workers, be able to count on the doctors of the RHC for the back-up and support needed if their work is to be effective.

The family planning ministry envisions one worker per 5000 people, an impossible task for someone with one month training and no support or guidance in the field. If the government had

continued with its original integrated scheme, it would be in a far more effective position to deliver health and family planning services.

It is accepted that Bangladesh needs barefoot doctors, people trained in the village to meet the needs of the villagers, but the World Health Organization experts proposed an elaborates 3-yr. program to produce medical assistants. This training will take place in the towns and most of the students will have a background of 12 years formal education. In one centre visited, 65 out of 80 enrolled had had twelve years or more educational background, and nearly all felt that the course itself should be four years or more if the program was going to equip them to "better serve the people". Serve, no doubt in Dhaka, or Libya as experience attests. But the expert advisors of WHO refuse to see any other way.

These are the experts. They have been with us, as was noted earlier, for some time. Will we sell ourselves out to unconditionally now? There are real experts, however, and there is such a thing as appropriate aid. And neither it is impossible to discern the real from the 'invested aid'. Does the plan provide for local responsibility in the foreseeable future? Does it reach the real problems with realistic solutions? Is it honest in assessing its weaknesses as well as its strengths? The Companyganj Integrated Health Project in Noakhali is an example of appropriate aid. Now, under Bengali leadership which has been capably trained to assume the responsibility, it is meeting real health needs in a practical way.

The nutrition and women's programmes of UNICEF were also attempts in the right direction.

And as we acknowledge the truly beneficial and helpful work of certain foreign assistance, neither can we fail to accept the fact of our own weaknesses, which surely exist. Yet we do not want to compound and nourish these weaknesses by importing others.

Death Blow to Bangladesh Health Care

But 'inappropriate' aid is concerned with its own purposes. The proposed institute will give researchers free rein to use the people of Bangladesh and the institutions of Bangladesh to further the purposes that suit them. And it may well be the death blow to our

own health system, whether scientific research or delivery of services.

In a review of a book edited by the man now employed to draw up the contract for this new international proposal, we can see that this is no spur of the moment inspiration, but something a long time germinating. Referring to the editor's plan for an international group designed to meet disasters, Malcolm Segall of the Institute of Development Studies at Sussex University in Englang remarks, All the material resources are in the hands of 'prospective donor group' and the international body, and the national coordinating body is entirely at the mercy of inappropriate foreign technology, being guided by 'management experts' (we know where from), 'data processing equipment' (we know where from), and even computers stationed abroad. A better prescription for dependency could hardly be imagined.

One day we hope that true internationalism will be a reality. But the 'internationalism' of this book, of the US Agency for International Development, the World Bank, and, in important respects, of some of the United Nations technical agencies, hides imperialism. It takes as given that the rich capitalist states are rich and the poor peoples of the world are poor and the relief must come from the former to the latter with the paternalistic help of the former's 'technical advisors'.[22]

The proposal threatens the sovereignty of Bangladesh. It perpetuates the image of starving baby syndrome and basket case Bangladesh, to attract funds for foreign researchers. It disregards the fact that there is talent and ability in Bangladesh, and there is a dignity both among our professionals who will no longer tolerate being treated like school boys, and among our people in general who will not much longer tolerate being treated as mere statistics at the cost of their better health.

[Published in 13th & 14th January, 1977 issues of the daily BANGLADESH TIMES, Dhaka, Bangladesh.]

Footnotes

1. F. T. Gates to J. D. Rockefeller, Dec. 12, 1910. (Record Group 2), Rockefeller Family Archives.
2. E. Richard Brown, Ph.D, "Public Health in Imperialism : Early Rockefeller Programs at Home and Abroad".

3. J. H. White to W. Rose, Aug. 14, 1915, and W. Rose to J. H. White, Aug. 17, 1915, International Health Commission files, Rockefeller Foundation.
4. E. Richard Brown, Ph.D, "Public Health in Imperialism".
5. W. H. Welch, "The Benefits of the Endowment of Medical Research". In addresses Delivered at the opening of the Laboratories in New York City, May 11, 1906.
6. W. H. Mosley, "Proposal for a Five-Year Research Program for the Cholera Research Laboratory, Dhaka, Bangladesh, April, 1976 (p. 61).
7. As Above, p.62.
8. As above.
9. As above.
10. As above, p. 10.
11. As above, p. 62.
12. As above, p. 58.
13. As above, p. 63.
14. As above, p. 28.
15. As above, p. 64.
16. As above.
17. As above, p. 43.
18. As above, p. 50.
19. As above, p. 38.
20. "Contraceptive Use of Medroxyprogesterone Acetate (Depoprovera) In Rural Bangladesh" (Falsified paper on study results).
21. Colin Me Cord, "What's the Use of a Demonstration Project", 1976.
22. Malcolm Segall, Review Articles, International Journal of Health Services, Vol. 5, No. 3, 1975.

References

Brown, E Richard, Ph.D., "Public Health in Imperialism : Early Rockefeller Programs at Home and Abroad" Paper delivered at the 103rd annual meeting of the American Public Health Asso., in Chicago, Illinois, November 20, 1975. (Accepted for publication in the American Journal of Public Health).

Chen, Lincoln C., (Ed.) Disaster in Bangladesh : Health Crises in a Developing Nation, Oxford University Press, New York, 1973.
Gates, F. T., to J. D. Rockefeller, Dec. 12, 1910, Record Group 2, Rockefeller Family archives.
LANCET, Editorial, November 27, 1976.
Mc Cord, Dr. Colin, "What's the Use of a Demonstration Project", The Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health, Dept. of International Health, Baltimore, Md. Mosely, W. H., "Proposal for a Five-Year Research Program for the Cholera Research Laboratory, Dhaka, Bangladesh", April, 1976.
Segall, Malcolm "Review Articles", International Journal of Health Services, Vol. 5, No. 3, 1975.
Welch, W. H. "The Benefits of the Endowment of Medical Research", In Addresses Delivered at the opening of the Laboratories in New York City, May 11, 1906.
White, J. H. to W. Rose, August 14, 1915, and W. Rose to J. H. White, August 17, 1915, International Health Commission files, Rockefeller Foundation.

গল্প

তারিখ

....

মো হা ম্ম দ আ সা দু জ্জা মা ন

সেবার দেশে খুব আকাল লেগেছিল। আকালের ছুতো করে ডাক্তাররা কম প'সা দিত। দিনে পাঁচ-সাতটা লাশ কেটেও দু'সের চালের দাম হত না। দশ-বারো টাকা সের চাল। ইচ্ছে করলে সে-ও হের-ফের করে কাঁচা পয়সা কামাতে পারত কিন্তু তা করেনি। শুয়ে শুয়েই ভাবছে ও। যক্ষা রোগী। দু'মাস একেবারে বিছানা নিয়েছে। আজ ওর কত কথাই-না মনে পড়ছে।

একদিন ডাক্তার বলল, একটা কেলেঙ্কারি-লাশ আছে। রাতের মধ্যেই ওটার কাটা-ছেঁড়ার কাজ সেরে ফেলতে হবে। অমনি মানোয়া লাশ কাটা ঘরে ঢুকল। সাথে সুখলাল। তার সমবয়সী। দোহারা চেহারা দু'জনেরই। ঘরে ঢুকেই একেবারে থ' মানোয়া। লাশ দেখে ওর বিশ্বাসই হয় না যে ওটা লাশ! জীবিত মানুষ নয়! একেবারে তরতাজা। একটি কিশোরীর লাশ। বিষ খেয়েছিল অভাগীটা। বিড় বিড় করে মানোয়া। চাকু চালাতে বড়োই বাধো বাধো ঠেকছে। তবু কাজ শুরু করল মানোয়ারা। পুরো চাদরটা সরাতেই সুখলাল লাশটির ভেতর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে কী যেন খুঁজতে থাকে। মানোয়া এ-ধরনের আচরণকে সহ্য করতে পারে না। দিক-বিদিক না-তাকিয়ে সে সুখলালের দু'গালে পটাস পটাস দু'টো চড় কষে দেয়। দাঁতের গোড়া দিয়ে কলকলিয়ে রক্ত বেরোয় সুখলালের। গর্জে উঠে মানোয়া–

ছালা, নিমুকহারাম। যেতা তোকে খোরাখ দিচ্ছে, সেতার সাতে বেইমানি করছিছ!

অন্য কেউ হলে, সুখলাল এতক্ষণে ঝাঁপিয়ে পড়ত বাঘের হুংকার দিয়ে কিন্তু মানোয়া'র বেলায় সে নিরুপায়। কিছু বলেনি সুখলাল। মাথা নিচু করে শুধু চোখের পানি মুছেছে সে। এই কি সেই মানোয়া? যে দু'তিনটে লাশ চাটাইয়ে মুড়িয়ে বগলে ফেলে, অনায়াসে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিতে পারত? নিজের শরীরের দিকে চেয়ে চমকে ওঠে মানোয়া। ভাগ্যের উপর দোষারোপ করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কত আর শুয়ে থাকা যায়। দিন-রাত শুয়ে থাকতে থাকতে হাড়-গোড়ে ব্যথা জমে গেছে মানোয়া'র। অহেতুক ঘুমোবার চেষ্টা করে। চোখ বুজে থাকে অনেকক্ষণ। ঘুম আসে না।

খুট করে শব্দ হয় দোরগোড়ায়। পাশ ফিরে তাকায় মানোয়া। মিন্নতি। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ওর বউ। বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। মিন্নতির মুখটা ভার। চোখগুলো গর্তে ডুবে গেছে। যেদিন থেকে মানোয়া বিছানা নিয়েছে সেদিন থেকে মিন্নতির বড়ো কষ্টে দিন কাটছে।

নিউমার্কেট ঝাঁট দেয় মিন্নতি। সকাল-বিকেল দু'বার। দেড় শ' টাকা মাইনে। বেশির ভাগই বাকি থাকে। গত-মাসের টাকাগুলোও মানোয়া'র পেছনেই খরচ হয়েছে। নিচু গলায় মানোয়া জিজ্ঞেস করে–

কুছু হলোরে মিন্নতি। ডাক্তারবাবু কুছু কহিছে।

মানোয়া'র ভর্তির ব্যাপারে খুব দৌড়াদৌড়ি যাচ্ছে মিন্নতির। কোথাও ভর্তি করা যাচ্ছে না। সবাই আশা দেয়। সিট খালি হলেই ভর্তি করে নেবে। মনের সত্য কথাটা ঢেকে রেখে মিন্নতি হাসে। মিথ্যে আশ্বাস দেয় মানোয়াকে–

হারে মানোয়া হা, তোর ভর্তির ছব থিক কারিয়াই হামি চালিয়ে এলাম। তুই ছুদু খাবি-দাবি আরাম করিবি। দেখে লিছ ছব থিক হয়ে যাবেরে। মিন্নতি মানোয়া'র চুলে হাত বুলায়। মানোয়া মিন্নতির হাতটা চেপে ধরে ওর মুখের দিকে চায়। মানোয়া'র চোখ দুটো সকালের রোদের মতো চিক্ চিক্ করে হাসে। হাসপাতালে ভর্তি হলেই বাঁচা যাবে। আবার আগের মতো দেহ-মন ফিরে পাওয়া যাবে।

মানোয়া'র ভর্তির ব্যাপারে যখন কোনো কিনারাই হয় না তখন খুব খুব করে রাগ হয় মিন্নতির। কাঁদো কাঁদো স্বরে একাই বলতে থাকে– কতো কহিলাম, রে মানোয়া বাংলা টালিস্ লা। তাড়ি ছুবিলা। হামার কতা ছুনলে লে তো! এলা থেলা ছামলিয়ে লে লে।

মানোয়া মিন্নতির এ-রাগের ভাষা বুঝে। বুঝে বলেই আরো দুঃখ বাড়ে ওর জন্যে। মিন্নতি যে ওকে অসম্ভব ভালোবাসে। ভালোবেসেই ওদের বিয়ে হয়েছিল। ঘরের ভেতরের ঘটি-বাটির দিকে অকারণ চেয়ে থাকে মানোয়া তখন। খোঁজ খবর নেয়। দোরগোড়ায় লেঠা মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে মিন্নতি। বোশেখের উপড়ানো পাটশাকের মতো কেমন নেতিয়ে পড়েছে। মানোয়া'র কী যে মায়া হয়। কথার রেশ পাল্টিয়ে কথা পারে মানোয়া–

মিন্নতিরে, ছোটটা কলছিমে জল লিয়ে আছতে তোর বহুৎ লাগেরে। আজ একতা বড়া কলছি লিয়ে আছবি লা হয়।

মানোয়া'র অপ্রাসঙ্গিক কথা শুনে মিন্নতি কাঁদবে না হাসবে ভেবে পায় না। একে তো যক্ষ্মা রোগী, তার ওপর কোনো পথ্য নেই। রক্ত যাওয়া এক মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ নেই। কী দিয়ে যে কী হবে, সে চিন্তেয় বাঁচে না সে। আর মানোয়া বলে কলসির কথা। বুক ফেটে কান্না আসতে চায় মিন্নতির। মানোয়াকে শুনিয়ে শুনিয়ে ছড়া কাটে–

কানা কহে কান কথা,

আর থছা কহে হামার বিহের কথা !"

আস্তে উঠে মাচার কাছে শিকায় হাত বাড়ায় মিন্নতি। সকালের কিছু তুলে রাখা জাও থেকে দু'তিন চামচ মাটির শানকিতে করে মানোয়া'র সামনে দেয়। খুব নরম করে বলে–

ল্যারে মানোয়া, এত্তু খেয়ে লে।

মানোয়া'র শরীরের দিকে চেয়ে অস্ফুট স্বরে আবার বলে–

শরীলডা একেবারে ছুকাইয়া গেছে।

মিন্নতির চোখ দুটো হঠাৎ করে আষাঢ়ের উপচে-পড়া নদীর মতো ছল্‌কে ওঠে। মিন্নতির চোখে-মুখে চিন্তার রেখাগুলো আরো স্পষ্ট দেখায়। ঘাড়ের নিচে হাত দিয়ে মানোয়াকে তুলে বসায়। বুকের হাড়গুলো স্পষ্ট গণা যায়। চোখ দুটো পাখির বাসার ডিমের মতো পড়ে আছে। মানোয়াকে একটা পালকহীন শকুনের মতো দেখায়। কাঁসার গেলাসে একটু ওষুধ ঢালে মিন্নতি। বেরিয়ে যাবার সময় খুব আদর করে বলে মিন্নতি–

আছুদটুকু খেয়ে লিছ। হামি লিউমার্কেত গেলাম। দাক্তার ছাব তলব করিছে।

মানোয়া ঘাড় কাত করে মিন্নতির কথায় সায় দেয়। বাইরে থেকে কায়দা করে বাঁশের দরজাটা এঁটে দেয় মিন্নতি। এবং সে চলে যায়।

সালেহ চৌধুরী হাসপাতালের বড়ো ডাক্তার। মিন্নতি চেনে তাকে। মানোয়াই একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। মিন্নতি কাঁচু-মাচু করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সব কথা জানাল। এক সময় ধৈর্য রাখতে পারে না সে এবং কান্নায় ভেঙে পড়ে। হুমড়ি

খেয়ে ডাক্তারের দু'পা জাপটে ধরে মিন্নতি। বিচ্ছেছ করবেন লা ছার, হামার মানোয়ার ছরিল খালি ছুকাইয়া যায়। ছুদু জল খেতে চায়। তাজা তাজা রক্ত যায়। কুছু খাইতে পারেলা। রুপিয়ে থাকলে তো ভালো খানা মিলবে। তাতো লেই।

ডাক্তার টেনে তোলে। চেয়ারে বসিয়ে শান্ত হতে বলে। মানোয়া'র ভর্তির সব সম্ভাব্য ব্যবস্থা করে দেবে বলে আশ্বাসও দেয়। কিছু ক্যাপসুল মিন্নতির হাতে দিয়ে দিনে তিন বার খাওয়ানোর পরামর্শ দেয়। একটি ছোট চিঠি মিন্নতিকে দিয়ে বলে–

আগামী মাসের ৮ তারিখে ওকে মহাখালী টি. বি. হাসপাতালে নিয়ে যেয়ো। ওরা ভর্তি করে নেবে। চিঠিটা দেখালেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

চিথি দেখালেই হবে বাবু? ভর্তি করিয়ে লেবে?

আনন্দে আত্মবিহ্বল মিন্নতি।

হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আমিও বলে দেব। শোনো, ওকে পানি কম দেবে। পারলে ডাবের পানি খাওয়াবার চেষ্টা করো।

ওষুধ এবং ছোট্ট চিঠিটা হাতে নিয়ে কৃতজ্ঞতায় মিন্নতির ভেজা চোখ দু'টো আনন্দে ছল ছল করে উঠে। তড়িঘড়ি ঘরে ফেরে মিন্নতি। এরই মধ্যে মানোয়া ঘুমিয়ে পড়েছে। মিন্নতি খুব খুশি হয়। একটুও ঘুমোতে যে পারে না। এক-আধটু ঘুমোলে মিন্নতি ঘরের ভেতর টুঁ শব্দটিও করে না। ৮ তারিখে ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে কথাটা বলার জন্যে সে নিঃশব্দে মানোয়া'র ঘুম ভাঙার প্রতীক্ষায় শিয়রে বসে থাকে।

বাইরে একটি ট্রাক দৈত্যের মতো শব্দ করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সামনে চলে যায়। শব্দে ঘুম ভাঙে মানোয়া'র। মিন্নতির ভীষণ রাগ হয়। ট্রাক ড্রাইভারের চৌদ্দ গোষ্ঠীর উদ্ধার করে সে। প্রথমে সে মানোয়াকে কুলকুচা করায়। ডাক্তারের দেয়া একটা ক্যাপসুল খাইয়ে দেয়। আর বলে মানোয়ারে, তোকে তি. বি. হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে লেবে। লিউমার্কেতের দাক্তার ছাব কলো। এই দেক চিথি। আঁচলের গিঁট খুলে যত্ন করে চিঠিটা দেখায় মানোয়াকে। মানোয়া চিঠিটা হাতে নেয়। পড়তে পারে না। তবু ওটা ভর্তির চিঠি। বুকে জড়িয়ে ধরে। আনন্দে ওর চোখে সত্যি সত্যি জল আসে। উঠে আচমকা বসতে চায়। কিন্তু একটু উঠেই পড়ে যায় বিছানায়। মিন্নতি বাধা দেয়। উঠতে বারণ করে। আহা হা হা, তুই চুপ রহ। হামি সব করিয়ে লেবে। দেখেলিছ। আত্মহারা মানোয়া চিঠিটা বুকে চেপে ধরেই বলে–

হামি ছমঝে রে মিন্নতি ছমঝে। লিউমার্কেতের দাক্তার বাবু বহুৎ ভালো লোক আছে।

মিন্নতি একটু স্বস্তি বোধ করে। এতোদিনে ভগবান ওর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। একটু আশায় হাতছানি। মানোয়া বাঁচলেই তো ওর প্রকৃত বাঁচা।

যেদিন নিউমার্কেটের সালেহ সাহেব ভর্তির কথা বলেছে, সেদিন থেকেই যেন মানোয়া আস্তে আস্তে সেরে উঠছে। বেশি বেশি খেতে চায়। কাশ-রক্ত কমে গেছে। একাই উঠে বসতে পারে।

দু'দিন যাবত মিন্নতির চোখে স্বস্তির ঘুম। গত দু'তিন মাসে ভুলেও চোখের পাতা এক করতে পারেনি সে। মানোয়া'র গা টিপে দেয়া, এই পানি, এই ওষুধ, কাশ-

রক্ত পরিষ্কার করা। বাইরে আনা-নেয়া করতেই রাত শেষ হয়ে যেতো। একেবারে দুর্বিষহ জীবন হয়ে উঠেছিল মিন্নতির।

আজ সকাল থেকেই গা উঠছে না মিন্নতির। ঘরের সামনের রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে বসে একটি কাক বার বার মর ডাক ডাকছে। মিন্নতির মনে কোনো আশঙ্কা জাগে না। সকালবেলাই একটি শানকি হাত থেকে পড়ে ভেঙে খানখান হয়ে গেল। মিন্নতির বুকের কাছে মৃদু সংশয়-কম্পন উঠতে চায় কিন্তু সে প্রশ্রয় দেয় না। তবু কেন যেন গা চলে না কাজে। আজ কত কাজ। মানোয়াকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব আজকের কথাই তো বলেছিল। মানোয়া'র ভর্তির তারিখ আজ।

মানোয়া'র মুখ-হাত ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দেয়। বালিশের নিচে চাপা দেয়া ইস্ত্রি করা নিলেমি জামাটা পরিয়ে দেয়। চুল আঁচড়িয়ে দেয় সিঁথি করে। নিজের সাজটাও করতে থাকে। ওর মায়ের দেয়া বিয়ের শাড়িটা পরে। কোনো উৎসব ছাড়া ওটা সাধারণত পরে না সে। হাজার হলেও বিয়ের স্মৃতি। চুলের এ-পাশ ও-পাশ দু'টো টান দিতে গিয়ে বাধা পায় মিন্নতি। চিরুনি ঢুকে না। জমবে না ময়লা! কতদিন সাবান পড়েনি চুলে। একটা ৫৭০ সাবান ছিল তা-ও মানোয়া'র রক্তমাখা কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতেই কবে শেষ হয়ে গেছে। আর আনা হয়নি। আর চুলের যত্ন ! যার জন্যে যত্ন, সে তো বিছানা নিয়েছে। কে বলবে–

আহারে মিন্নতি, তোর লম্বা লম্বা কালো চুলের বাহার হামাক্ পাগল করিয়ে দেয়। আর দুষ্টুমি করে চুলের মধ্যে মাথা লুকোবে কে। অঙ্গগুলোর দিকে নজর পড়ে মিন্নতির। কতদিন যত্ন নেই। সাজলে মানোয়া বরাবরই খুশি হত। কিনা রূপের বাহার ওর সারা অঙ্গ জুড়ে।

আট বছর আগে এমন দিনেই ওদের বিয়ে হয়েছিল। কোনো বাচ্চা-কাচ্চা হয়নি। এতো তাড়াতাড়ি মানোয়াও চায় না। বাচ্চা-কাচ্চা হলেই বউ আর বউ থাকে না। স্বামীর কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। মিন্নতির শরীরের কোথাও কোনো বসতি নেই। সাজলে কেউ বলতেই পারে না যে, ও ৮ বছর স্বামীর ঘর করছে।

বিয়ের পরেও সুখলাল কত করে লোভ দেখিয়েছে। মানোয়া'র মাতলামির কথা ফাঁস করে দিয়েছে। রুপোর খাড়ু, বিছা, ছল্ মল্ কত কি সেধেছে। কিছুতেই মিন্নতি ভোলেনি। মিন্নতি সুখলালকে শুনিয়ে দিয়েছে–

যারে লিয়ে ডুব দিয়েচি, তারে লিয়েই উদবো, মরবোরে। তুই ভাগ, লইলে মানোয়াকে কয়া দিবো হো। এসব পুরনো কথা ভাবতে ভাবতেই তৈরি হয়ে যায় মিন্নতি। ছোট ভাইকে বলা আছে আগে থেকে। সে রিকসা নিয়ে ন'টার দিকে অপেক্ষা করবে। বেড়ায় ঝোলানো ফাটা আয়নাটা নিয়ে নিজের মুখটা একবার দেখে নেয়।

হা হা, বড়া ছুন্দর মানিয়েছেরে মিন্নতি। তুই বৃহৎ দেখ-না আচিছ্রে। মানোয়া ভালো থাকলে নিশ্চয়ই এ-কথা বলত। মুচকি হাসে সে। হাসলে খুব সুন্দর দেখায় মিন্নতিকে। মানোয়া'র দিকে ফিরে তাকায় মিন্নতি। একটু কাশলো সে। কাশের সাথে একটু রক্ত। চমকে ওঠে মিন্নতি।

আবার রক্ত। অস্ফুট উচ্চারণ করে সে। মানোয়া'র কাছে যায়। দু'দিন আগেও বন্ধ ছিল। কাশ বাড়ে। মিন্নতি মানোয়া'র বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। আজকের কাশের সাথে পুঁজের মতো দলা দলা চাকা চাকা কী যেন পড়ছে ! শিউরে ওঠে মিন্নতি। মনটা অজানা আশঙ্কায় এবার সত্যি সত্যি ভরে ওঠে।

আহ্, গেলাম রে মিন্নতি, গেলাম। হামাক্ মাফ করিয়ে দেয়। হামি তোকে বৃহৎ কষ্ট - - - - - - কথা শেষ করতে পারে না সে, আঁতকে ওঠে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে মানোয়া'র। ইশারায় সে মিন্নতিকে বুক ডলে দিতে বলে।

মিন্নতি আরো ঘন ঘন মানোয়া'র বুকে-পিঠে হাত চালায়। আর আশ্বাস দেয়–

লা লা, তোর কিছু হয়লি। ছব ছেরে যাবে। তুই ভাবিছলে। মানোয়া মানোয়ারে, হামি তোকে হাছপাতালে ভর্তি করিয়া লিবেই লিবে।

নাকে-মুখে চাপ চাপ রক্ত এবার। মানোয়া'র দম বন্ধ হয়ে আসছে। কথা বলতে পারছে না সে। হাত দিয়ে মিন্নতির শাড়ি খাম্‌চে ধরছে। পা দু'টো লোহার রডের মতো শক্ত সোজা হয়ে যাচ্ছে। মিন্নতি মূর্তির মতো স্থির দৃষ্টিতে মানোয়া'র কষ্ট দেখছে।

আচমকা সমস্ত শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মানোয়া মিন্নতির কোলে ঢলে পড়ে। সব শেষ। মিন্নতি মানোয়া'র নিষ্প্রাণ মাথাটা আস্তে রক্তমাখা চিটচিটে বালিশে রাখে। হাত-পা সোজা করিয়ে দেয়। মানোয়া'র লাশের উপর একটি কাঁথা মেলে ঢেকে দেয়। মিন্নতি হাউমাউ করে কাঁদল না। হাসপাতালের বড়ো সার্জনের মুখটা ওর চোখের সামনে কয়েকবার দুলে উঠল। যে সার্জন সিট নেই অজুহাতে বারবার মিন্নতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে, মানোয়াকে ভর্তি করে নেয়নি।

মানোয়ার বুকের উপর নিজের মাথা আলতো ঠেকাল মিন্নতি। দু'চোখ বেয়ে প্রতিবাদী উত্তপ্ত নদীর ধারা আস্তে মনোয়া'র রক্তমাখা বুকের সাথে একাকার হয়ে গেল। বাইরে মিন্নতির ছোট ভাই রিকশা নিয়ে অপেক্ষা করছে। দেরি দেখে সে হেঁকে উঠল– দিদি, জামাইবাবুকে জলদি লিয়ে আয় লা। আপিছ টাইমে অনেক ক্ষেপ পাওয়া যায়রে। জলতি লিয়ে আয়।

'শেষের রাত্রি' এবং রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতর নারীভাবনা

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

নারী-অধিকার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক প্রচারিত এবং প্রবাদ-প্রতিম উচ্চারণের একটি বক্তব্য হলো : 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার দাও অধিকার (১৯৯৫ক : ৪১৩)।' এখানে তাঁর অবস্থানে একটি পরিমিতি আমি লক্ষ করি, যা কারো মর্যাদা-রক্ষার পূর্বশর্ত। কারো হাতে কিছু তুলে দেয়ার মধ্যে, দান করার মধ্যে ওই মর্যাদাটি যে থাকে না, রবীন্দ্রনাথ সে-পরিস্থিতিটি লক্ষ করতে বলেন। অমনভাবে পাওয়া যে প্রকৃত পাওয়া নয়, নয় হয়ে-ওঠা, ক'জন সেটা লক্ষ করেন? *চিত্রাঙ্গদা* গীতিনৃত্যনাট্যেও চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠে একই তাৎপর্যের একটি আহ্বান (১৯৯৫খ : ৪৮৯) :

পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

এভাবে এগোতে-এগোতে যা পাওয়া যায়, তা নারী-পুরুষ সকলকেই নির্মোহভাবে দেখার দুর্লভ প্রয়াস, আদর্শায়নমুক্তভাবে দেখা। এবং তারই অংশ হলো সমালোচনামূলক-ভাবে দেখা। আমার ধারণা : পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন এবং উন্নতির পরে এখন সময় হয়েছে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর অনালোচিত এবং স্বল্প-আলোচিত কিছু মতাবস্থানকে লক্ষ করার ? নারী-বিষয়ে, নরনারীর সম্পর্ক বিষয়ে। কোথাও এমন কিছু পলকা নেই, যা এতে ভেঙে পড়বে। বরং পরিস্থিতির উন্নতির পরবর্তী ধাপে পৌঁছনোর জন্যে এ-যাবৎ অলক্ষিত-স্বল্পলক্ষিত ধারণা এবং বক্তব্যে এবারে ? এখন যাওয়াটাই জরুরি।

এরূপ আলোচনা শুরুর পক্ষে আবার সাহায্য নেয়া যায় *শেষের কবিতা* উপন্যাসের অমিত রায়ের বলা বিখ্যাত কিছু কথার। কথাগুলো যে সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কিংবা ঔপন্যাসিকের নয়, তা আমরা মনে রাখব। কিন্তু, কথাগুলোর নিজস্ব মূল্য বা সত্যাসত্যকেও তো লক্ষ না করার কিছু নেই। এ-প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর পক্ষে কথাগুলোর (তথ্যসূত্র: কাজল; ২০০৯ : ১১৪) প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য : 'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে, কিন্তু ভোলায় না; আফিমওয়ালী বাঁধে বটে, ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার যোগান দেয়।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "স্ত্রীর পত্র"-কেও নারী-অধিকার-বিষয়ে মেনিফেস্টোর মর্যাদা দিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে। উল্লেখ করা হয় "পয়লা নম্বর"ও। "স্ত্রীর পত্র" গল্পটি নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাইব। এই 'পত্র'টি একটি তীর্থস্থান থেকে লেখা, পত্রের আকারেই গল্পটি লেখা। এ- নিয়ে কিছু কথা আমি হেনরিক ইবসেনের *অ' ডলস হাউস*- বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেছিলাম। গল্পের পত্রলেখক মৃণাল স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে যায় ? শ্রীক্ষেত্রের তীর্থে। পত্রে সে তার স্বামীর সংসারে দিনযাপনের অভিজ্ঞতাগুলো বয়ান করে। তার জায়ের বোন বিন্দুকে নিয়েই কথা অনেক বেশি। স্বামীর একান্নবর্তী সংসারে তার নিজের এবং অন্য মেয়েদের দুঃখকষ্টের বিবরণে মৃণালের চিঠিটি পূর্ণ। মৃণালের কাছেই বিন্দু বেশি আশ্রয় এবং সুরক্ষা পেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ-গল্পে সংসারে মেয়েদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার যে সত্য ছবি এঁকেছেন, তা মর্মস্পর্শী। বিন্দুর মতো অসহায় এবং আশ্রিত পরিস্থিতির ছেলে/ পুরুষদেরও যে নানা দুর্দশা ঘটে, সেটা আমরা ভুলতে বসি। মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন শেষ পর্যন্ত অসহায় বিন্দুকে বিয়ে দিয়ে তাকে তাদের ঘাড় থেকে নামাতে চাইল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বিন্দু দেখতে পেল যে তার স্বামী পাগল। এ-ব্যাপারে মৃণালকে বিন্দু যা বলেছিল, তা হুবহু উদ্ধৃত করা প্রয়োজন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫০৪), সংসারের পরিস্থিতিগুলো যে মিশ্র এবং বিরোধপূর্ণ, অন্যথায় তা বোঝা যাবে না। মৃণাল ঠেসে চেপে প্রশ্ন করলে বিন্দু তার শ্বশুর সম্পর্কে জানালো, '...শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল নাজ্জ কিন্তু তিনি আমার শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন।' অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণিত এই পরিস্থিতিটি কি প্রকৃতপক্ষে ছোট এবং গুরুত্বহীন? উল্লিখিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমি বলেছিলাম যে "স্ত্রী পত্র" গল্পে এটিও একটি তীর্থযাত্রার, তীর্থবাসের ঘটনা। গল্পে এটি এরূপ দ্বিতীয় ঘটনা। বিন্দুর শ্বশুর, বিন্দুর ভাষ্য-অনুযায়ীই, স্ত্রীকে 'যমের মতো ভয় করেন'। এবং পাগল ছেলের বিয়েতে জড়িত থাকতে না-চেয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু এড়াতে 'বিবাহের পূর্বেই কাশী চলে গেছেন।' শ্রীক্ষেত্রবাসিনী মৃণালের গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বিন্দুর কাশীবাসী শ্বশুরের গল্প কি কেউ লিখবেন? কোনো মানবতাবাদী, নারীবাদী ? রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে দ্বিতীয় তীর্থযাত্রার উল্লেখ নিশ্চয় অসচেতন নয়, কিন্তু তিনি তাকে অত্যন্ত অসম গুরুত্বে উল্লেখ করেছেন। মেয়েদের দুর্দশার পরিস্থিতিগুলো নিয়ে লেখা একটি সাহিত্যিক চালে পরিণত হয়েছিল বলেই এই ভারসাম্যহীনতা কি-না, কে বলবে? কোনো অগভীর এবং অন্যায় জনমতকে সমীহ করার মতো মনোভাব বুঝি! প্রসঙ্গক্রমে বলি যে এই জনমতকে কথিতরকম সমীহ করেই বোধ হয় জীবনানন্দ দাশ তাঁর বিপুল-অধিকাংশ গদ্য লেখা-গল্প, উপন্যাস- অপ্রকাশিত রেখেই প্রয়াত হন। সম্ভাব্য বিরূপ জনপ্রতিক্রিয়ার এই যে পরিস্থিতি, যার মুখে আমরা প্রায় সকলেই অসহায়, জীবনানন্দ দাশ প্রায় সমুদয় গদ্য লেখা অপ্রকাশিত রেখে যান, তা আর কতদিন এভাবে আলোচনা-বিশ্লেষণের বাইরে থাকবে?

"স্ত্রীর পত্র" গল্পে পরবর্তী অনুচ্ছেদে মৃণালের ভাষ্যে বিন্দুর শাশুড়ি সম্পর্কে আরো জানা যায়, 'শাশুড়ি তার প্রচ , রাগলে জ্ঞান থাকে না। সেও পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক। ' ইত্যাদি। এমন শাশুড়ির ভয়ে বিন্দুকে তৃতীয় রাতে তার পাগল স্বামীর ঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তারপর স্বামী ঘুমোবার পরে বিন্দু পালিয়ে চলে এসেছিল মৃণালের কাছে। এখন বিবরণ-মতে, 'পাগল, কিন্তু পুরো নয় বলেই আরো ভয়ানক' যে-নারী, তার সঙ্গে সারাটা জীবন কাটানোর কাহিনী শেষ- পর্যন্ত-কাশীবাসী-যে-পুরুষের, তার গল্প কে লিখবেন? সাহিত্যিক এবং তাত্ত্বিক ঝোঁক বলি বা চল বলি, তার মধ্যেই কি সীমাবদ্ধ থাকবে সমগ্র সাহিত্যচর্চা, বুদ্ধিবাজি? কোনো ভারসাম্যহীনতার পরিণতিই তো কল্যাণকর নয় বলে বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি ছোটগল্প, "শেষের রাত্রি" আমাদের আলোচনার পক্ষে আরো প্রাসঙ্গিক। বিস্ময়কর যে এ-গল্পটি নিয়ে কোথাও তেমন কোনো আলোচনা নেই। বর্তমান যে বিশ্ব পরিস্থিতিতে শ্রেণি-প্রশ্নটি অনেক পেছনে চলে গেছে, তাকে পেছনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং সে-জন্যেই লিঙ্গ বিষয়টি চাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ? তাতে অবশ্য এ রকম ঘটাই স্বাভাবিক। লৈঙ্গিক সমতা-ন্যায্যতার যে দাবি নারীবাদীদের, "শেষের রাত্রি" গল্পে উপস্থাপিত পরিস্থিতি এবং ঘটনার আলোচনায় তো সেক্ষেত্রে তাদেরও আগ্রহ থাকতে পারত। তা যে নেই, তাঁরা যে "স্ত্রীর পত্র" কিংবা "পয়লা নম্বর" সম্পর্কে বলেই শেষ করেন, তা-ই প্রমাণ করে যে সমতা-ন্যায্যতা তাঁদেরও সত্য আগ্রহ নয়। তাদের বিপুল-অধিকাংশের প্রকৃত আগ্রহ আত্মমঞ্চায়নে।

"শেষের রাত্রি" গল্পে মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের পরিস্থিতি গল্পটি যতটা জানাতে পারে, অন্য কোনোভাবে তা করা কঠিন। মৃত্যুর আগে একবারের জন্যেও কেন সে তার স্ত্রীর দেখা পর্যন্ত পায় না, গল্পে সে-প্রশ্নের তেমন কোনো উত্তর নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই পরিস্থিতি এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন। স্ত্রী মণির অনাগ্রহ-উপেক্ষা-অবহেলা পাহাড়প্রমাণ। যতীনের মাসির দিক থেকে মণির এই নির্মমতাকে আড়াল করার কিংবা লুকনোর করুণ চেষ্টাগুলো বরং এক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ। সেগুলোই বোধ করি মণির আচরণ যে অকারণ, অগ্রহণযোগ্য, তা জানায়। আরো চোখে পড়ে মণির প্রতি যতীনের নিজের এক অন্ধ অনুরাগ, বুঝি তাকে তার ভালোবাসতেই হবে! মিথ্যেকে সত্য ভাবার এক ঘোর তার! একি কোনো দুরারোগ্য মানসকাঠামো তার, এবং জগৎসংসারের আরো অনেকের? মণির যত অনাগ্রহ, বিকর্ষণ, যতীনের যেন ততই আস্থা, আকর্ষণ! যতীনের এই নির্বিচার ভালোবাসা যে অবকাশ তৈরি করে, মণির মনোভাব এবং আচরণকে তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তবে সাফাই নয়। কারণ, সুযোগ নেওয়াটা সমতা কিংবা ন্যায্যতার মনোভাব নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আমরা অনেকেই তা নিই না।

এ-গল্পটির আলোচনায় আরো বলার আছে। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু ঘটনার স্তরে থেকেছেন এবং যতীনের একপেশে অনুরাগ সম্পর্কে জানিয়েই যে শেষ করেছেন, তা নয়। গল্পটির একপর্যায়ে যতীন-মণির সম্পর্ক বিষয়ে তার কিছু মন্তব্য এবং বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তাতে তাদের অমিলের চরিত্রটা বোঝা যায়, প্রকৃতিগত দূরত্ব সম্পর্কে। যা আরো উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই দুরতিক্রম্য দূরত্ব নিয়ে মণির পীড়িত-ক্লিষ্ট-ভাবিত

হওয়ার কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, আর যতীনের গোটা জীবনজুড়েই যে এই দূরত্বের বেদনা, যন্ত্রণা, গল্পটি তা-ই নিয়ে। দাম্পত্য সংকটের এক অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে পর্যবেক্ষণ "শেষের রাত্রি" গল্পে, আমরা এখন যা উদ্ধৃত করব, বিস্ময়কর যে জীবনানন্দ দাশের অসংখ্য গল্প-উপন্যাসে যেন তারই বিশদতর-বিস্তৃততর বিবরণ। সেখানে নারীর পক্ষ থেকে প্রত্যাহার, উপেক্ষা-অবহেলা আর শীতলতারও বহুলাংশে একই ছবি। জীবনানন্দের লেখা সেসব ছবি তো দেখা যায় না, সওয়া যায় না! যা-ই হোক, আপাতত যতীন-মণির অমিলদীর্ণ দাম্পত্যের যে ধরণ কিংবা প্রকৃতি সে সম্পর্কে জানা যাক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২১) :

> যতীন জানে, আজ পর্যন্ত যে মণির সঙ্গে ভালো করিয়া কথা জমাইতে পারে নাই। দুই যন্ত্র দুই সুরে বাঁধা, এক সঙ্গে আলাপ চলা বড়ো কঠিন। মণি তাহার সঙ্গিনীদের সঙ্গে অনর্গল বকিতেছে হাসিতেছে, দূর হইতে তাহাই শুনিয়া যতীনের মন কতবার ঈর্ষায় পীড়িত হইয়াছে। যতীন নিজেকেই দোষ দিয়াছে– সে কেন অমন সামান্য যাহা-তাহা লইয়া কথা কহিতে পারে না। পারে না যে তাহাও তো নহে, নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যতীন সামান্য বিষয় লইয়াই কি আলাপ করে না। কিন্তু, পুরুষের যাহা-তাহা তো মেয়েদের যাহা-তাহার সঙ্গে ঠিক মেলে না। বড় কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্যপক্ষ মন দিল কিনা খেয়াল না করিলেই হয়; কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুই পক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না। এইজন্য কত সন্ধ্যাবেলায় যতীন মণির সঙ্গে যখন খোলা বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছে, দুটো-চারটে টানাবোনা কথার পরেই কথার সূত্র একেবারে ছিঁড়িয়া ফাঁক হইয়া গেছে; তাহার পরে সন্ধ্যার নীরবতা যেন লজ্জায় মরিতে চাহিয়াছে। যতীন বুঝিতে পারিয়াছে; মণি পালাইতে পারিলে বাঁচে; মনে মনে কামনা করিয়াছে, এখনই কোনো-একজন তৃতীয় ব্যক্তি যেন আসিয়া পড়ে। কেননা, দুই জনে কথা কহা কঠিন, তিন জনে সহজ।

এই বিবরণ-বিশ্লেষণ গল্পে একটি ঘটনা কিংবা কিছুটা সময় সম্পর্কে উপস্থাপিত হলেও, যতীন-মণির সামগ্রিক সম্পর্ক সম্পর্কেও এ কোনো কিছু কম মূল্যবান নয়। এক কিংবা ছোটকে কেন্দ্র করে, উপলক্ষ করে বরং ভিন্ন এবং বৃহৎ বিষয়ে বলা অনেক কথা এগুলো। দাম্পত্য বা সংসারের ব্যাপক/অনেক ক্ষেত্র সম্পর্কে এরা কিছু গভীর সত্যকে ধারণ করে। প্রেম এবং রোমান্টিকতার জীবনদর্শন এখানে প্রশ্ন এবং পরীক্ষার মধ্যে পড়েছে। এই বিবরণের দু'-একটি পর্যায় আমাকে স্মরণ করিয়েছে অন্য দু'-একটি সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত কিছু পরিস্থিতি সম্পর্কেও। প্রাসঙ্গিক বিধায় এগুলো সম্পর্কেও একটু জানাতে চাই।

"মাই লাস্ট ডাচেস"-খ্যাত রবার্ট ব্রাউনিং-এর একটি প্রায়-বিপরীত উন্মোচনের কবিতা হচ্ছেজ্জ "এ্যান্ড্রিয়া ডেল সার্টো"। এ্যান্ড্রিয়া নামের এক চিত্রকরের প্রতি তার স্ত্রী লুক্রেজিয়ার শীতলতা এবং প্রবঞ্চনার গল্পটি ব্রাউনিং এখানে লিখেছেন তাঁর বিখ্যাত ড্রামাটিক মনোলগ রীতিতে। উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এখানে এ্যান্ড্রিয়া নামের শৈলীসফল

চিত্রকর মানুষটির মধ্যেও দেখা যায় লুক্রেজিয়ার প্রতি এক ধরনের নিঃশর্ত তথা ভীরু মুগ্ধতার মনোভাব। যার সম্পূর্ণ সুযোগ লুক্রেজিয়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য হলো এখানে কবিতার শুরুতেই দেখা যায় এ্যান্ড্রিয়া-লুক্রেজিয়ার যোগাযোগহীনতা, অন্তঃসারশূন্য সংলাপ কিংবা যে-লক্ষ্যে তাদের কোশেশ (তথ্যসূত্র : রবার্ট; ১৯৫১ : ৩৪৩)।

But do not let us quarrel any more,
No, my Lucrezira; bear with me for once :
Sit down and all shall happen as you wish.
You turn your ace, but does it bring your heart?
... ...
I often am much waarier than you think,
This evening more than usual, and it seems
As if? forgive now ? should you let me sit
Here by the window with your hand in mine
And look a half-hour forth on Fiesole,
Both of one mind, as married people use,...

এখানে এ এক ভীরু এবং করুণ আর্তিজ্ঞ সংযোগ, সম্পর্ক এবং বোঝাপড়ার জন্যে, যা পূরণ হয় না সংশ্লিষ্ট নারীর উপেক্ষা এবং ঔদ্ধত্যের কারণে। একাধিক কবিতায় রবার্ট ব্রাউনিং দাম্পত্য তথা সম্পর্কের এরূপ সংকটকে উপস্থিত করেছেন, এবং এ জন্যে নারী-পুরুষ দুয়ের দায়িত্বের সত্য এবং সম্ভাবনাকেই নির্দেশ করেছেন এক ব্যতিক্রমী মনস্বিতার সঙ্গে, বিখ্যাত "নারী" কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম (তথ্যসূত্রঃ কাজল; ২০০৯: ১১৪) যেমন এক দুর্লভ এবং মূল্যবান সমগ্রতায় বিষয়টিকে দেখেছিলেন,

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
বিশ্বে যা কিছু এল পাপতাপ বেদনা অশ্রুবারি,
অর্ধেক তার আনিয়াছে নর, অর্ধেক তার নারী।
নরককু বলিয়া কে তোমা করে নারী হেয় জ্ঞান?
তারে বল, আদি পাপ নারী নহে, সে যে নর শয়তান।
অথবা পাপ যে ? শয়তান যে ? নর নহে নারী নহে,
ক্লীব সে, তাই সে নর ও নারীতে সমান মিশিয়া রহে।

কিন্তু, আমরা তো ওপরে উদ্ধৃত নজরুল-কবিতার শেষ দু'টো লাইন গুরুত্ব দিয়ে পড়তে এবং তা নিয়ে ভাবতে মোটেই আগ্রহী নই।

যোগাযোগ কিংবা সংযোগের প্রশ্নটি প্রকট হয়ে আসে নারী-অধিকার বিষয়ে বহুল-উল্লেখিত নাটক *অ' ডলস্ হাউস*-এও। বিস্ময় এবং পরিহাসের হচ্ছে যে-ঘর ছেড়ে নোরা বেরিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই সে এবং হেলমার স্বীকার করে নেয় যে তাদের মধ্যে দীর্ঘ দাম্পত্যের কোনো একদিনও সত্যিকার অর্থে সংলাপ যাকে বলে, তেমন

কিছু ঘটেনি। এ-হেন পরিস্থিতি তো ঘরহীন ঘরের কথাই বলে, যা থেকে বেরিয়ে যাওয়া-না-যাওয়াটা সমান (হেনরিক ইবসেন; ১৯৮৪ : ৬২-৬৩)।

নোরা : আমাদের বিয়ের আট বছর হয়েছে। তোমাকে কি এটা ভাবাচ্ছে না যে এই প্রথমবার আমরা দু'জন ? তুমি আর আমি ? কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছি।

হেলমার : 'গুরুত্বপূর্ণ' বলতে কি বোঝাতে চাইছো?

নোরা : এই গোটা আট বছরে ? তার চেয়ে বেশী সময় হবে ? আমাদের পরিচয়ের শুরু থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমরা একটি শব্দও বিনিময় করিনি।

হেলমার : এটা কি সম্ভাব্য ছিল যে আমি অবিরাম এবং সারাক্ষণ তোমাকে তেমন উদ্বেগ সম্পর্কে বলে যাবো যার নিরসনে তুমি আমাকে কোনো সাহায্য করতে পারবে না?

নোরা : আমি কাজের বিষয়াদি নিয়ে বলছি না। বলছি যে আমরা কোনোদিন কোনো বিষয়ের মর্মে পৌঁছার জন্যে ঐকান্তিকতা নিয়ে একত্রে বসিনি।

নোরা সংলাপ বা আলোচনার প্রয়োজন সম্পর্কে বলছে দেখছি; এক বৃহত্তর পরিহাস এই যে একটু পরেই দেখা যাবে যে সর্বশেষ এবং একবারের এই সংলাপেরও তোয়াক্কা না-করেই গৃহত্যাগের চূড়ান্ত এবং অনড় সিদ্ধান্ত সে একাই নিয়ে ফেলেছে।

কিছু উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মে উপস্থাপিত এও হচ্ছে দাম্পত্যের ছবি। এরই পটভূমিতে দেখা যেতে পারে "শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে যতীন-মণির সম্পর্ককে। একটি অর্থপূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় যতীনের মাসির কাছ থেকে, লেখক রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে। এ-বিবরণও অবশ্য শুরু হয় যতীনের একটি ভুল বক্তব্য থেকে, মণিকে ইঙ্গিত করে যতীন বলেছে : 'সেই জন্যেই ওর ছেলেমানুষিতে কোনোদিন কিছু মনে করি নি।' এর পরেই রয়েছে গল্পের বর্ণনাকারী কিংবা লেখকের ভাষ্য (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫১৯) :

মাসি এ কথার কোনো উত্তর করিলেন না। কেবল মনে মনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। কতদিন তিনি লক্ষ করিয়াছেন, যতীন বারান্দায় আসিয়া রাত কাটাইয়াছে, বৃষ্টির ছাঁট আসিয়াছে, তবু ঘরে যায় নাই। কতদিন সে মাথা ধরিয়া বিছানায় পড়িয়া; একান্ত ইচ্ছা, মণি আসিয়া মাথায় একটু হাত বুলাইয়া দেয়। মণি তখন সখীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইবার আয়োজন করিতেছে। তিনি যতীনকে পাখা করিতে আসিয়াছেন, সে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে। সেই বিরক্তির মধ্যে কত বেদনা তাহা তিনি জানিতেন। কতবার তিনি যতীনকে বলিতে চাহিয়াছেন, 'বাবা, তুমি ঐ মেয়েটার দিকে অত বেশি মন দিয়ো না?। ও একটু চাহিতে শিখুক ? মানুষকে একটু কাঁদানো চাই।' কিন্তু এ-সব কথা বলিবার নহে, বলিলেও কেহ বোঝে না। যতীনের মনে নারীদেবতার একটি পীঠস্থান ছিল, সেইখানে সে মণিকে বসাইয়াছে। সেই তীর্থক্ষেত্রে নারীর অমৃতপাত্র চিরদিন তাহার ভাগ্যে শূন্য থাকিতে

পারে, একথা মনে করা তাহার পক্ষে সহজ ছিল না। তাই পূজা চলিতেছিল, অর্ঘ্য ভরিয়া উঠিতেছিল, বরলাভের আসা পরাভব মানিতেছিল না।

এতো প্রচলিত পতি দেবতার ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি এবং তদ্‌ভিত্তিক ডিসকোর্স! এখানে রয়েছে 'নারীদেবতা'র ধারণা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে! রবীন্দ্রনাথের পক্ষ থেকে নারীবাদ-বিরোধী এক তত্ত্ব একে বলা যাবে কি-না, আমার প্রশ্ন সেটাই। কেউ স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যে যতীনের যে পূজা করে ঊর্ধ্বে-রাখা, রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহী নারী চিত্রাঙ্গদা তো তাকেও একইভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে!

যতীনের মাসি অর্থাৎ একজন সংসার-অভিজ্ঞ নারীর দৃষ্টি দিয়ে যতীন-মণির সম্পর্ককে দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ? এতে ওই-গল্পের নানা বিবরণ এবং মন্তব্যের মূল্য বেড়েছে। ওপরে মাসির যে বিবরণ-পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত, গল্পে তারপরও তা এগিয়ে যায়, আর তাতে আসন্নমৃত্যু যতীনের জীবনের করুণ পরিস্থিতি আরও মর্মান্তিক মনে হতে থাকে (রবীন্দ্রনাথ : ১৯৯৮ : ৫১৯) :

মাসি যখন আবার ভাবিতেছিলেন যতীন ঘুমাইয়াছে এমন সময় হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, "আমি জানি, তুমি মনে করেছিলে, মণিকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারি নি। তাই তার উপর রাগ করতে। কিন্তু, মাসি সুখ জিনিসটা ঐ তারাগুলির মতোজ্জসমস্ত অন্ধকার লেপে রাখে না, মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে যায়। জীবনে কত ভুল করি, কত ভুল বুঝি, তবু তার ফাঁকে ফাঁকে কি স্বর্গের আলো জ্বলে নি। কোথা থেকে আমার মনের ভিতরটি আজ এমন আনন্দে ভরে উঠেছে।"

মাসি আস্তে আস্তে যতীনের কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া যে জল পড়িতেছিল তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

রবীন্দ্রনাথের উপস্থাপনায় যতীনের আত্মমর্যাদাবোধই শুধু কম নয়, তার উপলব্ধিগুলোও অত্যন্ত ভিন্ন ধরনের, ব্যতিক্রমী। মণিকে নিয়ে তার মনে এক অপরিমেয়-অস্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, মণির প্রশ্নে সে যে কতো বেশি বাড়িয়ে ভাবতে অভ্যস্ত! মাসি যখন চাইছে, তখনই মণির সম্পর্কে বানোয়াট যে কোনো কিছু বলে অত্যন্ত বিশ্বাসপ্রবণ যতীনকে তা গেলাতে পারছে। গল্পে এর পরে ঠিক এরূপ আরো কিছু কথোপকথন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২০) :

"কালও সন্ধ্যার পর এইরকম কথা কইতে কইতে কত রাত পর্যন্ত তোমার আর ঘুম এল না, তাই আজ তোমাকে সকাল-সকাল ঘুমোতে বলছি।"

"মণি কি ঘুমিয়েছে?"

"না, সে তোমার জন্যে মসুরির ডালের সুপ তৈরি করে তবে ঘুমোতে যায়।"

"বলো কী মাসি, মণি কি তবে ?"

"সেই তো তোমার জন্যে সব পথ্যি তৈরি করে দেয়। তার কি বিশ্রাম আছে।"

"আমি ভাবতুম, মণি বুঝি ?"

"মেয়েমানুষের কি আর এ-সব শিখতে হয়। দায়ে পড়লেই আপনি করে নেয়।"

"আজ দুপুরবেলা মৌরলা মাছের যে ঝোল হয়েছিল তাতে বড়ো সুন্দর একটি তার ছিল। আমি ভাবছিলুম তোমারই হাতের তৈরি।"

"কপাল আমার! মণি কী আমাকে কিছু করতে দেয় । তোমার গামছা তোয়ালে নিজের হাতে কেচে শুকিয়ে রাখে । জানে যে, কোথাও কিছু নোংরা তুমি দেখতে পার না । তোমার বাইরের বৈঠকখানা যদি একবার দেখ তবে দেখতে পাবে, মণি দুবেলা সমস্ত ঝেড়ে মুছে কেমন তক্‌তকে করে রেখে দিয়েছে; আমি যদি তোমার এ ঘরে ওকে সর্বদা আসতে দিতুম তা হলে কি আর রক্ষা থাকত । ও তো তাই চায় । "

"মণির শরীরটা বুঝি ?"

"ডাক্তাররা বলে, রোগীর ঘরে ওকে সর্বদা আনাগোনা করতে দেওয়া কিছু নয় । ওর মন বড়ো নরম কি না, তোমার কষ্ট দেখলে দুদিনে যে শরীর ভেঙে পড়বে । "

"মাসি, ওকে তুমি ঠেকিয়ে রাখ কী করে । "

"আমাকে ও বড্ড মানে বলেই পারি । তবু বার বার গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হয় ? ঐ আমার আর-এক কাজ হয়েছে । "

ওপরে উদ্ধৃত কথোপকথনেও যতীন-চরিত্রের কিছু ত্রুটি পাওয়া যাচ্ছে, তা এ-ত্রুটির যে-নামই আমরা দিই না কেন । এ হয়ত দমন-নিপীড়ন-নির্যাতন একবারেই নয়, কিন্তু এও নিশ্চয় ভিন্ন এক ভারসাম্যহীনতা-সৃষ্টির কারণ । মণির মধ্যে যতীনের প্রতি যে-বেপরোয়া উপেক্ষা-অবহেলা, অবিবেচনা-অমর্যাদা, যতীনের প্রশ্রয় এবং প্রশস্তি পেয়েই যে তা তৈরি হয়েছে, এ-কথা আমি বলব না, কিন্তু এ সবের ফলেই যে তার বাড়বাড়ন্ত একটি চেহারা হয়েছে, আমার তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । গল্পের পাঠক নিশ্চয় আরো এক ব্যাপারে একমত হবেন যে যতীনের প্রতি এক অপার মাতৃস্নেহ এবং রক্ষকের মনোভাব থেকে তার মাসি এক্ষেত্রে শুধু তাকে নয়, মণিকেও রক্ষা করতে চলে গিয়েছে । মণির অনেক অবিচার-অন্যায়কে আড়াল করতে দেখা যাচ্ছে মাসিকে, যদিও এক পর্যায়ে দেখা যায় তিনি দাবি করেছেন মণির প্রতি প্রশ্রয় কমানোর পরামর্শ তিনি যতীনকে দিয়েছিলেন । সেটা হয়ত তাঁর যতীনের অসুস্থ হওয়ার পূর্বের ভূমিকা । এখন অসুস্থ যতীনের মনোকষ্ট লাঘবের জন্যে কিন্তু তিনি সত্য গোপন এবং মিথ্যে ভাষণের একশেষ করে চলেছেন । অসুস্থ এবং মৃত্যু পথযাত্রীর ক্ষেত্রে বৈ এ যে এক সর্বনাশা স্নেহ, কে তা না বলবে? সংসারে ন্যায়-অন্যায়ের নিয়ামক কত বহু এবং বিচিত্র শক্তি যে কাজ করে, সৃষ্টিশীল রচনায় অর্থাৎ সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত তার ছবি এবং বিবরণই বরং অনেক বেশি পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য । মাসির বিভিন্ন এবং জটিল ভূমিকার নিয়ামক হিসেবে যতীনের কাছ থেকে সম্পদ-সম্পত্তি প্রাপ্তির কম-বেশি আকাঙ্ক্ষাও কাজ করেছে কি-না, "শেষের রাত্রি" নামের একটি ছোটগল্পেও রবীন্দ্রনাথ সে-প্রশ্নটি তুলতে ব্যর্থ হননি । এরূপ বহু জটিল বাস্তবই যে মানুষের আচরণকে দৃষ্ট সব জটিলতা দানে চলে যায়, তাতে সন্দেহ নেই । অসহায়ত্ব এবং নির্ভরশীলতাকে অতিক্রম করে সত্য-ভাষণ সংসারে ক'জন করতে পারে, এসব সত্ত্বেও দৃঢ়তা, প্রতিবাদ, ইত্যাদির শক্তি ক'টি ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে?

গল্পে এর পরের গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটিতে দেখা যাচ্ছে মণি মৃত্যুপথযাত্রী যতীনকে একবার না-দেখেই তার নিজের বোনের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সীতারামপুরে

যাচ্ছে। অবস্থা এবারে বেগতিক দেখে দীর্ঘকাল-প্রশ্রয়দাতা (যতীনের) মাসি তুলনামূলক শক্ত একটি অবস্থান নেন। স্বামী যতীনের প্রতি অবিবেচনার বেলায় মণিকে এটা উল্লেখ করতে দেখা যায় যে সে 'তিথি বার' মানে না। অমানবিকতার বেলায় প্রাচীন এবং আধুনিক উভয়বিধ ভাবাদর্শকে ব্যবহারের ইতিহাসজোড়া সব ঘটনার এ-এক অতি ক্ষুদ্র এবং কৌতুককর দৃষ্টান্ত। দৃশ্য এবং সংলাপ এখানে মর্মন্তুদ এবং অত্যন্ত শিক্ষামূলক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২১) :

"একি বউ, কোথাও যাচ্ছ নাকি।"

"সীতারামপুরে যাব।"

"সে কী কথা। কার সঙ্গে যাবে।"

"অনাথ নিয়ে যাচ্ছে।"

"লক্ষী মা আমার, তুমি যেয়ো, আমি তোমাকে বারণ করব না? কিন্তু আজ নয়।"

"টিকিট কিনে গাড়ি রিজার্ভ্ করা হয়ে গেছে।"

"তা হোক, ও লোকসান গায়ে সইবে? তুমি কাল সক্কালেই চলে যেয়ো ? আজ যেয়ো না।"

"মাসি, আমি তোমাদের তিথি বার মানি নে, আজ গেলে দোষ কী।"

"যতীন তোমাকে ডেকেছে, তোমার সঙ্গে তার একটু কথা আছে।"

"বেশ তো, এখনো সময় আছে ? আমি তাকে বলে আসছি।"

"না, তুমি বলতে পারবে না যে যাচ্ছ।"

"তা বেশ, কিছু বলব না, কিন্তু আমি দেরি করতে পারব না। কালই অন্নপ্রাশন ? আজ যদি না যাই তো চলবে না।"

"আমি জোড়হাত করছি বউ, আমার কথা আজ একদিনের মতো রাখো। আজ একটু শান্ত করে যতীনের কাছে এসে বসো ? তাড়াতাড়ি কোরো না।"

"তা, কী করব বলো, গাড়ি তো আমার জন্যে বসে থাকবে না। অনাথ চলে গেছে ? দশ মিনিট পরে সে এসে আমাকে নিয়ে যাবে। এই বেলা তাঁর সঙ্গে দেখা সেরে আসি গে।'

নারীবাদীদের জন্যে এখানে বিবেচনাযোগ্য (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২) একজন নারীর উদ্দেশে আর এক নারীর ? মণির উদ্দেশে যতীনের মাসিরএ-বক্তব্য : 'ওরে অভাগিনী, তুই যাকে এত দুঃখ দিলি সে তো সব বিসর্জন দিয়ে আজ বাদে কাল চলে যাবে...' ইত্যাদি। মণির আচরণের নির্মমতায় ব্যথিত মাসি যতীনের উদ্দেশে এও বলেন, 'ওরে বাপ রে, আর কেন বেঁচে আছিস রে বাপ! পাপের যে শেষ নেই? আমি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলুম না।' কিন্তু, তা হলে কী হবে, পরক্ষণে দেখা গেল যতীনের মাসি যতীনের ঘরে গিয়ে বিশাল বিস্তৃত মিথ্যেয় ঢেকে দিচ্ছেন মণির অবিবেচনা এবং নির্মমতাকে। 'কী হয়েছে। মণি এল না? এত দেরি করলে কেন, মাসি।' যতীনের এসব কথার উত্তরে তার মাসি বললেন, 'গিয়ে দেখি, সে তোমার দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছে ব'লে কান্না। আমি বলি, হয়েছে কি, আরো তো দুধ আছে। কিন্তু, অসাবধান হয়ে তোমার খাবার দুধ পুড়িয়ে ফেলেছে, বউয়ের এ লজ্জা আর কিছুতেই

যায় না। আমি তাকে অনেক ঠান্ডা ক'রে বিছানায় শুইয়ে রেখে এসেছি। আজ আর তাকে আনলুম না। সে একটু ঘুমোক (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২)। ' এই করুণ পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তী সংলাপ নিরুরূপ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২২) :

মণি আসিল না বলিয়া যতীনের বুকের মধ্যে যেমন বাজিল তেমনি সে আরামও পাইল। তাহার মনে আশঙ্কা ছিল যে, পাছে মণি সশরীরে আসিয়া মণির ধ্যানমাধুরীটুকুর প্রতি জুলুম করিয়া যায়। কেননা, তাহার জীবনে এমন অনেকবার ঘটিয়াছে। দুধ পুড়াইয়া ফেলিয়া মণির কোমল হৃদয় অনুতাপে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারই রসটুকুতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

"মাসি।"

"কি বাবা।"

"আমি বেশ জানছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু, আমার মনে কোনো খেদ নেই। তুমি আমার জন্যে শোক করো না।"

"না বাবা, আমি শোক করবো না। জীবনেই যে মঙ্গল আর মরণে যে নয় এ কথা আমি মনে করি নে।"

"মাসি তোমাকে সত্য বলছি, মৃত্যুকে আমার মধুর মনে হচ্ছে।"

"শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে এর পরের দৃশ্যেও দেখা যাচ্ছে যতীনের মাসি তাকে মারাত্মক অসুস্থ অবস্থায় রেখে মণির তার ভাইয়ের অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে সীতারামপুরে চলে যাওয়ার ঘটনাটিকে যতীনের কাছ থেকে লুকিয়েই চলেছেন। পুরনো ধরনের কিন্তু বর্ধিত পরিহাস হচ্ছে যে এসব সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে প্রস্তুতকৃত উইলে যতীন তার যাবতীয় সম্পদসম্পত্তি এই মণিকেই দিয়ে যাচ্ছে; এমনকি এর একটি অংশের ওপর যতীনের মাসির মালিকানা থাকলেও তিনি যতীনের কাছ থেকে কিছুই পাচ্ছেন না, এবং সে জন্যে তার কোনো অভিযোগও নেই। এতে কি যতীনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার বোধে কোনো পরিবর্তন আসবে? এ কি কোনো উপেক্ষিত এবং অভিমানী মানুষের আত্ম-অবনমন (ঝবষভ-ফবমৎবফধঃরড়হ)? অভিভাবক হিসেবে যাকে যতীন অনেক পেয়েছে, বার্ধক্যের ভরসা হিসেবেও উইলে তাঁকে যতীনের কিছুই না-দেওয়ার কী ব্যাখ্যা থাকতে পারে? সংসারে অবিচার-অন্যায় কি কোনো একটি-দু'টি মানুষের? অন্যায় উপেক্ষার শিকার যে-ব্যক্তি, ঘটনার পরবর্তী স্রোতধারায় সে-ই কি হয়ে উঠছে না শিকারী-অন্যায়কারী, স্বয়ং যতীন? তার মাসির ক্ষেত্রে, তার প্রতি? যতীনের মাসিকে সহায়-সম্পত্তি কিছুই না-দেওয়া এবং তাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে এ-সময়ে এ দুটো মানুষ যে ভাববাদী এবং সান্ধ্য ভাষায় বাক্যবিনিময় করে, তা অত্যন্ত লক্ষণীয় (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৩), যেমন

"আমি মণিকে সব লিখে দিলুম বটে, কিন্তু তোমারই সব রইল মাসি। ওতো তোমাকে কখনো অমান্য করবে না।"

"সেজন্য অত ভাবছ কেন, বাছা।"

"তোমার আশীর্বাদেই আমার সব, তুমি আমার উইল দেখে এমন কথা কোনোদিন মনে কোরো না ?"

"ওকী কথা যতীন। তোমার জিনিস তুমি মণিকে দিয়েছ বলে আমি মনে করব! আমার এমনি পোড়া মন! তোমার জিনিস ওর নামে লিখে দিয়ে যেতে পারছ বলে তোমার যে সুখ সেই তো আমার সকল সুখের বেশি, বাপ।"

যতীনের মণিকে সব সহায়-সম্পত্তি দিয়ে যাওয়াটা যে নানা অর্থে অপাত্রে দান হচ্ছে, তার মাসির সেই পুরনো অবস্থান দেখা যায় তিনি খানিকটা ধরে রেখেছেন, বলছেন, 'যা তুমি দিয়েছ তাই মাথা পেতে নেবার শক্তি বিধাতা ওকে দিন, এই আশীর্বাদ ওকে করি।' কিন্তু পরক্ষণেই এও দেখা যায় যে রাশি-রাশি মিথ্যেয় তিনি মণির অনুপস্থিতি-উপেক্ষা-অবহেলাকে আড়াল করছেন, যেমন এবারে বলছেন, 'জানিস যতীন? এই শালটা মণির তৈরি, এতদিন রাত জেগে জেগে সে তোমার জন্যে তৈরি করছিল। কাল শেষ করেছে।' আর সঙ্গে সঙ্গে যতীনের বিশ্বাসপ্রবণতা, প্রেমোচ্ছ্বাস, ইত্যাদি উথলে উঠেছে (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৪)।

যতীন শালটা লইয়া দুই হাত দিয়া একটু নাড়াচাড়া করিল। মনে হইল, পশমের কোমলতা যেন মণির মনের জিনিস; সে যে যতীনকে মনে করিয়া রাত জাগিয়া এইটি বুনিয়াছে, তার মনের সেই প্রেমের ভাবনাটি ইহার সঙ্গে গাঁথা পড়িয়াছে। কেবল পশম দিয়া নহে, মণির কোমল আঙুলের স্পর্শ দিয়া ইহা বোনা। তাই মাসি যখন শালটা তাহার পায়ের উপর টানিয়া দিলেন তখন তাহার মনে হইল, মণিই রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া তাহার পদসেবা করিতেছে।

এর পরে যেন দ্রুতই মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটে যায়। মণির অনুপস্থিতি তথা প্রস্থান তথা নির্মমতার সত্যটি আকস্মিকভাবে ফেটে পড়ে। যতীনের মাসির কোনো পরিকল্পনাই তাকে রোধ করতে পারে না। যতীন যখন চেপে-ঠেসে অনুরোধ করে, মাসিকে, 'কেবল তাকে দু' মিনিটের জন্যে ডেকে দাও', এবং বলে আরো কিছু মর্মস্পর্শী কথা, মাসি তখন চাকর শম্ভুকে দরজার কাছে রেখে মণিকে ডেকে আনতে যান, বৃথাই, ব্যর্থ-নির্ধারিত। কারণ, সে তো তখন এ-বাড়িতেই নেই। আর এই অবসরেই প্রকাশ পায় এই ভয়ঙ্কর সত্যটি। চাকর শম্ভু 'না-জেনে, না-বুঝে, তা জানিয়ে দেয়, 'জানিয়ে দেয় যে মণি তখন থেকে তিনদিন পূর্বে সীতারামপুরে গিয়েছে।' 'ক্ষণকালের জন্য যতীনের সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া আসিল? সে চোখে অন্ধকার দেখিল। এতক্ষণ বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। পায়ের উপর সেই পশমের শাল ঢাকা ছিল, সেটা পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল।'

এমন একটি সত্য জানার পরও কিছুক্ষণ বাদে বুঝি যতীন শান্ত হতে পারে। তখন তার মাসি কাছে এলে সে তাকে শুধু তার গত রাতের স্বপ্নটির বিবরণ দেয়, এভাবেই শুধু তার ক্ষিপ্ত-ক্ষুব্ধ মনোভাব জানায়, 'মণি যেন আমার ঘরে আসবার জন্য দরজা ঠেলছিল ? কোনোমতেই দরজা এতটুকুর বেশি ফাঁক হল না, সে বাইরে দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই ঢুকতে পারল না। মণি চিরকাল আমার ঘরের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। তাকে অনেক ক'রে ডাকলাম, কিন্তু এখানে তার জায়গা হল না।' যতীনের স্বপ্ন বিবরণটিকে তার মাসিও উদ্দিষ্ট অর্থেই গ্রহণ করলেন। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন যে এতে তিনি ভাবলেন (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৫), 'যতীনের জন্য মিথ্যা দিয়া যে একটুখানি স্বর্গ রচিতেছিলাম সে আর টিকিল না। দুঃখ যখন আসে তাহাকে স্বীকার করাই ভালো ? প্রবঞ্চনার দ্বারা বিধাতার মার ঠেকাইবার চেষ্টা করা কিছু নয়।'

"শেষের রাত্রি" ছোটগল্পে এই স্বপ্ন-বিবরণটির উল্লেখ আবারও ঘটে। কিন্তু, তার আগে দেখি যে যতীন আর তার মাসি তখন 'আর জন্মে' ছেলে এবং মেয়ে হয়ে জন্মানো নিয়ে বিপরীত কথা যা বলছে তার অর্থ গভীরতর। এই সব পরিচয়ের চেয়ে যে কর্মের পরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তারা বোধ হয় তা-ই বললেন, প্রকারান্তরে। মণির আচরণ এবং ভূমিকার কারণেই বোধ করি সেখানে মাসির আর মেয়ে হয়ে না-জন্মানোর মনোভাব। এরপরে যতীন যে বলে "চিরটা দিন নিজের দিকে তাকিয়ে থাকা যে কী ফাঁকি তা আমি বুঝেছি।" তার ইঙ্গিতও কি মণির নির্মমতার দিকে, আত্মকেন্দ্রিকতার? কারণ, তারই উত্তরে মাসি যতীনকে বলেন, "যাই বল বাছা। তুমি নিজে কিছু নাও নি, পরকেই সব দিয়েছ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৬)।"

এরপরে ছোটগল্পটির এক বড় পরিসমাপ্তিতে রবীন্দ্রনাথ যতীনের দেখা স্বপ্নের প্রসঙ্গটিকে ফিরিয়ে আনেন। সেও যেন এক স্বপ্নদৃশ্য। মণির নির্মমতার সত্যটি যতীনের কাছে দিবালোকের মতো ধরা পড়েছে দেখা যায়। কিন্তু, তা তার মৃত্যুর প্রাক্কালে। এ সত্য মণিদের কাছে স্পষ্ট হওয়ার সমস্যা যে থেকে গেল, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি এবং তাই বর্তমান কালে "শেষের রাত্রি"র মতো ছোটগল্প এবং তার লেখক রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক মতাবস্থান নিয়ে আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। "শেষের রাত্রি"র শেষটুকু নিরুপ (রবীন্দ্রনাথ; ১৯৯৮ : ৫২৭) :

বাবা যতীন, একটু চেয়ে দেখো ? ঐ যে এসেছে। একবারটি চাও।

কে এসেছে। স্বপ্ন?

স্বপ্ন নয় বাবা, মণি এসেছেজ্জ তোমার শ্বশুর এসেছেন।

তুমি কে।

চিনতে পারছ না বাবা, ঐ তো তোমার মণি।

মণি, সেই দরজাটা কি সব খুলে গিয়েছে।

সব খুলেছে, বাপ আমার, সব খুলেছে।

না মাসি, আমার পায়ের ওপর ও শাল নয়, ও শাল নয়। ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।

শাল নয় যতীন। বউ তোর পায়ের উপর পড়েছেজ্জ ওর মাথায় হাত রেখে একটু আশীর্বাদ কর। ? অমন করে কাঁদিস্ নে বউ, কাঁদবার সময় আসছে ? এখন একটুখানি চুপ কর্।

গ্রন্থপঞ্জি

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়। (২০০৯)। কথা কালান্তরের, প্রগতির, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

রবার্ট ব্রাউনিং। (১৯৫১)। *সিলেক্টেড পোয়েট্রি অব রবার্ট ব্রাউনিং*, কেনেথ এল. নিকারব্রুকার (সম্পা.), নিউ
ইয়র্ক : মডার্ন লাইব্রেরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। । (১৯৯৫ক)। "সবলা", *সঞ্চয়িতা*, ঢাকা : প্রতীক।

? (১৯৯৫খ)। গীতবিতান, ঢাকা : প্রতীক ।

? । (১৯৯৮)। *গল্পগুচ্ছ*, ঢাকা : প্রতীক।

হেনরিক ইবসেন। (১৯৮৪)। ফোর গ্রেট প্লেজ বাই হেনরিক ইবসেন, লন্ডন : ব্যান্টাম বুকস্

বাংলার মুসলমানগণের মাতৃভ

আ ব দু ল ক রি ম সা হি ত্য বি শা র দ

মাতার মুখনিঃসৃত ভাষাই মাতৃভাষা। যে ভাষায় আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কথাবার্তা কহি, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী সকলের সঙ্গে অক্লেশে ভাবের আদান প্রদান করি, তাহাই মাতৃভাষা। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্বপ্রথম মায়ের মুখে যে ভাষা শুনিতে পায়, মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষা আয়ত্ত করে, তাহাই তাহার মাতৃভাষা। নবজাত-শিশু প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতে হইতে পিতা-মাতা প্রভৃতি পরিজনের সংস্রবে আপনা-আপনি যে ভাষা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার

মাতৃভাষা, তাহাই তাহার স্বভাবপ্রদত্ত ভাষা। একদিকে মাতার স্তন হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শিশুদেহ পুষ্টিলাভ করে, অন্য দিকে মাতৃভাষা হইতে রসাকর্ষণ ও উন্মুক্ত প্রকৃতি হইতে ভাব-নিয়ে গ্রহণ করিয়া তাহার মানসিক বৃত্তিসমূহ উন্মেষিত হইতে থাকে। মাতৃদুগ্ধ যেমন শিশুর স্বাভাবিক খাদ্য, মাতৃভাষাও তেমনই তাহার প্রকৃতি-দত্ত ভাষা।

বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালীর মাতৃভাষা। বঙ্গদেশবাসী হিন্দুর ন্যায় বঙ্গদেশবাসী মুসলমানদিগকেও বাঙ্গালী ভিন্ন আর কিছু বলা যাইতে পারে না। হিন্দুগণের মতো পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালী মুসলমানেরাও বাংলা ভাষাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। এই ভাষাই তাঁহাদের সমাজের স্তরে স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাতেই তাঁহারা চিন্তা করেন, এই ভাষাতেই তাঁহারা সাংসারিক যাবতীয় কর্ম নিষ্পন্ন করেন, এবং এই ভাষাতেই জাগতিক ভাবসমূহ তাঁহাদের হৃদয়ে সংহত হইয়া ভাবপ্রবাহ ও অনুভূতির সৃষ্টি করে। এই ভাষাই পুরুষ-পরম্পরাক্রমে তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এই ভাষাই 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' তাঁহাদের 'প্রাণ আকুল করিয়া' তুলিতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুশিশুর মতো বাঙ্গালী মোসলেম শিশুও মাতৃস্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মুখ হইতে এই ভাষাই শিক্ষা করিয়া থাকে, এবং একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ মনে করিয়া সর্বপ্রথম এই ভাষারই আশ্রয় গ্রহণ করে। সূতিকাগৃহে সর্বপ্রথম যে ভাষায় হাতে-খড়ি হয়, শিক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া যে ভাষার আশ্রয় ও সাহচর্যের গ্রহণ অনিবার্য হইয়া পড়ে, এবং সংসারের কর্মক্ষেত্রে– জীবনের সর্ববিধ প্রয়োজনে যে ভাষার নিত্য প্রয়োজন হয়, বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ হউক, আর মুসলমান সমাজ হউক, সর্বত্র সে ভাষা এই বাংলা ভাষা। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে যদি কোনও ভাষার সনাতনী প্রচার ও অবাধগতি থাকে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যদি কোনও ভাষার প্রয়োগ বাঙ্গালীর থাকে, সে ভাষা এই বাংলা ভাষা। বাঙ্গালীর– তা হিন্দুর হউক, বা মুসলমানের হউক,– বাঙ্গালীর শুদ্ধান্তঃপুরে, বাঙ্গালীর বৈঠকে, বাঙ্গালীর মজলিসে, বাঙ্গালীর মেলায় যদি কোনও ভাষার অপ্রতিহত গতি থাকে, তবে তাহা বাঙ্গালা ভাষা। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, এই স্বাভাবিক সহজলভ্য ভাষা, সমাজের অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট এই দেশ-প্রচলিত ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা। এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও ভাষাকে ন্যায়ত তাঁহাদের মাতৃভাষা বলা যাইতে পারে না।

যে জাতির মাতৃভাষা হইতে জাতীয় ভাষা স্বতন্ত্র, কর্ণধার-বিহীন তরণীর সহিত সে জাতির তুলনা করা যাইতে পারে। উক্তরূপ তরণী যেমন বায়ুচালিত ইতস্তত ধাবমানা হয়, কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যপথে চলিতে পারে না, উক্ত জাতিও কোন নির্দিষ্ট পথের অনুসরণে অক্ষম হইয়া যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে থাকে। তাহার জাতীয় ভাষার সাহিত্যে উচ্চ আদর্শ থাকিলেও পরস্পর বিধি হেতু মাতৃভাষার ভিতর দিয়া তাহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিতে না পারিলে তাহাতে প্রতিক্রিয়ার উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং সে ভাষা ও সাহিত্যে জীবনীশক্তি থাকে না, এবং তাদৃশী জাতীয় ভাষা হইতে সে জাতি কোনও উপভাষা লাভে সমর্থ হয় না। ইহাতে তাহার জাতীয় জীবন আদর্শহীন হইয়া পড়ে, কক্ষচ্যুত জ্যোতিষ্কের মতো ক্ষিপ্রগতিতে অধোগমনে বাধ্য হয়।

জাতিই বলুন আর সমাজই বলুন, তাহাকে জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে জীবনীশক্তি ও উহার আদর্শ খুঁজিয়া লইতেই হইবে,– জাতীয় ভাষার সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিতে হইবে, নচেৎ তাহার উন্নতি অসম্ভব। কেবল দুই-চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি লইয়া কিছু জাতি বা সমাজ হয় না, আপামর সাধারণ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলকে লইয়াই জাতি বা সমাজ গঠিত হয়। জাতীয় বা সমাজদেহের অণুতে পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিবার একমাত্র উপায় মাতৃভাষা। জাতীয় বা সমাজ-শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সবল ও চেতনাময় করিয়া তুলিবার পক্ষে মাতৃভাষাই একমাত্র মহৌষধ– একমাত্র অমোঘ অস্ত্র। যে জাতির জাতীয়ভাষা ও মাতৃভাষা এক নহে, সে জাতির উভয় ভাষাই পঙ্গু,– উভয় ভাষাই শক্তিহীন হইয়া পড়ে। জাতীয়ভাষা মাতৃভাষার খাতে প্রবাহিত হইয়াই সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে। এজন্য আমরা দেখিতে পাই, যে জাতির ভাষা ও সাহিত্য যত শক্তিশালী ও উন্নত সে জাতি সংসার-রঙ্গক্ষেত্রে তত উন্নত ও পরাক্রমশালী। পৃথিবীর উন্নত জাতিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের এই কথার যাথার্থ্যে সন্দেহ থাকিবে না।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার আধুনিক মুসলমানগণের সম্মুখে কোনও উচ্চ জাতীয় আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত নাই। দুই নৌকায় পা দিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাঙ্গালার মুসলমানদের অবস্থাও প্রায় তাহাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে তাঁহারা অদ্যাপি জাতীয় ও মাতৃভাষা এবং জাতীয় সাহিত্য-রূপে সার্বজনীন ভাবে গ্রহণ করেন নাই। যে ভাষার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে, সে ভাষাকে জাতীয় ভাষা-রূপে গ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আরব্য, পারস্য, উর্দু প্রভৃতি ভাষার একতমকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, এবং তাহাই সমাজের ও জাতির পক্ষে শুভকর বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা এ কথা ভুলিয়া যান যে, মুখে বা কাগজে-কলমে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও আবহাওয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। দুই-চারি জন শিক্ষিত লোক সভা-সমিতিতে মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়া উর্দু প্রভৃতি ভাষাকে জাতীয় ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালার বিশাল সমাজদেহের শিরায় শিরায় মর্মে মর্মে বঙ্গভাষার মতো ঐ ভাষা প্রবেশ করান তাঁহাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। স্বাভাবিক সহজপ্রাপ্য দেশীয় নদীকে উপেক্ষা করিয়া বিদেশীয় খাল হইতে পানীয়জল সংগ্রহ করিবার চেষ্টার ন্যায়, বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে উর্দু প্রভৃতির প্রচলনচেষ্টাও একান্ত উপহাস্য। মুখের জোরে যিনি যাহাই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা। সেই ভাষাকে পরিহার করিয়া আরব্য পারস্যের মতো মৃত ভাষাকে বা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের উর্দুভাষাকে জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব ও চেষ্টা শুধু যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, এমন নহে; উহা সমাজের পক্ষে– দেশের পক্ষে বিষম অনিষ্টকরও বটে। এরূপ চেষ্টা তো কখনও ফলবতী হইবেই না; ফলে এই হইবে যে, উর্দু প্রভৃতির প্রচলনের নিষ্ফল চেষ্টায় এমন কতকটা শক্তির অকারণ অপচয় ঘটিবে, যে শক্তি সুপথে পরিচালিত হইলে সমাজের ও দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারিত। এরূপ বিফল প্রয়াসে না উর্দু প্রভৃতি ভাষা, না মাতৃভাষা– কোনোটাই তাঁহাদের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না।

ইহাতে সমাজ দেশের সাহিত্য হইতে উপযুক্ত রস ও জীবনীশক্তি না পাইয়া ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্বল হইতে থাকিবে। বর্তমানে বঙ্গীয় মুসলমানসমাজ যে ঠিক এই দুর্দশায় উপস্থিত হইয়াছে, একটু গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

আরব্য-পারস্য ভাষা এক সময়ে– কোনও এক সুদূর অতীতে– কল্পনাতীত কালে বঙ্গীয় মুসলমানের আদিপুরুষগণের মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা হয়তো ছিল। তাই বলিয়া আজও ঐ সকল মৃত ভাষাকে মাতৃভাষা বা জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ সিদ্ধান্তের সমর্থন করা যায় না। একদা দেশে ও রাজদরবারে পারস্য ভাষার খুব প্রাদুর্ভাব ছিল সত্য, কিন্তু তাহা কখনও সার্বজনীন মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা ছিল না। কালের অচিন্ত্যনীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভাষাসমূহ মোসলেম সমাজ হইতে এতই দূরবর্তী হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগকে এখন একবারে বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষা শিখিতে আমাদিগকে যে কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিতে হয়, আরব্য-পারস্য ভাষা শিখিতেও আমাদের তদপেক্ষা অল্প ক্লেশ ও পরিশ্রম হয় না। আমরা দেখিতে পাই, মুসলমানেরা যখন যেখান হইতেই যে ভাষা সঙ্গে লইয়া ভারতে আগমন করুন না কেন, ভারতের যে অংশে যাঁহারা পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অংশের প্রচলিত ভাষাকেই– দুই দিন আগে হউক, আর পরেই হউক,– আপনাদের ভাষা করিয়া লইয়াছেন। বঙ্গদেশে মুসলমানগণের বঙ্গভাষা-ব্যবহার আমাদের সেই কথারই সমর্থন করিতেছে। আমাদের এই কথা হইতে কেহ এরূপ মনে করিবে না যে, আমরা আরব্য-পারস্য প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার বিরোধি। বস্তুত, আরব্য-পারস্য কেন, জ্ঞানের জন্য জগতের কোনও ভাষা-শিক্ষারই আমরা বিরোধি নহি। আরব্য ভাষা যে ধর্ম-ভাষারূপে মুসলমানগণের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, আমরা তাহা অস্বীকার করিব না। আমাদের শুধু আপত্তি এই যে, ঐ সকল ভাষা কিছুতেই বাঙ্গালার মুসলমানগণের জাতীয়-ভাষা-রূপে গৃহীত হইতে পারে না, এবং তাহা করিবার পক্ষে বিফল চেষ্টা করাও কাহারও উচিত নহে। ঐ সকল ভাষাকে জাতীয়-ভাষা-রূপে গ্রহণ করিতে যাওয়া, আর আপন সমাজের কর্ণচ্ছেদ করা, একই কথা বলিয়া মনে হয়। অনেক হিন্দুও এইরূপ ভ্রান্তিবশত সংস্কৃত ভাষাকে তাঁহাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া থাকেন। সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমানের দেবভাষা বা ধর্মভাষা হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় ভাষা কোনও মতেই হইতে পারে না। ইউরোপে সমস্ত খ্রিস্টান জাতি গ্রিক ও ল্যাটিনকে যেরূপ 'ক্ল্যাসিকাল' ভাষা মনে করেন, অস্মদ্দেশে সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষাও তদবস্থাপন্ন। দেশপ্রচলিত আপামরসাধারণের বোধ্য ও নিত্য-ব্যবহৃত জীবন্ত ভাষাই সকল জাতির জাতীয় ভাষা হওয়া উচিত। তাহা হইলেই সেই জাতি সেই ভাষার সাহায্যে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাই একমাত্র তদ্রূপ ভাষা। তদ্ভিন্ন আর কোনও ভাষাই বাঙ্গালীর জাতীয় ভাষা হইতে পারে না।

উর্দু ভাষা যতই সুন্দর, শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় হউক না কেন, বঙ্গদেশে মুসলমান-সমাজে তাহা কখনই বাঙ্গালা ভাষার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে অনেকে

উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাতৃভাষাকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করিয়া অনেক সময় কথোপকথনে উর্দু ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ কার্যের ফল কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাঁহারা কেহ একবারও তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন না। যদি জানিতাম যে, বাঙ্গালার হাটে ঘাটে, বাঙ্গালার মেলায় মজলিসে, বাঙ্গালার প্রত্যেক গৃহস্থের অন্তঃপুরে, বাঙ্গালার প্রত্যেক বিষয়-ব্যাপারে আপামরসাধারণ সমস্ত বাঙ্গালী-মুসলমানের মধ্যে শুধু উর্দুই প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা হইলে, আমাদের কোনও বক্তব্যই ছিল না। যে দেশের পনেরো আনা লোক কথায় লেখায় বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার করে, তাহাতে এরূপ স্বৈরাচার করিবার পূর্বে স্বজাতির হিতকামীমাত্রেরই তাহার ফলাফল একটু চিন্তা করিয়া দেখা কর্তব্য। ফলে মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বঙ্গভাষাকে আপনাদের জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া না লওয়ায় একদিকে সমাজ তাঁহাদিগকে হারাইতে বাধ্য হইতেছে, এবং অন্য দিকে তাঁহাদিগকেও সমাজ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হইতেছে। কোথায় তাঁহারা উচ্চ শিক্ষাদীক্ষার অধিকারী হইয়া তাঁহাদের জ্ঞানালোক দ্বারা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন সমাজকে আলোকিত করিবেন, না তৎপরিবর্তে তাঁহারা সমাজের গণ্ডীর বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছেন! মানুষ কিছু শুধু নিজের জন্য জীবনধারণ করে না। বিধাতার আশীর্বাদে নানা গুণের অধিকারী হইয়াও যদি দেশের ও সমাজের উপকারেই না-আসিলাম, তবে আমার এত গুণজ্ঞানের সার্থকতা বা প্রয়োজনই-বা কী? জগৎপিতা দুর্লভ মানব-জীবনে ও পশুজীবনে বিপুল পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিরা এ কথা ভুলিয়া যান যে, সমাজ তাঁহাদিগকেই আলোক-বর্তিকা করিয়া– তাঁহাদিগকেই ধ্রুবতারা জ্ঞান করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার জন্য সমুৎসুক। তাঁহারা যদি আপনারই অন্ধকার কক্ষে লুক্কায়িত হইয়া শুধু নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত থাকেন, তবে তাঁহাদের দুর্গত দেশে– তাঁহাদের দুরবস্থ সমাজে আর আলোক-বিকিরণ করিবে কে? বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে সৈয়দ আহম্মদ কই, বিপিনচন্দ্র কই, সুরেন্দ্রনাথ কই? ওই শুনুন, প্রতিধ্বনি অদূরবর্তী গঙ্গাবক্ষে ব্যাহত হইয়া উত্তরে বলিতেছে– কই, কই, কই !

বলিতেছিলাম, উর্দুভাষাকে বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় ভাষারূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা তো কদাপি ফলবতী হইবেই না,– অধিকন্তু তাহাতে এই অনিষ্ট হইবে যে, উর্দু বা বাঙ্গালা ভাষা কোনোটাই তাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারিয়া, উভয় ভাষাই অকর্মণ্য হইবে। মাতৃভাষা ও জাতীয়-সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোনও জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। কেন না, জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রাণ। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয়-জীবন-তরীর দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে, এবং জাতীয় সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণে করিয়াই সমাজ-দেহ পুষ্টিলাভ করে। আজ হিন্দুসমাজে এই অভাবনীয় পরিবর্তনের হেতু কী? তাঁহাদের মধ্যে এই নবজীবনের সূত্রপাত কি বাঙ্গালা সাহিত্য হইতেই হয় না? হিন্দুসমাজের মর্মে মর্মে এই যে নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার মূল কি বঙ্গ-সাহিত্য নহে? একই জলবায়ুর প্রভাবে একই দেশে বাস করা বাঙ্গালার দুইটি সহোদর জাতি পরস্পর বিভিন্ন-মুখ হইতেছে কেন, আমাদের মধ্যে সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, বঙ্গসাহিত্যই

হিন্দুসমাজের এই পরিবর্তন-সূচনার মুখ্য কারণ, এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অবহেলাই মুসলমান সমাজের এই নির্জীবতার প্রধান হেতু ।

হিন্দুসমাজে বঙ্গসাহিত্য এখন যেরূপ অতর্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাতে সমাজদেহে এরূপ তীব্র বিক্ষেপ ও নূতন প্রতিক্রিয়া হওয়াই একান্ত স্বাভাবিক । বঙ্গসাহিত্যের প্রসার ও প্রভাব-বৃদ্ধি ব্যতীত হিন্দুসমাজে এত শীঘ্র এমনভাবে জাতীয় ভাব স্ফুরিত হইতে পারিত না! বঙ্গসাহিত্যই তৎসমাজের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে এমনভাবে চেতনাময় করিয়া তুলিয়াছে । একমাত্র জাতীয় সাহিত্যের অভাবেই বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজ আজও 'যে তিমিরে সে তিমিরে' রহিয়া গিয়াছে, এবং আরও বহুদিন এ ভাবে থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ হইতে পারে না । যেখানে হিন্দুসমাজে শত শত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা চলিতে পারে, সেখানে মুসলমান সমাজে একখানি মাত্র সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে না,– এ কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মুসলমান-সমাজ যে আজও উন্নতি-পথের কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায় । তাহাদেরই প্রতিভাবলে উহারা আজ জগতের সাহিত্য-পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য-স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে । সুতরাং সে জন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না,– তজ্জন্য মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতাই সম্পূর্ণ দায়ী ।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, অদ্যাপি মুসলমানগণ সাহিত্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, তাঁহাদের মাতৃভাষার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন রহিয়াছেন । কেবল তাহাই নয়, এখনও অনেকে বঙ্গভাষাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করেন । হিন্দুদের মধ্যে বঙ্গভাষার বিপুল প্রসারের ফলে তাঁহাদের ধর্মভাষা সংস্কৃতের প্রায় সমস্ত গ্রন্থরত্নই বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়াছে । তাহার ফলে মাতৃভাষার সাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের অক্ষয়কীর্তি পূর্ব-পুরুষগণের প্রাণপ্রবাহ অনুভব করিতে পারিতেছেন । বঙ্গীয় মুসলমানগণও যদি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরব্য-পারস্য হইতে তাঁহাদের মহনীয়কীর্তি পূর্ব-পুরুষগণের গ্রন্থনিচয় বাঙ্গালায় রূপান্তরিত করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গভাষা তাঁহাদেরও জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইত, এবং তাহাতে বঙ্গের উভয় সমাজের উন্নতির হেতু ও মিলনের চিরস্থায়ী সেতু নির্মিত হইত । পক্ষান্তরে, বাঙ্গালা ভাষাও সংস্কৃতের ন্যায় আরব্য ও পারস্য ভাষার মহামূল্য রত্নমালায় বিভূষিত হইয়া এবং অপূর্ব মহিমা ধারণ করিত, এবং তাহা এখন হিন্দুগামী বলিয়া আমাদের অনুযোগ করিবার কারণ থাকিত না ।

মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে জাতীয় ভাষারূপে বরণ করিয়া তাহার সমুচিত সমাদর ও অনুশীলন না করায়, মুসলমানসমাজের যে কী অনিষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় অভিব্যক্ত করা সহজ নহে । প্রাচীন বঙ্গে বহু বহু মুসলমান কবি যেরূপ সযত্ন সেবায় বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন, সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্যন্ত অবিরাম-প্রবাহে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত । আমাদের জাতীয়তা-বর্ধন-কল্পেও তাহা অশেষ সহায়তা করিতে পারিত, এবং বঙ্গসাহিত্যও ইসলামের ভাস্কর-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত । বাঙ্গালাভাষা ভিন্ন অপর কোনও ভাষা বাঙ্গালী মুসলমানগণের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হইতে পারে না,

ইহা আমাদের, পূর্বপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং তদনুসারে তাঁহারা সেই শুভকার্যে ব্রতীও হইয়াছিলেন। হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারতাদি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থরাজি বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিতেছিলেন, মুসলমান কবিগণও তেমনি তাঁহাদের পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থাবলি বাঙ্গালায় নিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র এই অকৃতীর চেষ্টায় এ পর্যন্ত ৮০ জন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

এই হিসাবে সমগ্র বঙ্গে কত কবির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আপনারাই অনুমান করুন। বহুশত বৎসর বাঙ্গালায় আধিপত্য করিয়া মুসলমানগণ যে বাঙ্গালা ভাষাকে নিজের বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য-মহিমার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর 'আত্মভাব' বিলুপ্ত হইয়া না গেলে, আজ বাঙ্গালী মুসলমানের ইতিহাস অন্য

আকার ধারণ করিত, সন্দেহ নাই। বঙ্গের বর্তমান মুসলমানগণ যদি তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্তে অবহেলা করিয়া কোনও নূতন জাতীয় ভাষার আমদানি ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা কখনও সাফল্য লাভ করিবে না। প্রত্যুত, সে চেষ্টা নিজ হস্তে নিজের মস্তকে কুঠারাঘাতের সহিত তুলিত হইতে পারিবে।

আরও একটা কথা আছে। বঙ্গদেশ হিন্দু ও মুসলমানের দেশ এবং হিন্দু ও মুসলমান লইয়াই বাঙ্গালী জাতি গঠিত। এই দুই জাতির মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা প্রচলিত থাকিলে তাহাতে জাতীয়তা গঠনের যেরূপ সহায়তা হইবে, তাহা আর কিছুতেই হইতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্মিলন সাধনের প্রয়োজন কী, তাহা বোধ হয় এখন আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। একমাত্র বঙ্গভাষাই বঙ্গের দুইটি সহোদর সমাজকে পরস্পরের প্রতি প্রীতিশীল ও অনুরাগ-সম্পন্ন করিতে পারে। প্রায়ই ভাষার ভিতর দিয়াই তাঁহাদের পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান ঘটিতে পারে, এবং এই ভাষাই তাঁহাদের ক্ষুদ্র বর্ণগত পার্থক্য ঘুচাইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিপুল অখণ্ড জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। এই বিষয়ে বাঙ্গালার মুসলমানগণের হৃদয়ে সুমতির উদয় হউক, বিধাতার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

উৎস : পত্রিকা সাহিত্য, শ্রাবণ, ১৩২১ সংখ্যা। পরে 'সংহতি' প্রকাশনী থেকে গৌতম ভদ্র'র 'মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ও আত্মসত্তার রাজনীতি' গ্রন্থে 'সংযোজন' হিসেবে গ্রন্থভুক্ত।